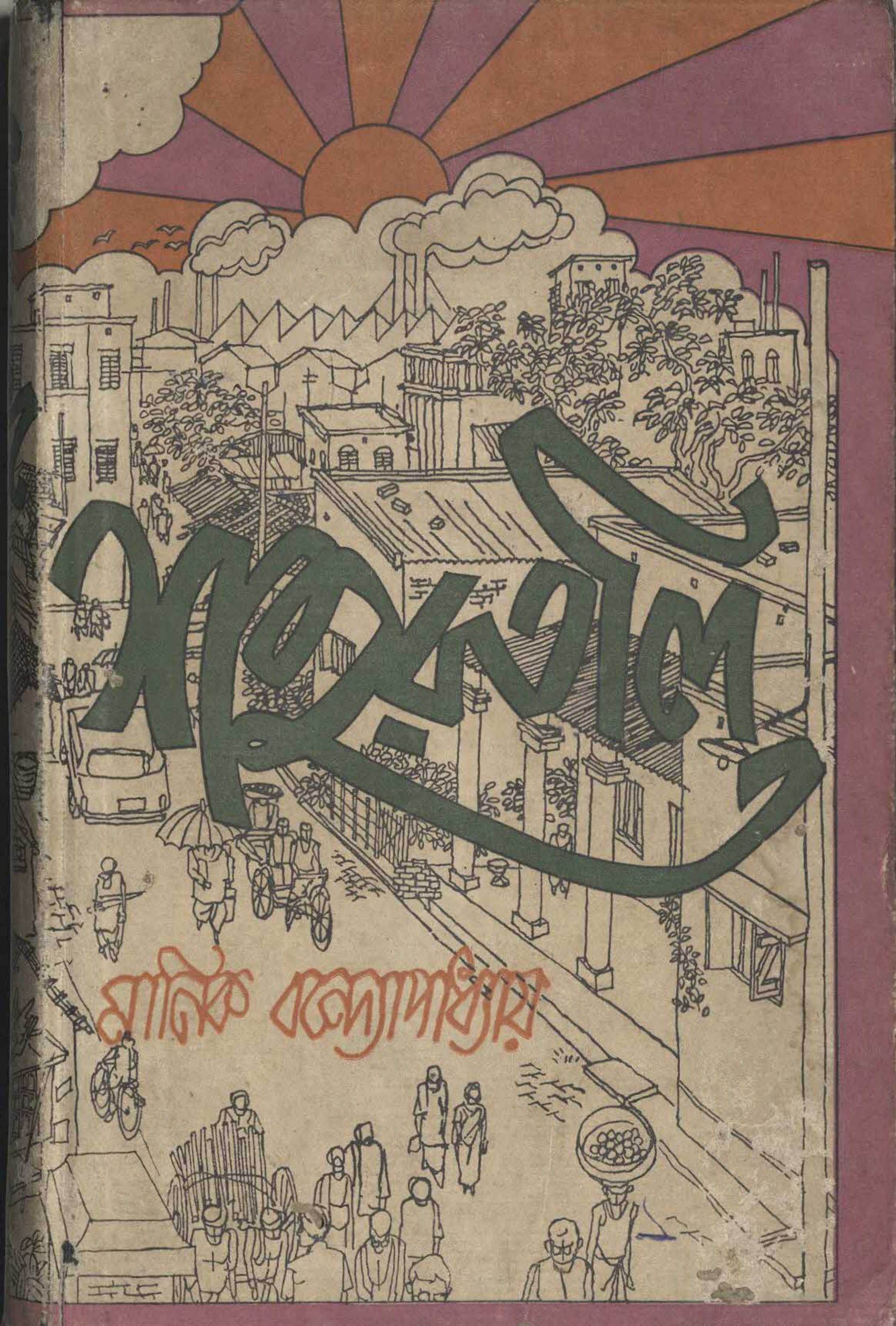

শহরতলী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শহরতলি

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ● ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড ● কলিকাতা—৯

নতুন সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৭৯ সাল
প্রকাশক
শ্রী স্থনীল মণ্ডল
মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ শিল্পী
রবীন দত্ত
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
গ্রন্থণ
দীননাথ বুক বাইণ্ডিংওয়াকর্স
৬০ বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৯
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৬।

দাম ঃ ন'টাকা

শহরতলি

প্রথম পর্ব

১

এদিকের শহরতলির এই অঞ্চলে বড় রাস্তায় বিদ্যুতের আলো আছে, —অনেকটা দূরে দূরে। ছোট গলিতে আলকাতরা মাখানো কাঠের থামের মাথায় আজও টিমটিমে তেলের বাতি জ্বলে। কোনো বাড়িতে ভাড়াটে কেরানীবাবুর বৌ অপরিচ্ছন্ন কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত রান্নাঘরে উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া চামচ দিয়া কণ্ঠার নিচে ঘামাচি মারেন, রাত্রে খোকা কাঁদিয়া উঠিলে বেড্‌সুইচ টিপিয়া বদলান তার কাঁথা ; হয়তো ঠিক পিছনেই আরও বড় বাড়ির রীতিমতো বড়লোক মালিকের রান্নাঘরে ডিবরি বার বার বাতাসে নিভিয়া যায়, রাত্রে খোকা কাঁদিলে টর্চ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খোকার মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলেন নিজেও।

একটু বেশী রাত্রে আর রাত্রির শেষভাগে ট্রামের আওয়াজ কানে আসে, বন্ধ ঘরের বাহিরে ঝড়ের অন্তিম অবস্থার হা-হুতাশভরা একটা অস্বস্তিকর একটানা আহ্বানের মতো। মোটরের হর্ন দূরেও বাজে কাছেও বাজে, সময় অসময় নাই—কেবল সময় বিশেষে বাজে বেশী, সময় বিশেষে কম। পথের দু'পাশে সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ভোগের, রুচি ও অরুচির, সুন্দর ও কুৎসিতের, পরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির, সম্মুখ ও পিছনের, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের (যথা—গৃহ-নির্মাণোপকরণের সমাবেশ) কত যে আশ্চর্য সমন্বয় ও গলাগলি ভাব! নাম লেখা গেট, বাগান ও লন, আধুনিক ফ্যাসানের সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি, বিচিত্র শাড়ি, সুন্দরী নারী, রেডিওর গান, ইট বাহির করা পুরানো একতলা বাড়ি, সামনে সিমেণ্ট-ফাটা রোয়াকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজের টুকরা, আধপোড়া বিড়ি, কোমরে ঘুন্‌সি বাঁধা উলঙ্গ শিশু। পথের এদিকে ছবির মতো সাজানো মনিহারী দোকান—সাবান, কেশতৈল, পাউডার, স্নো, ক্রিমে ঠাসা ; পথের অপর দিকে নিছক

একটা কয়লার আড়ত, খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়, মালিক শ্রীভূষণচন্দ্র নন্দী। তিনটি মহিষের গাড়ি কয়লা আনিয়া আড়তে জমা করে, পুরীষ ও পাঁকের কোমল গভীর স্নেহে দেহের ভার নামাইয়া এই তিন জোড়া মহিষ অবসর সময়টা জাবর কাটে আড়তের ঠিক পিছনে —রাস্তা হইতে অনেকটা চোখে পড়ে, গন্ধও পাওয়া যায় কিছু কিছু। কাছেই ডাইমণ্ড র্যাস্টুর্যান্ট; ফাস্টকেলাশ চা রুটি মাখন চপ কাটলেট ডবল ডিমের মামলেট (মাত্র তিন পয়সা) ইত্যাদি পাইবেন বলিয়া মালিক রাধানাথ দে স্বহস্তে সাইনবোর্ড লিখিয়া রাখিয়াছে। একরকম গা ঘেঁষিয়াই টিনের চালার নিচে লোচন সাউ-এর মুড়িচিড়ার দোকান, কাচ বসানো টিনের পাত্রে বাতাসা, দড়িতে ঝুলানো তিলুড়ি, এক ছড়া চাঁপা কলা···। ছোট স্যাকরার দোকান, কামারের দোকান, টিনের মগ-বালতি তৈরি আর ঘটিবাটি ঝালাই করার দোকান, সাইকেল মেরামতের দোকান এসবও আছে।

আর কিছু দূরে আছে বড় বড় কারখানা।

হাপরের দড়ি টানিতে টানিতে তিনু রক্তবর্ণ লোহার পাতে হাতুড়ি পিটাইতে পিটাইতে বিশু আর অবাধ্য লোহার পাতকে মনোমতো আকৃতি দিবার চেষ্টা করিতে করিতে বেন্দা যখন হাঁপাইয়া পড়ে, তখন বেন্দাই হয়তো চোখ তুলিয়া তাকায় সেইদিকে, যেদিকে আছে বড় বড় কারখানাগুলি। প্রকাণ্ড একটা লাল দালানের লাগাও বিরাট একটি টিনের শেড আর তিনটি মোটা মোটা চোঙা পরিষ্কার দেখা যায়, অন্যগুলি একটু আড়ালে পড়িয়াছে। একি কাণ্ড, এ্যাঁ? কত বিঘা জমি জুড়িয়া না জানি কারখানাগুলি গড়া হইয়াছে? নিবিড় কালো কি ধোঁয়াটাই উঠিয়া যাইতেছে চোঙাগুলি দিয়া আকাশের দিকে। বেন্দা জানে, বিদ্যুতে যেমন কাচের ভিতরে অবিরাম শিখাহীন আলো জ্বলে, তেমনি অবিরাম কলও চলিতে পারে, সব কল ধোঁয়া ছাড়ে না। কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী চোঙা দিয়া যে ধোঁয়া বাহির হয়, বেন্দার কাছে তাই কেবল কলকারখানার প্রতীক।

যশোদা যখন একসঙ্গে তিনটি বড় বড় কয়লার উনুনে আঁচ দেয় তখনও

বড় কম ধোঁয়া হয় না। শীতকালে ধোঁয়াটা যেন যশোদার বাড়ি ছাড়িয়া নড়িতে চায় না, যশোদার বাড়ির ছোট উঠানে, ইট আর টিনের ছোট-বড় কাঁচা পাকা ঘরগুলির মধ্যে স্থায়ীভাবে আটকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখন, বৈশাখের প্রথমে, অনেক দূরের সমুদ্র হইতে ফুরফুরে বাতাস আসিয়া সকাল সন্ধ্যায় খনি-গন্ধী ধোঁয়া উড়াইয়া লইয়া যায়।

এ বাড়িতে অল্প জায়গায় যশোদা অনেকগুলি ঘর তুলিয়াছে, অনেক-গুলি মানুষকে থাকিবার জায়গা দিতে হয়। আগে কেবল পাঁচটি ইটের ঘর ছিল, তখন উঠানটিও ছিল মস্ত বড়। পশ্চিম কোণে কল আর চৌবাচ্চার কাছে খানিকটা স্থান ছিল বাঁধানো, বাকিটা কাঁচা। তার পর দু'টি টিনের ঘর তুলিবার ফলে উঠান তার এক রকম অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, আছে কেবল ওই বাঁধানো স্থানটুকু। কয়েক বছর কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও উঠানের সঙ্কীর্ণতা যশোদার অভ্যাস হইয়া যায় নাই, মাঝে মাঝে পীড়ন করে। দু'হাতে জলভরা প্রকাণ্ড দু'টি বালতি ঝুলাইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া সশব্দে তাকে নিশ্বাস ফেলিতে দেখা গিয়াছে, ফাঁপর ফাঁপর লাগিলে মানুষ যেমন করে। বোঝা গিয়াছে, ফাঁপর ফাঁপর লাগাটা যশোদার মানসিক, বালতি দু'টি ভারি বলিয়া নয়। এ-রকম দু'চারটি জলভরা বালতির ভারে কাবু হওয়ার মতো শরীর যে যশোদার নয়, দেখিলেই সেটা বোঝা যায়। সাধারণ বাঙালী ঘরের গোটা কয়েক স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে অনায়াসে গড়া চলিত এতখানি মাল-মসলা দিয়া ভগবান তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিজের বা নিজের ভাই-এর জন্য আজ এবেলা যশোদার উনানে আঁচ দিবার দরকার ছিল না, পাড়ায় বৌভাতের নিমন্ত্রণ আছে। কিন্তু আরও যে বিশ-বাইশজন লোক বাড়িতে আছে তাদের জন্য যশোদাকে রাঁধিতে হইল। এরা সকলেই ভাড়াটে এবং পোষ্য। কারণ অনেকে নিয়মমতো ভাড়াও দেয় না, ভরণপোষণের খরচও দেয় না—দিতে পারে না। এতগুলি লোককে উপবাসী রাখিয়া ভাইকে নিয়া কি নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়া চলে?

সকাল সকাল যশোদা রান্না শেষ করিয়া ফেলিল। বড় গরম পড়িয়াছে আজ। রাঁধিবার সময় ঘামে যশোদার ভালমতোই স্নান হইয়া গিয়াছিল, রান্না শেষ করিয়াই তবু একবার স্নান করিয়া নিল। শরীরের ঘাম না শুকাইয়া স্নান করিলে অসুখ হয়, এসব যশোদা মানে না, অত তুচ্ছ কারণে অসুখ হইবে এমন শরীর যশোদার নয়। তাছাড়া, ঘাম ধুইয়া ফেলার জন্যই স্নান করা, ঘাম শরীরে বসিয়া গেলে আর স্নান করিয়া লাভ কি?

তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করার ব্যস্ততায় সময়মতো সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া শাঁখে ফুঁ দেওয়া হয় নাই বলিয়া যশোদার মনটা খুঁতখুঁত করিতে থাকে। শাঁখ বাজাইয়া সামনে ভাইকে দেখিয়া বলে, 'হ্যারে নন্দ, কোথায় থাকিস সারাদিন? বাবুটি সেজে ঘুরে বেড়া-লেই তোর দিন কাট্‌বে?'

নন্দকে দেখিলে যশোদার ভাই বলিয়াই মনে হয় না। বাইশ-তেইশ বছর বয়স, অপরিপুষ্ট শরীর, মুখে মেয়েদের মতো তেলতেলা ধরনের কোমলতা। পাশে না বাড়ুক উপরের দিকেও যদি ভালরকম বাড়িয়া উঠিত তবু আশা করা চলিত, এককালে মোটাসোটা হইয়া যশোদার ভাই হিসাবে মোটামুটি মানানসই হইলেও হইতে পারে ছেলেটা। কিন্তু এ-রকম একটা আশা পোষণ করার সুযোগও সে রাখে নাই। মতি নামে একজন ভাড়াটে আছে যশোদার, বয়স পঞ্চাশের কাছে গিয়াছে কিন্তু মানুষের সঙ্গে ভাব করিয়া তাদের সঙ্গে সে পেশাদার রসও পান করে রসিকতাও করে। একদিন নূতন বন্ধু সুধীরের কানে কানে সে বলিয়াছিল, 'ওই যে ওরা দু'জন যশুদা আর নন্দ, এক মায়ের পেটের ভাই বোন না হয় হল, কিন্তু বাপ কি ওদের একটা রে দাদা!'

সেইদিন যশোদা ও নন্দর তফাতটা ভালভাবে খেয়াল করিয়া সুধীরের মনে সত্যই খটকা লাগিয়াছিল যে, কথাটা কি তবে সত্যি নাকি, কে জানে।

নন্দ এক গাল হাসিয়া বলিল, 'বৌ দেখতে গিয়েছিলাম দিদি। সুন্দর বৌ হয়েছে—এইটুকু বাচ্চা!'

'সত্যি?'

যশোদা ভাবিতেছিল, যারা বাড়ি ফিরিয়াছে তাদের ভাত দিয়া বৌ দেখিতে যাইবে কিনা, নন্দর মুখে নতুন বৌ-এর রূপ বর্ণনা শোনার পর আর ধৈর্য ধরা গেল না।—'তোর ধনাদাকে ডাক তো নন্দ।'

ধনঞ্জয় আসিলে যশোদার ঘরখানা যেন ভরাট হয়ে গেল। নন্দর বদলে যশোদার ভাই হইলে তাকেই মানাইত ভাল। মাস দুই আগে ধনঞ্জয় দেশ হইতে চাকরির খোঁজে আসিয়া যশোদার বাড়িতে ডেরা বাঁধিয়াছে। প্রথম দিন সাবান-কাচা লালচে ধুতির উপর গেঁয়ো ধোপার সাফ করা অতিরিক্ত নীল লাগানো শার্ট গায়ে দিয়া, বগলে ময়লা শতরঞ্জি মোড়া বিছানা আর রঙচটা টিনের বাক্স হাতে করিয়া সে যখন বাড়িতে ঢুকিয়াছিল, মনে হইয়াছিল একটা দৈত্য আসিয়াছে। বুড়ো মতি তাকে এখানে আনিয়াছে, মতির সে দেশের লোক।

সেই দিন সুধীরের কানে কানে মতি বলিয়াছিল, 'যশোদা একলাটি থাকে, ওর দুঃখ্যু আর সয় না মাইরি, তাই ধনাকে নিয়ে এলাম। দু'টিতে মানাবে ভাল, আঁ?' রসিকতা করিয়া মতি নিজে প্রাণপণে হাসে, সেদিনও হাসিয়াছিল। কিন্তু এমন একটা লাগসই রসিকতাও সুধীরের ভাল লাগে নাই দেখিয়া হাসিটা তার থামিয়া গিয়াছিল হঠাৎ।

যশোদা দু'টি কাজের খোঁজ দিয়াছে, কিন্তু একটিও ধনঞ্জয়ের পছন্দ হয় নাই। লোকটার উপর যশোদা সেই জন্য বিশেষ খুশি ছিল না। গরীবের এত বাছবিচার থাকিলে চলিবে কেন, পেটের ভাত যখন তাকে যোগাড় করিতেই হইবে?

ধনঞ্জয় আসিলে যশোদা বলিল, 'একটা উপকার করবে আমার? রেঁধে বেড়ে রেখে দিইছি, সুধীরকে ডেকে দু'জনায় মিলে সবাইকে পরিবেশনটা করবে? এঁটো বাসন তুলব'খন আমি এসে। তিনটে থালা কম পড়বে—তিনজনকে পাতায় দিও, কেমন?'

ধনঞ্জয় রাগে আগুন হইয়া বলিল, 'সবাইকে ভাত বেড়ে দিতে বলছ আমায়? আস্পর্ধা তো কম নয় তোমার! মাইনে করা বামুন নাকি তোমার আমি?'

শুনিয়া যশোদাও রাগিয়া গেল।—'ও বাবা, একটা কাজ করতে

বললে এ যে দেখি ফোঁস করে ওঠে! এ কোন্ দেশী নবাব বাদ্শা রে বাবা! যাও বাবু তুমি, যাও, বসে বসে বিড়ি টানোগে।'

ধনঞ্জয় গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেল। নন্দ বলিল, 'ও-বাড়ি থেকে চাঁপার মা নয় কুমুদমাসিকে ডেকে আনব দিদি?'

যশোদা বলিল, 'কেন? ও-বাড়ির মানুষকে আবার টানাটানি কি জন্যে? এতগুলো মদ্দ পুরুষ রয়েছে এ-বাড়িতে, একটা বেলা কেউ ভাত বেড়ে দিতে পারবে না ক'টা মানুষকে? গলায় দড়ি অমন অকম্মার ধাড়িদের! দূর করে তাড়িয়ে দেব সবক'টাকে বাড়ি থেকে। মতি আর সুধীরকে ডাক দিকি।'

মতি আর সুধীরকে বলা মাত্র রাজী হইয়া গেল। সুধীর একটু বেঁটে, ঘাড়ে গর্দানে জড়ানো শক্ত মজবুত শরীর, গুণ্ডার মতো দেখিতে। পরিবেশনের ভার পাইয়া অতিমাত্রায় খুশি হইয়া সে বলিল, 'একটু সেজেগুজে বৌ-ভাতে যেও কিন্তু চাঁদের মা।'

যশোদা বলিল. 'তামাশা রাখো তো বাবু তুমি। কচি খুকী নাকি যে সাজব গুজব?'

কচি খুকী না হোক, সাজগোজের সমস্যাটা একটু বিপদে ফেলিয়া দিল বৈকি যশোদাকে। সাজগোজের ধার সত্যই যশোদা ধারে না, সে বয়সও নাই শখও নাই, বয়স থাকার সময়েও শখ ছিল কিনা সন্দেহ। তবু নিমন্ত্রণ বাড়িতে একখানা ভাল কাপড় তো অন্তত পরিয়া যাইতে হইবে? ভাল কাপড় কি ছাই আছে যশোদার! বাক্স খুলিয়া অনেক দিনের পুরানো খান তিনেক রঙীন শাড়ি নাড়াচাড়া করিতে করিতে যশোদা যেন ফাঁপরে পড়িয়া গেল। কোনো বিষয়ে মন স্থির করিতে যশোদার সময় লাগে না, দ্বিধা করিতে হয় না, কোন্ শাড়িখানা পরিবে ঠিক করিতে গিয়া তার যেন আজ মাথা ঘুরিয়া গেল। সস্তা দামের শাড়ি, চাকচিক্য নাই, তবু তো রঙীন! রঙীন কাপড় পরা কি তার ঠিক হইবে? কি রকম অদ্ভুত, খাপছাড়া না জানি দেখাইবে তাকে! এমনিই তো যে চেহারা তার।

'কোন্‌টা পরি বলতো নন্দ?'

'আমি কি জানি?'

বাক্সের তলায় একখানা ফিকে রঙের শাড়ি পাওয়া গেল। যশোদা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। একদিকের আঁচলের কাছে একটু ছেঁড়া আছে। তা হোক।

সত্যপ্রিয় মিল্‌স এবং আরও কতকগুলি ব্যবসার মালিক সত্যপ্রিয় এদিকে শহরতলির একপাশে প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে বাস করে। সত্যপ্রিয়র প্রচার বিভাগের পরিচালক জ্যোতির্ময়ও এ-পাড়াতে বাস করে, যশোদার বাড়ির কাছেই। সম্প্রতি জ্যোতির্ময় অপরাজিতা নামে একটি মেয়েকে হঠাৎ বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। এই নতুন বৌটির-ই আজ বৌ-ভাত।

আপিসের অনেককে বলিতে হইয়াছে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে বলিতে হইয়াছে। জ্যোতির্ময়ের বাড়িতে লোক গিজগিজ করিতেছিল। আয়োজন ভালই হইয়াছে, চাকুরে জামাইকে টাকা মেয়ের বাপ ভালরকমই দিয়াছেন, সুতরাং আয়োজন খারাপ হওয়ার কথা নয়। বৌ দেখিয়া যশোদা খুশি হইতে পারিল না। বৌ বাচ্চাই বটে, পনেরর বেশী বয়স হইবে না। বয়সের চেয়ে ঢের বেশী কচি দেখায়, কারণ শরীরের পুষ্টি হয় নাই। জ্যোতির্ময়ের বয়স ডবলেরও বেশী, এতটুকু মেয়ে কি তার সঙ্গে মানায়?

নিজের ইচ্ছায় নয়, বাড়ির লোকের অনুরোধে নয়, জ্যোতির্ময় নাকি সত্যপ্রিয়কে খুশি করিতে বিবাহ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়র একটা মত আছে, বিবাহ না করিলে দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় না। দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় নাই যার চাকুরীর উন্নতি দূরে থাক চাকুরীটা বজায় রাখাই কি তার পক্ষে কঠিন নয়? সুতরাং—

একদিন যশোদাকে জ্যোতির্ময় নিজেই এই ধরনের কথা বলিয়াছিল, মেয়ে খোঁজার সময়।

'বিয়ের জন্য কর্তা বড় খোঁচাচ্ছেন চাঁদের মা। কেবলি বলছেন, এবার একটা বিবাহাদি করে ফেলুন জ্যোতির্ময়বাবু, বিবাহাদি না করলে কি দায়িত্বজ্ঞান জন্মায়, দায়িত্বজ্ঞান না জন্মালে কি—'

যশোদা হাসিয়া বলিয়াছিল, 'তা বিয়ে করুন না, ভাল কথাই তো বলছেন উনি, খোঁটা ছাড়া কি পুরুষমানুষের চলে ?'

'তুমিও ওই দলের চাঁদের মা ? কর্তার মতামত জান না কিনা, তাই বলছ। ওঁর মতে বিয়ে করতে হলে কি করতে হবে জান, একটি সাত বছরের খুকীকে বিয়ে করতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত তাই করিয়াছে নাকি জ্যোতির্ময় ? সত্যপ্রিয়কে খুশি করার জন্য একটি খুকীকে বৌ করিয়া আনিয়াছে ? যশোদার বড় আপসোস হয়। একট বড়সড় মেয়ে হইলে কেমন মানাইত জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে ! মনিবকে খুশি করিতে কেউ যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে পারে, তাও এমন বেমানান একটি মেয়েকে, যশোদা কল্পনাও করিতে পারে না। তবে হয়তো সত্যপ্রিয় নিছক মনিব নয় জ্যোতির্ময়ের। সে নাকি জ্যোতির্ময়কে খুব স্নেহ করে। সত্যপ্রিয়র মতো ধনীর স্নেহের মূল্য জ্যোতির্ময়ের মতো মানুষেরা হয়তো এইভাবেই দেয়। এই সব লেখা-পড়া শেখা ভদ্রলোকদের রকমই আলাদা।

জ্যোতির্ময়ের বোন স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন বৌ হয়েছে যশোদাদিদি ?'

'তা মন্দ কি !'

স্বর্ণের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু এমন সাজাটাই সে সাজিয়াছে যেন বিয়ের কনেটি, আজিকার উৎসবটি যেন তারই বিবাহের ভূমিকা—সাজগোজেই যেখানে যত বর আছে সকলকে আজ সে আয়ত্ত করিয়া রাখিবে। আনন্দে ও উত্তেজনায় মেয়েটা ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, যশোদার জবাবে একটু দমিয়া গেল।

'বৌ বুঝি তোমার পছন্দ হয় নি যশোদাদিদি ?'

এত বড় মেয়ের নেকামিতে যশোদার গা জ্বলিয়া যায়। সে বলিল, 'আমার পছন্দ অপছন্দ কি বোন, আমি তো বিয়ে করি নি ? তোমার দাদার পছন্দ হলেই হল।'

দিদির পিছনে পিছনে আরও একবার বৌ দেখিতে আসিয়া নন্দ হাঁ করিয়া স্বর্ণকে দেখিতেছিল, এবার সে যশোদার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'কেন, বৌ তো সুন্দর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

যশোদা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, 'ফোঁড়ন না কেটে তুই যা তো এখান থেকে নন্দ, এত বয়স হল তোর কথা বলতে শিখলি না এখনো?'

অন্যায় কথাটা কি বলিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া নন্দ মুখ ভার করিয়া সরিয়া গেল।

বৌকে দেওয়ার জন্য যশোদা একখানা সস্তা রঙীন শাড়ি আনিয়াছিল, শাড়িখানা বৌয়ের হাতে দিতে একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া স্বুবর্ণও সরিয়া গেল। কেবল স্বুবর্ণ নয়, আরও অনেকের মনে হইতে লাগিল, বৌ-এর জন্য উপহার আনিয়া এবং এমন সস্তা একখানা শাড়ি বৌ-এর একেবারে হাতে দিয়া, যশোদা সকলকে অপমান করিয়াছে।

একে ছু'য়ে আসিয়া সকলে বৌ ছাখে। কেউ একখানা বই দেয়, কেউ সিঁদুরের কৌটা, কেউ কিছুই দেয় না। জ্যোতির্ময়ের দিদি আর বৌদিদি মেয়েদের অভ্যর্থনা করেন, পুরুষদের অভ্যর্থনা করেন জ্যোতির্ময়ের কাকা এবং দাদা। জ্যোতির্ময় নিজে একটি মটকার পাঞ্জাবি পরিয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়, সহকর্মী আর বন্ধুদের সঙ্গে একটু হাসি তামাশা করে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সদরে গিয়ে দাঁড়ায়, রাস্তায় চোখ পাতিয়া রাখে। বড় অন্যমনস্ক মনে হয় জ্যোতির্ময়কে, বড় চঞ্চল মনে হয়।

একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যপ্রিয় আসবে নাকি হে?'

জ্যোতির্ময় চমকাইয়া বলে, 'আঁ? কে, কর্তা? হ্যাঁ, আসবেন।'

ঠিক অবহেলা নয়, স্পষ্ট বোঝা যায় সত্যপ্রিয়র আগমনের আশায় অথবা আশঙ্কায় জ্যোতির্ময় কারও দিকে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারিতেছে না। আপিসের লোকেরা ব্যাপারটা বুঝিতে পারে, অন্য সকলে বুঝিতে না পারিলেও খানিক খানিক অনুমান করিতে পারে।

তারপর সত্যই সত্যপ্রিয় আসিল।

সত্যপ্রিয় এত বড় ধনী, যত না ধন তার আছে মানুষের কল্পনায় তার পরিমাণটা এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে যে, সাধারণ লোকের বাড়ি সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলে, সকলে অতিমাত্রায় ব্যস্ত ও বিব্রত

হইয়া পড়ে। এইজন্য এইসব বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার একটি সুন্দর পদ্ধতি তার নিজেকেই ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছে, সকলের আদর, অভ্যর্থনা ও ভদ্রতা করিবার ব্যাকুলতাকে লোকটা এমন কৌশলে নিজেই খানিক খানিক পরিচালনা করে, বলিবার নয়। যেখানে প্রতিনিধি পাঠাইয়া কাজ সারা যায়, সেখানে অবশ্য সত্যপ্রিয় কখনও যায় না, সকলকে সামলাইয়া চলিবার হাঙ্গামাও পোহাইতে হয় না।

মস্ত মোটর আসিয়া থামে, সত্যপ্রিয় নামিয়া আসে—খালি হাতে। জ্যোতির্ময়ের বৌ-এর মুখ দেখিবার জন্য উপহার একটা সে আনিয়াছে, কিন্তু এত বড় লোক সত্যপ্রিয়, সে কি উপহার হাতে করিয়া নামিতে পারে? উপহার হাতে থাকে ভূষণের, সে সত্যপ্রিয়র আত্মীয়, বন্ধু, চর বা অনুচর একটা কিছু হইবে। মখমলে মোড়া দামী সুদৃশ্য একটি বাক্স, দেখিলেই বোঝা যায় ভিতরে দামী কিছু আছে।

সত্যপ্রিয় নামিবামাত্র কয়েকটি চাপা গলায় উচ্চারিত হয়, 'ঐ যে উনি,' 'ঐ যে উনি'—'কর্তা এসে গেছেন।' জ্যোতির্ময়ের কাকা আর জ্যোতির্ময় অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া যায়। আর হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া, নিজের আগমনটা সহজ করিয়া দিবার জন্য, নিজে তিনি যে কতদূর নিরহঙ্কারী সরল সহজ মানুষ এটা প্রমাণ করার জন্য, সত্যপ্রিয় বলে, 'না, না, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমারি তো অপরাধ হয়ে গেল, আমাদের জ্যোতির্ময়বাবুর বাড়ির কাজ, প্রথম থেকে এসে আমারই তো সব দেখাশোনা করা উচিত ছিল—বড় দেরি করে ফেললাম' তারপর জ্যোতির্ময়ের দিকে চাহিয়া, 'কেমন লাগছে জ্যোতির্ময়-বাবু নব-বিবাহের স্বাদ? মা-লক্ষ্মীকে দেখতে পাব তো?'

বেশীক্ষণ থাকা তো উচিত হবে না, তাই ধীরে ধীরে সত্যপ্রিয় উপরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু সমস্তক্ষণ হাসিমুখে এদিকে ওদিকে চাহিয়া ছাখে, নিরুদ্বেগ শান্তভাবে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথা বলে, যেন তাড়াহুড়া কিছুই নাই, সে বহুক্ষণ থাকিবে। পিছনে পিছনে উপহার হাতে চলিতে থাকে ভূষণ।

উপরে উঠিয়া নতুন বৌ-এর সামনে দাঁড়াইয়া সানন্দ কণ্ঠে সত্যপ্রিয় বলে, 'বাঃ বাঃ, সুন্দর মুখশ্রী, চমৎকার লাবণ্য। বেঁচে থাক মা, সুখী হও।' বলিয়া ভূষণবাবুর হাত হইতে মখমল মোড়া কেসটি লইয়া অপরাজিতার হাতে দেয়।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা, অথচ ব্যস্ততা দেখাইলে চলিবে না। সুতরাং দূরের একজন পরিচিত ব্যক্তির দিকে চাহিয়া সত্যপ্রিয় উচ্চকণ্ঠে বলে, 'আমাদের জ্যোতির্ময়বাবুর কেমন ঘরটান হয়েছে দেখেছেন যোগেন-বাবু? আর কি আমরা জ্যোতির্ময়বাবুর দেখা পাব? ঘরের টানে চাকরি ছেড়ে আমাদের না ডুবিয়ে দেন!'

পরিহাসের সুরে কথাগুলি বলিতে বলিতে সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গিয়া তেমনি নিরুদ্বেগ, অচঞ্চল মন্থরগতিতে অবতরণ।

'কিছু খেতে হবে? আপনি তো জানেন জ্যোতির্ময়বাবু, আমরা সেকেলে বামুন, সন্ধ্যাহ্নিক না করে কিছু খাই না। যে ভিড় কাজের, কখন বা বাড়ি ফিরি কখন বা সন্ধ্যাহ্নিক করি। বেশ তো বেশ তো, সেজন্য কি, পাঠিয়ে দিন না বাড়িতে কি খাওয়াতে চান। সেকেলে মানুষের খাওয়াও জানেন তো—যাই পাঠান, দু'চার মণের নিচে যেমন না নামে, দেখবেন।' হাসিতে হাসিতে সত্যপ্রিয় গাড়িতে উঠিল, গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সত্যপ্রিয়র নিমন্ত্রণ রক্ষার এই পদ্ধতির সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের পরিচয় আছে, আরও দু'একটি বাড়িতে প্রায় এই রকমভাবেই সত্যপ্রিয়কে সে নিমন্ত্রণ রাখিতে দেখিয়াছে। কিন্তু একটা ব্যাপার সে আগে দ্যাখে নাই, সত্যপ্রিয়র এত দামী উপহার দেওয়া, কর্মচারীর বৌকে। একটু পরেই তার কানে আসিল, সত্যপ্রিয় একটি নেকলেস দিয়া বৌ দেখিয়াছে। চোখ ঝলসানো নেকলেস, হাজার দেড়েকের বেশীই দাম হইবে। বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইয়া জ্যোতির্ময় নিজের চোখে দেখিতে গেল। দেখিয়া আরও বেশী অভিভূত হইয়া গেল। এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!

সুবর্ণ আবার প্রায় আত্মহারা হইয়া বলিল, 'দেখেছ যশোদাদিদি, দেখেছ?'

যশোদা সংক্ষেপে বলিল, 'দেখেছি।'

সোজাসুজি চেনা না থাক, সত্যপ্রিয়র পরিচয় যশোদা কিছু কিছু জানে। এত দামী জিনিসের দাম না তুলিয়া কি সত্যপ্রিয় ছাড়িবে ? হয়তো ইতিমধ্যেই কিছু দাম তুলিয়া নিয়াছে। যে খাটুনিটাই জ্যোতির্ময় খাটে, মানুষ হইয়া গাধার মতো।

সকাল সকাল খাইয়া যশোদা বাড়ি ফিরিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সেটা সম্ভব হইল না। মেয়েদের খাইতে বসানোর সময় এমনি বিশৃঙ্খলা দেখা গেল চারিদিকে যে কখন মেয়েদের দেখিয়া শুনিয়া খাওয়ানোর ভারটা যশোদার ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া গেল সে নিজেই টের পাইল না, যশোদাকে দেখিয়া মেয়েদের মধ্যে ফিস্‌ফাস গুজগাজের অন্ত ছিল না, মাঝে মাঝে হাসাহাসিও চলিতে লাগিল, কোন্ ফাঁকে কোথা হইতে একটা ফাজিল মেয়ে ডাকিয়া বসিল, 'ওগো হিড়িম্বা, এদিকে একটু চাটনি।'

এসব যশোদা গায়ে মাখে না, অভ্যাস আছে। যেদিক হইতে ডাক আসিয়াছিল, সেদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিমুখে সে বলিল, 'খুকী-পুতুল কে চাটনি চাইলে গা ? পাঁপর নেবে ?'

অনেক রাত্রে নিজের অন্ধকার ঘুমন্ত পুরীতে ফিরিয়া যশোদার কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হইতে লাগল। হিড়িম্বা ? হিড়িম্বার মতো দেখায় নাকি তাকে ? আলো জ্বালিয়া যশোদা আয়নায় নিজের মুখখানা একবার দেখিল, কিন্তু এতটুকু আয়নায় শুধু নিজের মুখ দেখিয়া কি বোঝা যায় তাকে হিড়িম্বার মতো দেখায় কিনা ! আয়নাটি দেওয়ালে লটকাইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া যশোদা এঁটো থালা আর পাতা গুনিয়া দেখিল। একজন খায় নাই। ধনঞ্জয় না কি ?

ভাবিতে ভাবিতে ধনঞ্জয় কোথা হইতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'শোন বলি চাঁদের মা, কাল ভোরে আমি দেশে ফিরে যাব।'

'বটে নাকি ? তা বেশ তো।'

'কত পাবে বল দিকি, পাওনাটা মিটিয়ে দিই তোমার।'

'পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্যে না খেয়ে রাত দুটো পর্যন্ত জেগে বসে রয়েছ ? মাথা খারাপ নাকি তোমার ?'

ধনঞ্জয় একটু দমিয়া যায়, এদিক ওদিক চাহিয়া বলে, 'ভোর ভোর রওনা দেব কিনা তুমি আবার এত রাত জাগলে, উঠতে তোমার বেলা হবে কিনা, এইজন্যে।'

'আমার চেয়ে ভোরে উঠবে তুমি? কখন উঠে উনুনে আঁচ দিই টের পেয়েছ একদিন?'

ধনঞ্জয় আরও দমিয়া গিয়া বলে, 'রাত জাগলে কিনা—'

'একরাত জাগলে আমরা কাজে ঢিল দিই না, তোমাদের মতো নবাব বাদশা তো নই আমরা? তা ভাত খেলে না কি জন্যে? পরিবেশন করতে বলেছিলাম বলে অপমান হয়েছে বুঝি?'

ধনঞ্জয় চুপ করিয়া থাকে, যশোদা কড়া দৃষ্টিতে তার বিরাট দেহটা দেখিতে দেখিতে অবজ্ঞা মেশানো কড়া গলায় বলে, 'রোজগার করতে এসে লেজ গুটিয়ে দেশে পালাচ্ছ, ধিক তোমাকে। এত বড় দেহটা রেখেছ কি জন্যে, কাজের নামে যদি শিউরে ওঠ, ছটো পয়সা যদি না উপায় করতে পার? রোগা প্যাঁটকা এইটুকু-টুকু বাচ্চাগুলো পর্যন্ত চানাচুর, খপ্‌রের কাগজ বেচে পয়সা কামাচ্ছে শহরে, তুমি পারলে না?'

এবার ধনঞ্জয় রাগ করিয়া বলিল, 'তোমার অত মুরুব্বিপানা কি জন্যে শুনি? মানুষকে মান্যি করে কথা কইতে না পার, চুপ মেরে থাক।'

যশোদাও রাগ করিয়া বলিল, 'কাজের মুরোদ নেই, তেজ তো আছে দেখি ষোল আনা? যেও তুমি কাল সকালে দেশে ফিরে, আমার কি!

পরদিন সকালে ধনঞ্জয় দেশে চলিয়া গেল।

কেবল যশোদার উপর রাগ করিয়া নয়, শহর আর শহরতলি তার সহ্য হইতেছিল না। আরও বেশী সহ্য হইতেছিল না চাকরির জন্য চেষ্টা করিতে গেলে যা সব সহ্য করিতে হয়।

২

যশোদার বাড়িটি যেখানে, তারই কাছাকাছি শেষ হওয়া উচিত ছিল শহরতলির। কিন্তু শহরতলি যেন নিজেকে ডিঙাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শহর নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছে দূরে, বহু দূরে—শহরের দিকে পিছন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে পথের, পথের হু'পাশের বাড়ি-ঘর মাঠ-পুকুর ঝোপ-ঝাড়ের, পথচারী মানুষের মুখের ভাব ও আলাপের শহুরে ভাবটা কমিয়া আসিতে থাকে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত যেন হয় না। ধনঞ্জয় একদিন প্রায় দশ বারো মাইল হাঁটিয়া গিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়, যশোদার সঙ্গে ঝগড়া করিবার পরেই যে ঝোঁকটা আসিয়াছিল; চলিতে চলিতে তার মনে হইয়াছিল, শহরের শেষ চিহ্নটুকু পিছনে ফেলিয়া যাইতে হইলে তিনশ' মাইল তফাতে তার গ্রামের নদীটি পর্যন্ত তাকে হাঁটিতে হইবে, তারপর সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে নদী, নদী যাতে তার দেহলগ্ন শেষ শহুরে ধূলিকণাটি ধুইয়া মুছিয়া লইতে পারে। যশোদার সঙ্গে কলহের পরেই শহরের উপর ধনঞ্জয়ের বিতৃষ্ণা বাড়িয়া যাইত। একটু বসিয়া থাকিতে দেখিলেই যশোদা যে তাকে খোঁচায় এটাও ধনঞ্জয় শহুরে অমানুষিকতার পর্যায়ে ফেলিয়াছিল। যশোদা যে তার চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, হুটি কাজ যোগাড় করিয়া দিয়াছিল, এজন্য ধনঞ্জয় কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ করে নাই। যাদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদের কাছ হইতে যশোদার ভাড়া আর খাওয়ার খরচ আদায় করিবার কড়াকড়িতেও সে স্তম্ভিত হইয়া যাইত। যাদের কাজ গিয়াছে, কাজের খোঁজে আসিয়া যারা কাজ পাইতেছে না, তাদের যে যশোদা বিনা পয়সায় থাকিতেও দেয়, খাইতে পরিতেও দেয়, এতটুকু অবহেলা দেখায় না, চেষ্টা করিয়া কাজও জুটাইয়া দেয়, এদিকটা সে সময় ধনঞ্জয়ের খেয়ালও হইত না, তার শুধু মনে হইত, শহুরে মেয়েমানুষ

কি ভয়ানক! তবু যশোদার সঙ্গে কলহ করিলে মনটা বড় খারাপ হইয়া যাইত ধনঞ্জয়ের ; যশোদার সেঁতসেঁতে বাড়ির মধ্যে থাকিতেও তার দম আটকাইয়া আসিত, বাড়ির বাইরে শহরতলির আবেষ্টনীতেও ফাঁপর ফাঁপর লাগিত।

জ্যোতির্ময়েরও মাঝে মাঝে এ রকম হয়, কারও সঙ্গে কলহ না করিলেও। শহরের চেয়েও এখানকার শহরতলির জীবনের গতি তার যেন মনে হয় অনেক বেশী উর্ধ্বশ্বাসী। কাছাকাছি অনেকগুলি কল-কারখানা থাকার জন্য নয় কেবল, কাছাকাছি অনেকগুলি কলের চাকা ঘুরিতেছে বলিয়াই মানুষ জীবনের গতি বাড়ায় না, কলের চাকার গতিবেগ হাজার মাইল দূরে মানুষের জীবনেও সঞ্চারিত হইতে জানে। দুপুরবেলা বড় রাস্তায় গাড়িগুলি যেভাবে পরস্পরের গতিবেগ সংযত করে, থামিয়া থামিয়া যেভাবে অগ্রসর হয় শ্লথ গতিতে, তাতে বরং মনে হওয়ার কথা জীবনের গতি এখানে কল-কারখানার কল্যাণেই বুঝি মন্থর। কিন্তু জীবনের গতি তো চলাফেরা ছুটাছুটি নয়, বিমানে যে বোঁ করিয়া পৃথিবীটা পাক দিয়া আসিল জীবন হয়তো তার অলস ও শান্ত, ছোট একটি ডিঙি ভাসাইয়া গা এলাইয়া পৃথিবীটা পাক দিতে জীবনের বেশীর ভাগ ব্যয় হইয়া গেলেও হয়তো তার কিছু আসিয়া যায় না। শহরের চেয়ে শহরতলির মানুষের জীবনীশক্তি বেশী ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের উগ্রতা বেশী, অভাবও বেশী। বাস্তব অভাব, পার্থিব অভাব, রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনকে যে অভাব করিয়া দেয় একেবারে অভিশপ্ত। অভাবের তাড়নায় শহরের চেয়ে শহরতলির সমবেত জীবনীশক্তি অনেক বেশী তাড়াতাড়ি নিজেকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। নূতন জীবন সে ক্ষয়ের পূরণ করিয়া চলে ক্রমাগত, সে নূতন জীবন এখানে যত না সৃষ্টি হয় তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে আসে বাহির হইতে, নিকট ও দূর হইতে।

ধনঞ্জয় চলিয়া যাওয়ার পর আরও দু'জন বৈশাখ মাসের মধ্যে চলিয়া গেল যশোদার বাড়ি হইতে ; একজন দেশে আরেকজন স্বর্গে অথবা

নরকে মৃত্যুর যদি অন্য কোনো দেশ থাকে সেইখানে। সত্যপ্রিয় মিল এবং আরও কয়েকটা মিলে বড় রকমের একটা ধর্মঘটের উপক্রম হইয়া থামিয়া গেল। পাড়ায় ছেলেদের 'মডার্ন ক্লাব ও লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব হইয়া গেল, সত্যপ্রিয় আসিয়া একটি স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিল। আমাদের দেশের আগেকার অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া কত যে তাতে হা-হুতাশ আর বার তিনেক ইংরাজের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা করিবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ। 'মডার্ন ক্লাব ও লাইব্রেরী'র পক্ষে প্রবন্ধটি একটু খাপছাড়া হইল বটে, কিন্তু পাঁচশত টাকা দান করিয়া যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁকে নিজের ইচ্ছামতো প্রবন্ধ পাঠ করিতে না দিলে তো চলে না। তাছাড়া মতামত যেমনই হোক, আগাগোড়া দেশের জন্য কি গভীর মমতা প্রবন্ধটিতে প্রকাশ পাইয়াছে! দেশের দুরবস্থার, বিশেষত যুবকগণের বেকার সমস্যার যে শোচনীয় বর্ণনা আছে, শুনিতে শুনিতে কী গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়! কেমন একটা প্রেরণা জাগে মনের মধ্যে যে অন্য চিন্তা চুলোয় পাঠাইয়া হাসিমুখে আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মতো বাজে গোঁয়ার্তমি ভুলিয়া গিয়া, বড় কিছু করা আর বড় কিছু হওয়ার মরীচিকাকে প্রশ্রয় না দিয়া, ভবিষ্যতে যাতে কোনো রকমে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকা যায় প্রথম বয়স হইতেই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা কর্তব্য।

নন্দ উৎসবে গিয়াছিল, বাড়ি ফিরিয়াই বলিল, 'একটা চাকরি না হলে আর চলবে না দিদি।'

রাত তখন দশটা বাজিয়াছে। যশোদা বলিল, 'তুমি যদি চাকরি করবে তো কেত্তন গেয়ে দিন কাটাবে কে? কাল সকালতক সুবুদ্ধি টিঁকবে না, টেঁকে তো কাল সকালে চাকরির ভাবনা ভাবিস। এখন খেয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দে তো, গরমে সিদ্ধ হলাম।'

ভাইকে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল, 'মতিবুড়ো আর সুধীর এখনো ফেরে নি। জ্বালিয়ে খেলো দুটোতে আমাকে—চাকরানী পেয়েছে আমায়। কাল যদি না তাড়াই দুটোকে—'

আজ গুমোট দিয়া এমন গরম পড়িয়াছে যে, রাত্রে ঘরের মধ্যে যশোদার ঘুম আসিল না। ঘণ্টাখানেক এপাশ ওপাশ করিয়া আর প্রাণপণে হাতপাখা চালাইয়া সে উঠিয়া গেল ছাতে, ভাবিল বাকী রাতটা ছাতেই মাহুর পাতিয়া শুইয়া থাকিবে। ছাতে গিয়া ত্যাখে কি, তিল ধারণের স্থান নাই। দশ-বারোজন মানুষ এলোমেলোভাবে মাহুর আর ছেঁড়া শতরঞ্জি বিছাইয়া সমস্ত ছাতটি দখল করিয়া আছে, কেউ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেউ বসিয়া বসিয়া টানিতেছে বিড়ি।
ছু-চারজন মানুষ হইলে যশোদা হয়তো গ্রাহ্য করিত না, একপাশে মাহুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িত। কিন্তু এতগুলি পুরুষের সঙ্গে ঘেঁযাঘেঁষি করিয়া মেয়েমানুষ কি ঘুমাইতে পারে!
মতি আর স্থধীর খানিক আগে ফিরিয়া আসিয়াছে, ঘরের ভিতর হইতেই যশোদা সেটা টের পাইয়াছিল। কিছু না বিছাইয়াই ছু'জনে একপাশে শুইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় যশোদাকে ছাতে আসিতে দেখিয়া। ছু'জনে নেশা করিয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাত বারোটা বাজিতে না বাজিতে ফিরিয়া আসিয়ছে কেন? কি কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে ছু'জনে কে জানে!
আলিসায় বসিয়া একজন বিড়ি টানিতেছিল, বলিল, 'বড় গরম, না চাঁদের মা?'
যশোদা ঠাহর করিয়া দেখিল, তার অন্য বাড়ির ভাড়াটে জগৎ। একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'তুমি এ বাড়িতে ঢুকলে কখন?'
জগৎ বলিল, 'মতি আর স্থধীর দরজা খোলার জন্মে ডাকছিল, শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ভাবলাম কি, তোমার এ বাড়ির ছাতে যদি একটু হাওয়া পাই, তা শালার হাওয়া কই! ই কি গুমটো গরম গো চাঁদের মা, এঁ্যা?'
যশোদা কাছে আগাইয়া গেল, 'গরম তো বটে, কিন্তু তোমার কি চোখে ঘুম নেই, রাতত্বপুরে বসে বসে বিড়ি টানছ? সকাল সকাল যেতে হবে না কাজে?'
'ঘুম না এলে করব কি বল? ঘরে গরমে সিদ্ধ করে দিল, ছাতে এলাম

তা এখানে যেমনি গরম তেমনি মশা।'—বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাঁধের কাছে সশব্দে চড় মারিয়া জগৎ মশা মারে; গরমটা যশোদা নিজেও অনুভব করিতেছে, মশার উৎপাতও যে কম নয় তারও তো একটা প্রমাণ দেওয়া চাই! আলিসায় ভর দিয়া যশোদা কিন্তু ভাবে যে, কে জানে গরম আর মশা-ই তোমায় জাগিয়ে রেখেছে না কারুর কথা ভেবে তোমার চোখে ঘুম নেই!

'দেশে মশা নেই তোমাদের?'

'আছে না? মানুষ টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন মশা।'

'আমায় টেনে নিতে পারবে না, কি বল? তেমন গতর আমার নয়।' বলিয়া আলিসায় ঠেসান দিয়া যশোদা একটু হাসিল। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অকারণে নিজের দেহের বিপুলতার কথাটা যশোদার মনে পড়িয়া যায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ঘুমন্ত মানুষগুলিকে আবছা দেখা যাইতেছিল। সকলেই ঘুমের মধ্যে অল্প-বিস্তর নড়িতেছিল, কেবল মতি আর সুধীর মটকা মারিয়া থাকায় দু'জনে হইয়াছিল কাঠের মূর্তির মতো স্থির।

'গতর বড় হলে গরমটা বেশী লাগে, না জগৎ? সবাই ঘুমুচ্ছে ছাখো, আমার গরমে প্রাণটা বেরিয়ে গেল।'

'গতরের জন্যে নয়, গরমটা সত্যি যেন কেমন খারাপ হেথা, গায় সয় না। দেশের গরম এমন নয়।'

যশোদা তা জানে। যারা অল্পকাল শহরে আসিয়াছে দেশ ছাড়িয়া, দেশের গরমটা পর্যন্ত তাদের ভাল লাগে। তা না হইলে ধনঞ্জয় অমনভাবে দেশে পলাইয়া যায়?

'আচ্ছা, একটা কথা তোমায় শুধোই জগৎ, ঠিক মতো জবাব দিও, মন রাখা কথা বোলো না, এ্যাঁ? আমি খুব মোটা, না?'

'মোটা? উঁহু, মোটা তো তুমি নও চাঁদের মা? একটু বাড়ন্ত গড়ন তোমার, বাস্।'

শুনিয়া খুশি হইয়া জগৎকে শুইয়া পড়িতে বলিয়া যশোদা নিচে নামিয়া গেল। ঘরের মধ্যে প্রাণপণে পাখা নাড়িতে নাড়িতে এক সময় ঘুমাইয়াও

পড়িল।

সকালে কলতলার কাজ সারিয়া রান্নাঘরে জলের বালতি দু'টি নামাইয়া রাখিয়া যশোদা আবার ছাতে গেল। প্রায় সাতটা বাজে, জ্যোতির্ময়ের দোতলা বাড়ির পাশ কাটাইয়া যশোদার ছাতের অর্ধেকটাতে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। রোদের মধ্যেই এখনও পড়িয়া ঘুমাইতেছে তিন-জন—জগৎ, মতি আর সুধীর। জগৎ মন কেমন করায় রাত জাগিয়াছিল, অন্য দু'জন করিয়াছিল নেশা। দরদ অথবা মদ, যে নেশার ফলেই হোক মানসিক কোমলতা আনিবার কি সুন্দর আরামজনক পরিণাম! যশোদা প্রথমে মতি আর সুধীরকে ঝাঁকানি দিয়া তুলিয়া দিল, তারপর ডাকিয়া তুলিল জগৎকে।

মতি আর সুধীর হাই তুলিয়া গা হাত মোড়া দিয়া বিড়ি ধরাইয়া একটু আরাম করিতে যাইতেছিল, যশোদা বলিল, 'তোমরা দু'জনে ভাত পাবে না এবেলা। চানটি করে নিয়েই দৌড়ে কাজে চলে যাও। ছুটতে ছুটতে গেলে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে।'

দু'জনেই বিড়ি কোমরে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল। মতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'ভাত হয় নি যশোদা? খিদেয় নাড়ীতে পাক দিচ্ছে।'

যশোদা ছাতে ছড়ানো মাদুর ও চাটাইগুলি একটি একটি করিয়া গুটাইয়া তুলিতেছিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'যশোদা কে গো মতিবাবু মশায়, জিজ্ঞেস করি তোমাকে?'

মতির চুল প্রায় সাদা হইয়া আসিয়াছে, কুলি-মজুরও তাকে ঠিক বলা যায় না, কারণ সত্যপ্রিয় মিলে গাঁটের উপর আলকাতরা দিয়া সঙ্কেত, অক্ষর ও সংখ্যা আঁকিয়া দেওয়া তার কাজ। সে নাম ধরিয়া ডাকিলে যশোদার রাগ করা উচিত নয়, সব সময় রাগ সে করেও না। কিন্তু যশোদার মেজাজ বোঝা ভার। হাসি ও প্রশ্নে মতি কাবু হইয়া পড়ায় যশোদা নিজেই আবার বলিল, 'আমাকে ডাক্‌ছ নাকি যশোদা বলে? কাল একপেট গিলে সাহস বেড়ে গিয়েছে, নয়? সবাই চাঁদের মা বলে, তুমি না হয় তাই বললে। একবার বলো তো কেমন শোনায় দেখি?'

মতি ভয়ে ভয়ে বলিল, 'ভাত হয় নি চাঁদের মা?'

যশোদা বলিল, 'ভাত হবে না কেন, তোমরা এবেলা পাবে না ভাত। চান করে মাথা ঠাণ্ডা করে নিয়ে ছুটে যাও দিকি কাজে, কাজে না গেলে একটি বেলাও ভাত জুটবে না মতি।'

কাজে গেলে যে যশোদাই তাকে দু'বেলা ভাত যোগাইবে যতদিন আবার কাজ না হয়, মতিও তা জানে যশোদাও জানে। তবে সেটা তর্কের বিষয় নয়, মতি ও সুধীর কথা না বলিয়া নিচে চলিয়া গেল। এখানে বাস করিলে মদ খাওয়া চলিবে না। এই ধরনের একটা নিয়ম যশোদা করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু নিয়মটা ভাঙিলেই সে যে সব সময় শাস্তির ব্যবস্থা করে তা নয়। এদের জীবনের সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, জীবনের যে স্তরে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এরা বাস করে তাও তার অজানা নয়। কঠোর নিয়ম করিলে চলিবে কেন? কে সে নিয়ম মানিয়া চলিবে? কি দরকার সে নিয়ম মানিয়া চলিবার জীবন যাদের সবদিক দিয়া ফাঁকিতে ভরা? কেবল একটা বিষয়ে সাধু হইলেই কি দিনগুলি ওদের সুখে আর আরামে ভরিয়া উঠিবে! অতিরিক্ত অবিশ্রাম খাটুনি, পেটভরা খাদ্য আর বিরাম ও আরামের অভাব, সমস্তই যাদের বিষের সমান, দু-এক চুমুক বাড়তি বিষ পান করিলে, তাদের কি আসিয়া যায়! কেবল বাড়াবাড়িটা রদ করিবার জন্য যশোদা মাঝে মাঝে রাগ দেখায়, শাস্তি দেয়, তবে শাস্তিটা হয় একটু খাপছাড়া ধরনের, যেন দুরন্ত ছেলেকে শাসন করিতেছে এমনি।

নিচে নামিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া যশোদা ডাক দিল, 'নন্দ, একটু পরিবেশন করবি আয় দিকি দাদা।'

নন্দ আসিলে ভাত বাড়িতে বাড়িতে যশোদা বলিল, 'কাল তো বলছিলি চাকরি নইলে চলবে না, আজ যা না একবার জ্যোতিবাবুর আপিসে?'

'কি হবে গিয়ে? কাজ দেবার মতলব ওদের নেই।'

যশোদা রাগ করিয়া বলিল, 'কাজ দেবার মতলব কার থাকে রে ছোঁড়া? কাজ আদায় করে নিতে হয়। যা চেহারাটি করেছ নিজের, ভরসা করে কে তোমাকে কাজে লাগাতে চাইবে? জ্যোতিবাবুকে বলছি গিয়ে

আরেকবার, দুপুরবেলা একবার যাস। পয়সা চেয়ে নিয়ে যাস্ ট্রামের।'

নন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচটি থালায় যশোদার ভাত বাড়া দেখিতে লাগিল। দরজা দিয়া দেখা যায় খাইতে বসিয়াছে তিনজন, পাঁচ থালা ভাত বাড়িবার দরকার? চাকরির সমস্যার চেয়ে এই সমস্যাটাই যেন নন্দকে পীড়ন করিতে লাগিল বেশী। শেষে থাকিতে না পারিয়া যশোদার ভুল সংশোধনের জন্য বলিল, 'পাঁচ থালা বাড়ছ যে? তিনজন বসেছে মোটে—কেষ্ট, যতীন আর বলাই।'

'য থালা বাড়ি তোর তাতে কি? তিনজন বসেছে তো আর কেউ বসতে জানে না?' থালায় ভাজা, আলুসিদ্ধ আর চচ্চড়ি সাজাইয়া দিয়া যশোদা বাহির হইয়া গেল। রান্নাঘরেই যে কথা নন্দকে অনায়াসে বলা চলিত, উঠানে দাঁড়াইয়া সেই কথাগুলি পাড়াসুদ্ধ লোককে শুনাইবার মতো জোর গলায় বলিল, 'যার যা লাগে দিসরে নন্দ, আমি বাজারে গেলাম।'—মতি আবার একটু কানে কম শোনে, ঘণ্টাখানেকের মতো যশোদা বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছে না জানিলে তাড়াতাড়ি দু'টি ভাত খাইয়া কাজে যাইবার সাহস বুড়োর হইবে না।

বাজারে যশোদা যায় বটে, এ সময় কোনোদিন যায় না। এত সকালে বাজারও ভালরকম বসে নাই, বাড়িতেও দু'য়ে-চারে উনিশটি মানুষকে ভাত দেবার হাঙ্গামা। নন্দ একা কেন সামলাইতে পারিবে? তবু যশোদা বাড়ির বাহির হইয়া গেল। পেট ভরিয়া দু'টি ভাত-তরকারী খাইতে পাওয়া যাদের জীবনের চরম বিলাসিতা, পেট ভরাইয়া কাজে গেলেও দিনটা অর্ধেক কাবার হইতে না হইতে যাদের পেটে আবার ক্ষুধার আগুন জ্বলিতে থাকিবে, নিজে ভাত বাড়িয়া তাদের খাওয়ানোর দায়িত্বটা যশোদা হঠাৎ যেন ভুলিয়া গিয়াছে!

যশোদার এ বাড়ির সদর দরজাটি সরু ও সেঁতসেঁতে গলিতে, দু'পাশে টিন আর খোলার বাড়ি। আরও একটি বাড়ি আছে যশোদার, কতগুলি টিনের ঘরের সমষ্টি। গলিটি হাত তিনেক চওড়া, যশোদার বাড়ি দু'টির মধ্যে ব্যবধানও হাত তিনেক, দু'টি বাড়ির সদরদরজাও প্রায় মুখোমুখি। ও-বাড়িটাকে যশোদা চিড়িয়াখানা বলে, এই চিড়িয়াখানার জীবগুলির

বাস করিবার ব্যবস্থা প্রধানত স্ত্রী-পুরুষে জোড়ায় জোড়ায়। মাঝে মাঝে জোড় ভাঙিয়া যায়, যশোদার চেষ্টাতেও আর জোড়া লাগে না, মাঝে মাঝে নূতন জোড়া বাস করিতে আসে পুরানো জোড়া বিদায় নেয়। জোড় ভাঙিয়া হোক, এক সঙ্গে হোক, বিদায় যারা নেয় হয়তো পাড়াতেই কোনো বাড়িতে তাদের দেখা যায়, হয়তো কোনোদিন আর তাদের পাত্তাও মেলে না। শহরের চারিদিকেই শহরতলি, একদিকের শহরতলি হইতে আরেকদিকের শহরতলিতে গেলেও দূরদেশে যাওয়ার মতোই মানুষ হারাইয়া যায়।

বাড়িটাতে ছেলেমেয়ে আছে এক গাদা—বাহির হইতেই নানা বয়সের ছেলেমেয়ের হৈ-চৈ হুল্লোড় ও কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। একখানা ঘর আর রান্নার জন্য আনাচে-কানাচে একটু জায়গা, এই তো রাজ্য এক-একটি ভাড়াটের, এত রাশি রাশি ছোট-বড় ছেলেমেয়ে কোথায় গুদামজাত করা থাকে ভাবিলে সত্যই বিস্ময় বোধ হয়।

আগে, দু'টি বাড়িই যশোদা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে ভাড়া দিত, ভাড়াটেরা কি করে না করে সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া মাসে মাসে ভাড়াটা পাইলেই খুশি থাকিত। অভিজ্ঞতা জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে ক্রমে যশোদার জ্ঞান হইয়াছে যে, সংসারে যত গণ্ডগোলের গোড়া মেয়েমানুষ। জ্ঞান জন্মিবার পর এদিকের বাড়িটাকে ঘরোয়া মেস বা হোটেল বা ঐ ধরনের একটা কিছুতে পরিণত করিয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

বলিয়াছে, 'না বাবু, সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল।'

কোন্‌টা যে তার সুখ ছিল আর কোন্ স্বস্তিটা যে তার ভাল হইয়াছে, দু'বাড়ির আবহাওয়ার পার্থক্যই সেটা পরিষ্কার ঘোষণা করিয়া দেয়।

এ-বাড়িতে দু'খানা পাকা ঘর সে নিজের দখলে রাখিয়াছে। একটি ঘরে থাকে তার আসবাবপত্র, অন্য ঘরটিতে থাকে সে আর তার ভাই নন্দ। ঘর দু'খানা একটু পিছনের দিকে, মাঝখানে সিঁড়ির নিচে একটা দরজা আছে সেটা বন্ধ করিলে বাড়ির সঙ্গে ঘর দু'খানার আর যোগ থাকে না। আগে যশোদা দরজাটা নিয়মমতো বন্ধ করিত, আজকাল

গ্রাহ্যও করে না। এর দু'টি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত তার গায়ে এত জোর যে এ-বাড়িতে এমন একটিও পুরুষ নাই যে, তার হাতের একটা চড় খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, দ্বিতীয়ত নিজে সে যে স্ত্রীলোক এটা তার সব সময় খেয়ালও থাকে না।

শেষোক্ত কারণটা যশোদার শত্রুও স্বীকার করে। যশোদার সবচেয়ে বড় শত্রু তার ছেলেবেলার সখী কুমুদিনী, পাড়াতেই স্বামীপুত্র সংসার লইয়া সে বাস করে। যশোদার কথা উঠিলেই তাকে বলিতে শোনা যায়: 'ওটা কি মেয়েমানুষ? ও মেয়েমানুষের বাবা!' আরও অনেক কথা সে বলে, বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া ওঠে। তারই সংজ্ঞা অনুসারে যশোদা যে মেয়েমানুষ নয় মেয়েমানুষের বাবা, এ কথাটা ভুলিয়া গিয়া নাক সিঁটকাইয়া তীব্র আবেগের সঙ্গে সে আবার বলে, 'পুরুষের গাদি বাড়িতে, তার সবকটা হয় মাতাল নয় গুণ্ডা, মেয়েমানুষ হয়ে কি করে যে ওদের মধ্যে থাকে, মাগো!'

একটু খাপছাড়া জীবন-যাপন করে বৈ কি যশোদা, একটু অনন্যসাধারণ বৈ কি তার রীতিনীতি চাল-চলন, কিন্তু খুব বেশী বে-মানান যেন তার পক্ষে হয় না। এরকম অবস্থায় অন্য কোনো স্ত্রীলোক হয় পুরুষের আশ্রয় খুঁজিত, নয় মানুষের মতবাদ ও নির্দেশের চাপে ধ্বংস হইয়া যাইত, যশোদা কিছুই করে নাই। জীবনযাপন করে সে স্বাধীন, কারও কাছে তার কোনো প্রত্যাশা নাই, নিন্দা প্রশংসা সে গ্রাহ্য করে না, কারও দরদের জন্য কাঁদিয়াও মরে না। বিপদে-আপদে তারই কাছে মানুষ উপকার পায়, পুরুষের কাছে যে কাজ পাওয়া কঠিন যশোদার কাছে তাই পাওয়া যায়। লম্বা-চওড়া শক্ত-সমর্থ শরীরটাতে তার নারীসুলভ লাবণ্য ও কোমলতার চিরদিন এমন অভাব যে, বয়স যখন আরও কম ছিল তখনও কোনো পুরুষের সঙ্গে তার বৈধ বা অবৈধ প্রেমের সম্বন্ধ থাকিতে পারে একথাটা মনে আনিতেও লোকের কেমন সঙ্কোচ বোধ হইত, মনে হইত, না, তা হয় না।

একটা গুজব শোনা যায়। দশ-বারো বছর আগেকার কথা, যশোদা যখন সবে ভদ্র অভদ্র নির্বিশেষে ঘর-ভাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়র

বাগানবাড়িটা তখন নাকি কেবল ঝোপ-ঝাপে ভরা বাগান ছিল, চারিদিকের প্রাচীর ছিল ভাঙা। বাগানের মধ্যে গাছপালার আড়ালে একটা আখড়া ছিল কুস্তির এবং সেই আখড়ার ওস্তাদ ছিল কেদার নামে একজন মাঝবয়সী লোক। মাথা গিয়া ঠেকিত ঘরের ছাতে, দরজা দিয়া যাতায়াত করিতে হইত পাশ ফিরিয়া, রাস্তায় ষাঁড়কে সরাইয়া সে পথ চলিত। মানুষ যে অমন জোয়ান হয় তাকে যারা চোখে না দেখিয়াছে তাদের কি তা বিশ্বাস হয়? রূপকথার রাজপুত্রের মতো কোথা হইতে আসিয়া দু'একটা বছর ও পাড়ায় বাস করিয়া, পাড়ার ছেলেদের কুস্তি শিখাইয়া, পদক্ষেপে দু'পাশের বাড়ি কাঁপাইয়া পথ দিয়া হাঁটিয়া কে জানে আবার সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সে চলিয়া যাওয়ার পর বিশ্বসংসারে যশোদা নাকি আর পুরুষ দেখিতে পায় না, সকলে তার কাছে শিশু। আজও যশোদা তার সেই ভালবাসার লোকটির পথ চাহিয়া আছে।

যশোদা শুনিয়া হাসে—'তা নয়? চেয়ে চেয়ে চোখ ভেরে গেল সত্যি। ইবারে যদি না চশমা লি—'

অনেকেই মনে মনে বলে, 'মরণ তোমার, বেহায়া!' কিন্তু দু'চারজন ভাবপ্রবণ যারা আছে তারা মনে মনে বলে, 'আহা!' ব্যাকুল আগ্রহে তারা যশোদার মুখে একটু বেদনার ছাপ খোঁজে, চোখের দৃষ্টিতে একটু ব্যথার আভাস দেখিতে চায়। কিন্তু হায়রে, যশোদার হাতির দেহে হাতির প্রাণ, এক মুহূর্তের জন্য যদি তার চোখে-মুখে স্বপ্নময় ব্যথিত বেদনার ছাপ দেখা গেল!

বাড়ি দু'টিতে যশোদা যদি কেবল গরীব ভদ্রগৃহস্থদের ভাড়াটে রাখিত তবে কোনো কথা ছিল না। প্রথমে কিছুকাল ঐরকম ভাড়াটে যশোদা খুঁজিত, মাল সরকার, ট্রামের কণ্ডাক্টার, প্রেসের কম্পোজিটার এই শ্রেণীর ভাড়াটের নিচে সে নামিত না। তারপর সমস্ত বাছ-বিচার তুলিয়া দিয়াছে। ভদ্রলোকেরা নাকি বড় বেশী ছোটলোক, যারা পুরা ভদ্রলোকও নয় খাঁটি ছোটলোকও নয়, তারা নাকি একটা অদ্ভুত অপদার্থ জীব। তার চেয়ে কুলি-মজুর ভাল। বাবুদের চক্ষুলজ্জা আছে,

কুলি-মজুরের ভয়ডর আছে, কিন্তু না-বাবু না-কুলি-মজুরদের চক্ষুলজ্জাও নাই, ভয়ডরও নাই। সাহসের অভাব হইলে যে ভয়ডর হয় সে ভয়ডরের কথা যশোদা বলিতেছে না, ও-রকম ভয়ডর এ শ্রেণীর লোকগুলির পুরামাত্রাতেই আছে, সে হিসাবে ওরা সব কেঁচোর মতো অপদার্থ জীব, ওদের ভয়ডর নাই ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে, তিল তিল করিয়া আত্মহত্যা করা সম্বন্ধে আর ওদের উপর যাদের বাঁচিয়া থাকা নির্ভর করে তিল তিল করিয়া তাদেরও হত্যা করা সম্বন্ধে। কেমন যেন চালচলন ওদের, কেমন যেন ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্যের হিসাব, কোকেন-খোরদের মতো। মা বোন যখন খাইতে পায় না, বৌ যখন ধুঁকিতে ধুঁকিতে রান্না করে, পথ্য না দিয়া ছেলেকে কেবল ওসুধ খাওয়াইতে হাসপাতালের ডাক্তার যখন বারণ করিয়া দেন, তখনও সকলের কথা ভুলিয়া গিয়া বাহিরে পুরুষমানুষের স্ফূর্তি করিবার ব্যাপারটা যশোদা বুঝিতে পারে। কিন্তু তখন দুশ্চিন্তায় মুখ পাংশু করিয়া কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে অদৃষ্টকে গাল দিয়া চকচকে জুতাটি পরিয়া চুলে সিঁথি কাটিতে দেখিলে যশোদার রক্তে আগুন ধরিয়া যায়। সাজিতে পার, হাসিতে পার না লক্ষ্মীছাড়া? গুনগুন করিয়া গান ধরিতে পার না আপনজনের রোগ দুঃখ দুর্দশাকে উপেক্ষা করিয়া? তবে তো যশোদার কিছুই বলিবার থাকে না! সর্বাঙ্গে বাবুত্বের অভ্যাসকে আমল দিয়া দোকান ঘরের সাইনবোর্ডের মতো কেবল মুখে দুর্ভাবনার বিজ্ঞাপন লটকাইয়া আবার কোন্ দেশী দরদ দেখানো?

বাজারে যশোদা গেল না, এ বাড়ির সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া ও বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই মনে হইল যেন নূতন জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বাস করিলে আর সৃষ্টিরক্ষায় মন দিলেই কি তাদের জগৎ এমনভাবে বদলাইয়া যায়? এই সকালবেলাই ছেলে-মেয়ের কলরবে আর স্ত্রী-পুরুষের কলহে বাড়িটা সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। কলতলাতে মেয়েদের মধ্যেই ঝগড়া বেশী। পিছনের ছোট পুকুরটি বুজাইয়া দিবার পর আজকাল উঠানে কলের জলের জন্য

রীতিমতো মারামারি হয়। চার পাঁচজন ছাই দিয়া প্রাণপণে বাসন মাজিতেছে, একজন কলসীতে জল ভরিতেছে, হু'জন দাঁড়াইয়া আছে স্থান খালি হইবার প্রতীক্ষায়। আরেকটা কল এ বাড়িতে করিয়া না দিলে চলিবে না। দরখাস্ত যশোদা অনেকদিন আগেই করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কি যে হইয়াছে তার দরখাস্তের, আর কোনো পাত্তাই মিলিতেছে না। তাগিদ দিতে গেলে প্রকাণ্ড আপিসের এ বলে ওর কাছে যাও, ও বলে তার কাছে যাও, ভাল করিয়া কথার জবাবটাও দিতে চায় না কেউ। একটা জলের কল বসাইবার অনুমতি চাহিয়া এত হাঙ্গামা সহিতে হয়, কে জানে শহরের জলের দেবতারা এমন উদাসীন কেন!

এ বাড়িতে ঢুকিলেই একটা ভাপসা ধোঁয়াটে দুর্গন্ধ যশোদার নাকে লাগে। একা মানুষ যশোদা কিন্তু একাই সে তার ও বাড়িটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এ বাড়িতে মেয়েমানুষ দু'গণ্ডার কম নয়, কিন্তু নোংরামি কিছুতেই ঘুচিতেই চায় না। উঠানের একপাশে একগাদা আবর্জনা জমিয়া আছে, রাস্তার একটা লোমওঠা কুকুর কোন্ ফাঁকে ভিতরে ঢুকিয়া আবর্জনা ঘাঁটিয়া খাবার খুঁজিতেছে, কারও সেদিকে নজর নাই।

ওদিকের ভিজা রোয়াকে চিত হইয়া পড়িয়া পরেশের সাত মাসের ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়িয়া চেঁচাইতেছে, তার দিকেও নজর দিবার কারও অবসর নাই। কাছেই তার মা পরেশের বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচে মস্ত একটা ঘায়ে মলম লাগাইয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়াইয়া দিতেছে। মাসখানেক শয্যাগত থাকিয়া পরেশ এখন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতে পারে। মোটরের ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গিয়া নাকি ঘা হইয়াছে। কথাটা যশোদা বিশ্বাস করে নাই। বছর দুই আগে ঠিক এইরকম অকস্মাৎ একবার পরেশের একটা হাতও ভাঙিয়াছিল, শহরের অপরদিকের শহরতলিতে প্রাচীর ডিঙাইয়া একটা বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকিবার জন্য কয়েকমাস জেলও হইয়াছিল। তারপর এতদিন যশোদার এখানে থাকিয়া নিয়মমতো কাজে গিয়া ভালভাবেই সে দিন কাটাইতেছিল;

হঠাৎ আবার চুরি করার ঝোঁক চাপায় বোধ হয় এই দুর্দশা হইয়াছে। লোকটার সম্বন্ধে কি যে করিবে যশোদা ভাবিয়া পায় না। চোরকে বাড়িতে থাকিতে দেওয়া কি উচিত, আরও কতগুলি পরিবার যে বাড়িতে থাকে? চুরি করিতে গিয়াই হাঁটুর নিচে ঘা হইয়াছে এটা নিশ্চিতভাবে না জানিয়া ছেলে বৌ-সুদ্ধ একটা লোককে তাড়াইয়া দেওয়াও কি উচিত? বিশেষত একমাস ঘরে বসিয়া থাকার জন্য লোকটার যখন চাকরি নাই?

'তোমার পা কেমন আছে পরেশ?'

সঙ্কোচ ও অপরাধভরা হাসি হাসিয়া পরেশ বলিল, 'একটু ভাল চাঁদের মা। আর সাতটা দিন, তারপর—'

'নিজে তো ন্যাকড়াটা জড়িয়ে নিতে পার পায়ে? হাত দুটো তো যায় নি তোমার? ছেলেটা চেঁচিয়ে মরল, কোলে নাও না খোকার মা? কি যে তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান বাছা, বুঝিনে কিছু।'

পরেশ তবু হাসে, আরও বেশী সঙ্কোচ, আরও বেশী অপরাধভরা হাসি। মানুষের কাছে এই একটিমাত্র মুখভঙ্গি পরেশ করিতে জানে, তার বড় বড় টানা চোখ দু'টির খাপছাড়া সৌন্দর্যের মতো এ মুখভঙ্গি অর্থহীন।

ওদিকের কোণের ঘরে নদেরচাঁদের বৌ অনেকদিন জ্বরে ভুগিতেছে। তার খবরটা জানিবার জন্য যশোদা পা সবে বাড়াইয়াছে, কলতলায় এক কাণ্ড হইয়া গেল। জগতের বোন কালো একটু স্থান করিয়া বাসন মাজিতেছিল, কোথা হইতে নদেরচাঁদের মেয়ে চাঁপা আসিয়া তাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া নিজে সেখানে বসিয়া পড়িল।

'আমি আগে বাসন রেখে গেছি।'

কালো মুখ কালো করিয়া বলিল, 'ধাক্কা দিলে কেন? মুখে বলতে পারতে না?'

কালোর স্বাস্থ্য ভাল, চাঁপার মতো সে রোগা নয়। কিন্তু শহরতলিতে সে আসিয়াছে অল্পদিন আগে দেশের গাঁ হইতে, এখনো শহরতলির শহুরে মেয়েদের সঙ্গে কলতলার যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। মুখ ভার করিয়া সে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বাসন মাজিতে আরম্ভ

করিয়া চাঁপা মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'রাগিস কেন? কত্খন লাগবে এ'কটা বাসন মাজতে?'

ধাক্কাটা যে চাঁপা শুধু আগে বাসন মাজিবার সুযোগ পাওয়ার জন্য দেয় নাই, যশোদা তা জানে। একবার ভাবিল চাঁপাকে ধমক দেয়, তারপর ভাবিল, কি হইবে ধমক দিয়া? শক্ত-সমর্থ যে মেয়ে মুখ বুজিয়া এমন ধাক্কাটা সহ্য করে, তার হইয়া কিছু করিতেও যশোদার ভাল লাগে না। কালোর উপর চাঁপার বড় দ্বেষ, কোনো দোষ নাই কালোর, তবু চাঁপা তাকে দেখিতে পারে না। প্রকারান্তরে দোষ আছে কালোর, চাঁপার সুখের পথে সে কাঁটা হইয়া আছে। চাঁপার মা ক্রমাগত জ্বরে ভোগে, চাঁপার বাবা নদেরচাঁদ নেশার ফাঁদে পড়িয়া অকালে বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে, বড় কষ্টে দিন কাটে চাঁপার। এতদিনে একটু সুখের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে চাঁপার। জগৎকে সে কি করিয়া বাগ মানাইয়াছে সেই জানে, বোধ হয় সেও অল্পদিন শহরে আসিয়াছে বলিয়া শহুরে মেয়েটাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। মাস ছয়েক আগে জগতের বৌ মরিয়া গিয়াছিল, তার তিনমাস পরে সকলে জানিয়াছে, চাঁপার সঙ্গে জগতের বিবাহ হইবে।

কোন্ কালে বিবাহটা হইয়া যাইত, ও-ঘর হইতে জগতের এ-ঘরে আসিয়া জগতের রোজগারে ভাগ বসাইয়া আরামে চাঁপা দিন কাটাইতে পারিত, পোড়ারমুখী কালোর জন্য সব আটকাইয়া আছে। কালোর বিবাহ না দিয়া জগৎ নিজে আবার বিবাহ করিতে পারিতেছে না। একদিকে বাধা দিতেছে তার আধ-পাগলা মা, অন্যদিকে আটকাইতেছে টাকায়।

'তোর মা কেমন আছে লো চাঁপা?' যশোদা জিজ্ঞাসা করিল।

'জ্বর নেই গো যশোদাদিদি।'

চাঁপার মার ঘরে উঁকি দিয়া যশোদা জগতের ঘরে গেল। ঘরের কোনায় ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে নতুন বৌটির মতো মস্ত ঘোমটা টানিয়া জগতের মা বসিয়াছিল আর আপনমনে বিড়বিড় করিয়া বকিতেছিল। বৌ সাজিবার পাগলামিটাই জগতের মার বেশী প্রবল।

দরজার কাছে বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে খোলা দরজা দিয়া জগৎ চাহিয়াছিল কলতলার দিকে। যশোদাকে দেখিয়া দৃষ্টিও সরাইয়া নিল, একটু ভিতরের দিকে সরিয়াও বসিল। চাঁপাকেই দেখিতেছিল বোধ হয় এতক্ষণ। সকালবেলা কোথা হইতে একটা কলকে ফুল যোগাড় করিয়া খোঁপায় গোঁজায় জগতের চোখে চাঁপার রূপটা বোধ হয় আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

জগৎ বলিল, 'কালোকে কেমন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, দেখলে চাঁদের মা?'

যশোদা বলিল, 'তুমি তো দেখেছ? তাতেই হবে।'

'কালোর সঙ্গে মোটে বনিবনা নেই চাঁপার।'

'কার সঙ্গে বা আছে? যা স্বভাব মেয়ের।'

চাঁপার নিন্দায় ক্ষুণ্ণ হইয়া জগৎ মুখ ভার করিয়া থাকে আর তার মুখের দিকে চাহিয়া যশোদা মনে মনে বলে, 'ধিক্ তোমাকে। বোনটাকে অমন করে ঠেলে সরিয়ে দিলে, একটুকালের জন্যে না হয় একটু তুমি বিরাগ হতে চাঁপার ওপর?'

ফিরিয়া যাওয়ার সময় যশোদার চোখে পড়ে, তখনও কালো মুখ ভার করিয়া কলতলার একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। এরকম নীরব দুর্বল অভিমানও যশোদা দু'চোখে দেখিতে পারে না। কার উপর তুই মুখভার করিয়া আছিস ছুঁড়ি, কে তোর মুখভারের মর্যাদা রাখিবে?

নিজের বাড়িতে যশোদা ঢুকিল না, মতি আর সুধীরকে ভাত খাওয়ার জন্য আরও একটু সময় দেওয়া দরকার। গলি ধরিয়া যশোদা আগাইয়া গেল। একটু গেলেই এ পাড়ার রাজপথ, দু'টি গাড়ি পাশাপাশি চলিতে পারে এতখানি চওড়া, পিচঢালা এবং বিদ্যুৎবাহী তারের থাম বসানো। গলির ভিতর হইতে এ রাস্তায় পা দিলেই যশোদার মনে হয়, ভিজা কাপড়ের মতো সর্বাঙ্গে ল্যাপটানো একটা অশুচি আবরণ খোলা আলোবাতাসের স্পর্শে খসিয়া গেল। তবে আরাম যশোদার হয় না, খুশিও সে হইতে পারে না। এই রাস্তাটি তৈরি হইয়াছে বলিয়াই তো তার বাড়ি দু'টি এমনভাবে আড়াল পড়িয়াছে, সঙ্কীর্ণ গলির স্থানটুকু

বাদ রাখিয়া দু'পাশে এমন ঘিঞ্জিভাবে টিন আর খোলার বাড়ি উঠিয়াছে। বছর দশেক আগে এখানে পথও ছিল না, গলিও ছিল না, দূরে যে রাস্তা দিয়া আজ ট্রাম আসিয়া ঘুরিয়া যায়, সেই রাস্তা পার হইয়া আসিলেই মানুষ ছড়ানো বাড়িগুলির আনাচ-কানাচ দিয়া, কলা বাগান ভেদ করিয়া পুকুরের পাড় ঘুরিয়া যেদিকে খুশি চলিতে পারিত। দশ বছরে শহরতলির শহুরে ভাবটা কি হুহু করিয়া না বাড়িয়া গিয়াছে।

জ্যোতির্ময়কে নন্দর চাকরির কথাটা মনে করাইয়া দিয়া যশোদা বাড়ি ফিরিবে ভাবিয়াছিল। জ্যোতির্ময়ের বাড়ির পাশ দিয়া যশোদার বাড়ির ছাতে রোদ আসিয়া পড়ে বটে, যাইতে হয় একটু ঘুরিয়া। যাওয়ার সময় চোখে পড়ে সত্যপ্রিয়র বিরাট বাড়ির বিরাটতর বাগানের পিছন-দিকের খানিকটা প্রাচীর। এতবড় বাগানের ফুল-ফল আর কৃত্রিম নির্জনতার শোভা একটি পরিবারের কি কাজে লাগে কে জানে।

জ্যোতির্ময় রান্নাঘরের বারান্দায় খাইতে বসিয়াছিল। খানিক দূরে বসিয়া ভাইয়ের খাওয়া দেখিতেছে জ্যোতির্ময়ের দিদি, ঘরের মধ্যে গলা সাধিতেছে স্বর্ণ। পরিবেশন করিতেছে বামুন। বিবাহ উপলক্ষে যে সব আত্মীয়স্বজন আসিয়াছিলেন তাঁরা চলিয়া গিয়াছেন।

'এসো চাঁদের মা।'

জ্যোতির্ময়ের আহ্বানটি মিষ্টি। গোলগাল তামাটে রঙের মানুষ সে, মুখের চামড়া মসৃণ ও কোমল। দেখিলেই মনে হয় লোকটি বুঝি তাদেরই একজন, যারা শান্ত ও সহিষ্ণু, ভীরু ও সাবধানী, ভোঁতা ও হিসাবী। কিছুক্ষণ আলাপ করিলেই কিন্তু এ ধারণায় গোল বাধিয়া যায়। মনে হয়, মানুষটা সে চালাক-চতুরও বটে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তেজ, অহঙ্কার আর একগুঁয়েমি যেন আছে। মনটা কোমল কিন্তু মায়া-মমতা যেন বড় কম। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাময়িক প্রেরণার মতো জ্যোতির্ময়ের কথাবার্তা চালচলনের মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিয়া উঁকি দিয়া আবার কোথায় হারাইয়া যায়, ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, কেমন একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব জাগে।

অবিশ্বাস ও সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতেও কিন্তু ইচ্ছা হয় না। ভয় আর দুর্বলতা, সাহস আর তেজ, বিষাদ আর হাসিখুশী ভাব, ভোঁতামি আর ধারালো বুদ্ধি, এলোমেলোভাবে এ সমস্তের ভাসা ভাসা আবির্ভাব অস্থিরচিত্ততার মতোই লাগে বটে, কিন্তু এমন একটা সংযম আর আন্তরিকতার প্রচ্ছন্ন আবরণ সব সময় তাকে ঘিরিয়া থাকে যে অতিরিক্ত উদারতার সঙ্গে তাকে বিচার করিতে বড় ভাল লাগে মানুষের।

'তোমার ভায়ের চাকরি চাঁদের মা? চেষ্টা তো করছি, দেখি কি হয়।'

'নন্দকে আজ একবার পাঠিয়ে দেব আপনার আপিসে?'

'পাঠিয়ে দেবে? তা দিও।' বলিয়া জ্যোতির্ময় এক গ্রাস ভাত গেলে, গিলিয়াই চিন্তিতভাবে বলে, 'আজকেই পাঠাবে? কদিন পরে পাঠাতে পার না?'

ভাই-এর জন্য চাকরি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে যশোদা, জ্যোতির্ময় যেন একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করে যশোদার কাছে, দয়া করিয়া যশোদা কি আজ তার ভাইকে আপিসে না পাঠাইয়া পারে না?

যশোদা বলে, 'তা আপনি যদি বলেন—'

জ্যোতির্ময় সঙ্গে সঙ্গে খুশি হইয়া বলে, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। আমি এদিকে কর্তাকে বলে কয়ে রাখি একটু, তারপর একদিন তোমার ভাইকে নিয়ে যাব, কেমন?'

'বলে কয়ে রাখবেন তো ঠিক? না ভুলে যাবেন?'

'ভুলব কেন? আমি সহজে কোনো কথা ভুলি না চাঁদের মা। তুমি যে আগে একদিন বলেছিলে, আমি কি ভুলে গেছি? ভুলি নি। তোমার আসবার কোনো দরকার ছিল না, তোমার ভায়ের চাকরির জন্যে প্রাণ-পণে চেষ্টা করছি, মনে না করিয়ে দিলেও চেষ্টা করতাম।'

কথা শুনিয়া মনে হয়, নন্দর একটা চাকরি করিয়া দিবার চেষ্টায় জ্যোতির্ময়ের দিনে বিশ্রাম নাই, রাত্রে ঘুম নাই। সেই যে কবে এক-দিন যশোদা তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানাইয়াছিল, তারপর হইতে জ্যোতির্ময় বাঁচিয়াই আছে এই একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়া—নন্দর একটি চাকরি।

বিরক্তির সঙ্গে যশোদার কৌতুক বোধ হয়, কৌতুকবোধের সঙ্গে একটু দরদও জাগে। নিজের কোনো একটা সমস্যা নিয়া বেচারী হয়তো দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, এখনো হয়তো সেই কথাই ভাবিতেছে, এই সব জমা করা চিন্তা আর উদ্বেগ যশোদার মন রাখার ব্যাকুলতায় কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য নন্দর চাকরির দুর্ভাবনায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অতিমাত্রায় ভঙ্গি নিয়া মানুষ যখন মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে যায়, পথের ধারে ফেলিয়া রাখা পথ-বাঁধানোর বাড়তি পাথরটাকে ব্যাকুল আগ্রহে প্রণাম করা তার পক্ষে সম্ভব বৈ কি।

যশোদাকে পিঁড়ি পাতিয়া জাঁকিয়া বসিয়া জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে আলাপ জুড়িতে দেখিয়া তার দিদি গম্ভীরমুখে কোথায় উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে একটা কলাইকরা প্লেটে আম কাটিয়া আনিয়া সামনে রাখিল। নাম তার সুধীরা। গাম্ভীর্য ও ধীরতার তার সত্যই তুলনা নাই। যশোদাকে সে পছন্দ করে না, আমলও দেয় না—আমল পাওয়ার জন্য যশোদার কিছুমাত্র চেষ্টা না থাকায় যশোদাকে সে আরও বেশী অপছন্দ করে। এককালে একজন আধাহাকিমের গৃহিণী ছিল, এখন বিধবা হইয়াছে। বিধবাও হইয়াছে প্রায় পাঁচ-সাত বছর, কিন্তু গিন্নী গিন্নী ভাবটা এত বেশী বজায় আছে বলিবার নয়। বাড়াবাড়িটা বোধ হয় এইজন্য যে আসল যা ছিল তার ভিতরটা হইয়া গিয়াছে ফাঁপা, বজায় আছে শুধু ভাবটুকু ফাঁকি ফাঁকিতে সেটা উঠিয়াছে ফাঁপিয়া।

যশোদা বলে, 'নতুন বৌকে দেখছি না, আসে নি বৌ বাপের বাড়ি থেকে?'

পাখা নাড়িয়ে আমের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মুখ না ফিরাইয়া সুধীরা সংক্ষেপে বলে, 'এসেছে।'

'ওমা, কবে এল? জানি নি তো!'

'পরশু এসেছে।'

যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, 'ও ঘরে আছে বুঝি? যাই, চেনা করে আসি।'

সুধীরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, 'নতুন বৌ-এর সঙ্গে আবার চেনা করবে

কি বাছা ?'

এসব বিকারগ্রস্ত মানুষের অপমান যশোদা সহজে গায়ে মাখে না, সে হাসিয়া বলে, 'নতুন বৌ বলেই তো চেনা করা। ভয় নেই গো দিদি, বৌকে তোমাদের চুরি করে নিয়ে পালাব না।'

যশোদা উপরে উঠিতে থাকে, সুধীরা বোনকে ডাক দিয়া বলে, 'সুবর্ণ, ও সুবর্ণ ?—ও বাড়ির যশোদা বৌ দেখবে, নিয়ে যা তো সঙ্গে করে বৌ-এর কাছে।'

যশোদা কতবার এ বাড়িতে আসিয়াছে, পথ চিনিয়া সে কি যাইতে পারিবে না উপরে, দোতলার দু'খানা ঘরে খুঁজিয়া পাইবে না নতুন বৌ অপরাজিতাকে ? সাজা-গৃহিণীদের গিন্নীপনার মানে বোঝা সত্যই কঠিন।

বাড়ি ফিরিয়া যশোদা দেখিল, মোটে তিনটি এঁটো থালা পড়িয়া আছে, আরও দু'জন খাইতে বসিয়াছে এবং তাদের জন্য নতুন করিয়া ভাত বাড়িতে নন্দ একেবারে গলদ্ঘর্ম।

'আরে নিষ্কর্মার ঢেঁকি, হাতায় ক'রে হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে থালায় দেবে, তাও পারে না ? পালা তুই, ভাগ্।'

নন্দকে রেহাই দিয়া যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, 'কে কে খেয়েছে রে নন্দ ?'

নন্দ গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল, 'কেষ্ট, বলাই আর যতীন।'

যশোদা একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'মতি আর সুধীর খায় নি ? কি হ'ল তবে আর দু'থালা ভাত, বেড়ে যে রেখে গেলাম পাঁচ থালা ?'

নন্দ বিব্রত হইয়া এদিক ওদিক তাকায়, 'ওই তো খেয়ে গেল ওরা।'

'কারা ? মতি আর সুধীর ?'

'হুঁ।'

'এঁটো থালা গেল কই ?'

যশোদার জেরায় কাবু হইয়া এবার নন্দ সব বলিয়া ফেলে। মতি আর সুধীরের ভাত খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র সুধীর তাড়াতাড়ি এঁটো-কাঠা সাফ করিয়া থালা দু'টি মাজিয়া ধুইয়া রাখিয়া গিয়াছে আর নন্দকে

বলিয়া গিয়াছে অনেক করিয়া, সে যেন যশোদাকে না বলে।

'খুব বুদ্ধিমান তো সুধীর!—তুই না বললেও টের পেতে যেন আমার বাকী থাকত।' বলিয়া যশোদা হাসিল।

তারপর গম্ভীর হইয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, 'পেটের জ্বালায় ওরা না হয় বারণ না মেনে খেয়ে গেল, বলবি না বলে তুই যে আমায় বলে দিলি বড়? ধিক্ তোকে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসের মান যে রাখে না মানুষের মধ্যে তাকেই বলি সবচেয়ে হীন, চোর-জোচ্চোর ভাল তার চেয়ে।'

এরকম সময়ে যশোদাকে বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়। কি যে তার মনের ভাব, রাগ সে সত্যই করিয়াছে না সবটাই তার ভান, কিছুই বোঝা যায় না। হাসি-তামাশা করা চলে এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারে কথা দিয়া কথা রাখে নাই, তাও যশোদারই জোরালো জেরার ফাঁদে পড়িয়া, এটা কখনও নন্দর এতবড় অপরাধ বলিয়া যশোদা ভাবিতে পারে? মুখ দেখিয়া কথা শুনিয়া মনে হয় কিন্তু তাই সে ভাবিতেছে!

নন্দ ভয়ে ভয়ে বলে, 'তুমি যে জিজ্ঞেস করলে?'

'জিজ্ঞেস করব না? জিজ্ঞেস তো আমি করবই—আমি কি গুণে জানি একজনের কাছে তুমি পিতিজ্ঞে করেছ আমায় কিছু বলবে না? চুপ করে থাকতে পারতে না তুমি?'

'চুপ করে থাকলেও তো তুমি বকতে।'

'বকতাম তো কি হয়েছে? পিতিজ্ঞে রক্ষার জন্যে মুখ বুজে একটু বকুনি যদি না সইতে পার, তুমি মানুষ কিসের শুনি?'

এক জায়গায় কাজ করে বটে, তবু মতির সঙ্গে সুধীরের বন্ধুত্ব হওয়াটা সত্যই বড় খাপছাড়া ব্যাপার। মতির চুলে পাক ধরিয়াছে, মানুষটা সে শান্ত, ভীরু এবং একটু মতলববাজ। সুধীরের বয়স ত্রিশেরও কম, বেঁটে আর চওড়া শরীরটা তার লোহার মতো শক্ত, যেমন অশান্ত তেমনি নিষ্ঠুর তার প্রকৃতি এবং পৃথিবীর সকল গোঁয়ারের মতো সে বোকা। তবু মতির সঙ্গে সুধীর ভিড়িয়া গিয়াছে, দু'জনে একসঙ্গে হাসি-তামাশা গল্প-গুজব করে, নেশা আর আমোদ করিতে যায়—দু'টিতে

যেন সমবয়সী ইয়ার।

রাস্তায় পা দিয়াই সুধীর এক গাল হাসিয়া বলিল, 'চাঁদের মাকে ফাঁকি দিয়ে কেমন দু'জনে পেট পূজাটি সেরে এলাম মতিদা!'

'ফাঁকি না তোর মাথা। আমরা যাতে খাই তাই জন্যে তো ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তাও বুঝিস না পাঁঠা?'

'বটে নাকি, হ্যাঁ?'

সুধীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। এমন খাপছাড়া প্যাঁচালো দরদের ব্যাপারগুলি সে ভাল বুঝিতে পারে না। পরের সুখ-দুঃখের কথা যে সংসারে কেউ ভাবে এ ধারণাটাই তার কেমন অদ্ভুত ও অসম্ভব মনে হয়, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইতে চায় না। তার সমস্ত জীবনটাই একটা একটানা পেষণের ইতিহাস, পরের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছে, পরের অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অন্ধ স্বার্থপরতা ও ক্ষমাহীন নির্মমতাকে জানিয়াছে সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম, সুস্থ শরীরে খাটিতে পারিলে খাইয়াছে, অসুস্থ শরীরে খাটিতে না পারিলে উপবাস করিয়াছে, ভিক্ষা করিয়াছে, চুরি করিয়াছে, জেলেও গিয়াছে। একবার অনেক কষ্টে কিছু টাকা জমাইয়া বিবাহ করিয়াছিল, দু'মাসের মধ্যে বৌটা একজনের সঙ্গে উধাও হইয়া গিয়াছে। তার আগে এবং পরে যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে বাস করিয়াছে, তারা যেমন তার কাছে প্রাণপণে আদায় করিয়াছে সেও তেমনি তাদের কাছে প্রাণপণে আদায় করিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেভাবে হোক নিজের প্রাপ্য আদায় করার সহজ সরল সম্পর্কটা সুধীর বুঝিতে পারে, আর কিছু তার মাথায় ঢোকে না। নিজেও সে চিরদিন নিজের সুখদুঃখ ভালমন্দের হিসাব ছাড়া আর কোনো হিসাব করে নাই, অন্য কেউ এই হিসাব লইয়া মাথা ঘামাইবে এ আশাও করে নাই। জীবনে যে কারও অকারণ দরদ পায় নাই এজন্য তার তাই কোনো আপসোসও নাই। হয়তো কখনও পাইয়াছিল দরদ, হয়তো মানুষকে দরদী করিবার সুযোগ আসিয়াছিল, কিন্তু সে বুঝিতেও পারে নাই কি পাইতেছে, কিসের সুযোগ আসিয়াছে।

কেহ তাহাকে কোনোদিন বুঝাইয়াও দেয় নাই, বুঝিতেও দেয় নাই।

চলিতে চলিতে নানা কথা মনে হয় সুধীরের। একটি দু'টি করিয়া যশোদার কতকগুলি কাজের কথা মনে পড়ে, আজকের আশ্চর্য ব্যবহারের সঙ্গে যার কেমন যেন একটা মিল আছে। কিছুদিন আগে তার জ্বর হওয়ায় যশোদা তার সেবা করিয়াছিল, খুবই সাধারণ সেবা, মাথাটা ধোয়াইয়া মুছিয়া দেওয়া, জোর করিয়া বার্লি আর ওষুধ খাওয়ানো, আর কিছু নয়,—তবু ওরকম সেবাও কি সুধীরকে কোনোদিন কেউ করিয়াছে? মারামারি করায় একবার পঁচিশ টাকা জরিমানা হইয়াছিল সুধীরের, যশোদা জরিমানাটা না দিলে জেলে যাইতে হইত। তারপর দু-এক টাকা করিয়া মাস তিনেকের মধ্যে যশোদা প্রায় দশ বারো টাকা আদায় করিয়া নিয়াছে বটে, কিন্তু যাচিয়া জরিমানার টাকা দিয়া কেউ কি সুধীরকে কোনোদিন জেল হইতে বাঁচাইয়াছে?

'সত্যি বলছ মতিদা?'

কি সত্যি বলিয়াছে মতি? অ, যশোদার কথা! সত্য বৈকি, যশোদাকে চেনে না সুধীর, ওসব সে বুঝিবে না। মেজাজটা একটু যা খারাপ যশোদার, চেহারাটাও হাতির মতো, কিন্তু সকলের জন্য বড় মায়া যশোদার, অমন মেয়েমানুষ হয়?—'একটা বিড়ি দে তো। গা'টা কেমন করছে সুধীর, কালকের নেশাটা এখনো কাটে নি।'

'বিড়ি নেই।'

'দে-না একটা? কেমনধারা মানুষ যেন তুই সুধীর।'

সুধীর বিরক্ত হইয়া বলিল, 'নেই তো দেব কোথা থেকে? গড়াব?'

একটা বিড়ির জন্যেই দু'জনের মধ্যে যেন মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হয়। মতি খানিক আগে আর সুধীর খানিক পিছনে চলিতে থাকে।

এত সকালেই বড় রাস্তায় গাড়ি আর মানুষের ভিড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দশটা এগারটার সময় এ রাস্তায় চলাই দুষ্কর হইয়া পড়ে। ঠেলাগাড়ি, মহিষের গাড়ি, লরী আর বাসের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে থাকিয়া থাকিয়া মোটর গাড়িকেও গরুর গাড়ির সঙ্গে সমান তালে শামুকের গতিতে চলিতে হয়, মাঝে মাঝে জমাট

বাঁধিয়া সমস্ত গাড়ির গতিই কিছুক্ষণের জন্য একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। তখন পথের দিকে চাহিলে মনে সংশয়ই জাগে, একি শহরতলির পথ না শহরের কেন্দ্র? সংশয় দূর হয় যখন মনে পড়ে শহরের কেন্দ্র এ রকম অপরিচ্ছন্ন নোংরা নয়, সেখানে পথের ধারে বুদবুদ তোলা পচা পাঁকে-ভরা ছোটখাট খালের মতো এ রকম নর্দামা নাই, গেঁয়ো ধরনের দোকানপাট আর সেকালের ধরনের আড়ত নাই, এত বড় বড় মিল নাই, এ ধরনের মালবাহী গাড়ি সেখানে এভাবে জড়াজড়ি করে না, সেখানে দামী সুদৃশ্য প্রাইভেট কারের স্রোত কেবল রঙীন বৈদ্যুতিক আলোর ইঙ্গিতে কিংবা ট্রাম-বাস প্রভৃতি মানবজাতীয় মালবাহী গাড়ি আর মানুষের ভিড়ে গতিহীন হয়, সেখানে পথের ধারে প্রত্যেকটি বাড়ি রাজপুরী, প্রত্যেকটি দোকান শুধু এই বাণীর রূপক যে ধনী ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ নাই, থাকা উচিত নয়।

কারখানায় গিয়া মতি সবে খাকি শার্টটা খুলিয়া রাখিয়া আলকাতরার বালতি আর বুরুশটি তুলিয়া লইয়াছে, মাল চালানের কুলিদের সর্দার ভরদ্বাজ আসিয়া বলিল, 'ওই বিশঠো গাঁটমে কাল লিখা নাই কাহে?' ভরদ্বাজ চমৎকার বাঙলা বলিতে পারে, কিন্তু রাগের সময় বলে না।

'সব গাঁটমে তো কালকে আমি লিখেছি?'

'লিখেছো? তোমার মুণ্ডু করিয়েছো। কাল চালান বরবাদ গেলো, কাশীবাবু হামাকে ছুষছে। কাম যদি না করবে শালা, চলা যাও না কাম ছোড়কে?'

বুরুশটা ছিনাইয়া লইয়া মতির গালে আঘাত করিয়া ভরদ্বাজ গজরাইতে গজরাইতে চলিয়া গেল। আঘাত যত না লাগিল মতির, আলকাতরা লাগিল তার চেয়ে অনেক বেশী। সাদা চুল আর কালো গালের রং দেখিয়া আশে পাশে যারা কাজ করিতেছিল তারা হাসিয়া বাঁচে না। গালের আলকাতারা মুছিতে মুছিতে মতি ভাবিতে থাকে কাশীবাবুর কাছে গিয়া নালিশ জানাইবে কি না। কিন্তু গাঁটে লিখা হয় নাই বলিয়া কাশীবাবু নিজেই যদি চটিয়া থাকেন, নালিশ জানাইয়া লাভ কি হইবে? কাশীবাবু হয়তো অন্য গালে আলকাতরা মাখাইয়া দিবেন।

কিন্তু এই গাঁটগুলি কোথায় ছিল কাল ? এখানে যে ছিল না মতির তাতে সন্দেহ নাই, এতকাল সে এ কাজ করিতেছে একেবারে কুড়িটা গাঁট বাদ পড়িবার মতো ভুল কি তার হইতে পারে ? তাছাড়া, কালই যদি গাঁটগুলি চালান দিবার এত বেশী দরকার ছিল, আগে এইগুলিতে লিখিবার জন্য তাকে নিশ্চয় বলিয়া দেওয়া হইত—চিরকাল যেমন বলা হইয়াছে। একটু ধাঁধায় পড়িয়া যায় মতি, ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে কয়েকটা আলকাতরার দাগ আঁকিয়া দেয় নাই বলিয়া একেবারে চালান বরবাদ হইয়া গেল!

ভাবিতে ভাবিতে সমস্যাটি মতির কাছে জল হইয়া যায়। দোষ তার নয়। হয় কাশীবাবু নয় ভরদ্বাজের গাফিলতিতে কাল গাঁটগুলি চালান দেওয়া হয় নাই এবং চিরদিনের রীতি অনুসারে যারা উপরে থাকে তাদের ঘাড় হইতে পিছলাইয়া দোষটা আসিয়া চাপিয়াছে তার ঘাড়ে। দোষ দিতে ছুতাও তো চাই একটা ? কি চালাক কাশীবাবু আর কি শয়তান ভরদ্বাজ ব্যাটা!

গালে আলকাতরা দেওয়ার জন্য একটু রাগ আর একটু দুঃখ মতির হইয়াছিল বৈ কি, তবে আঘাত আর অপমান সম্বন্ধে অনুভূতিগুলি তার অনেকটা ভোঁতা হইয়া আসিয়াছে কিনা, রাগ দুঃখ অপমান অভিমান খুব সহজেই সে ভুলিয়া যাইতে পারে। এমন কি, আসল ব্যাপারটা বুঝিয়া এবার একটু কৌতুকও মতির বোধ হয়। দোষ ঘাড়ে চাপানোর জন্য এতগুলি লোকের ভিতর হইতে তাকেই বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে, এজন্য একটু গর্বও কি মতি বোধ করিতে আরম্ভ করে ?

মেঝে হইতে বুরুশটি তুলিয়া বালতির উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া গাঁটগুলিতে কি অক্ষর কি নম্বর লেখা হইবে তার নমুনা আনিতে ভরদ্বাজের কাছেই মতি যাইবে ভাবিতেছে, সুধীর আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল।

প্রথমটা খুব এক চোট হাসিল সুধীর, তারপর ব্যাপারটা শুনিয়া রাগিয়া হইয়া গেল আগুন। খানিক তফাতে কোথা হইতে কি কাজে ভরদ্বাজ কোথায় যাইতেছিল, সুধীর গিয়া তাকে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া এদিকে

নিয়া আসিল, গালাগালি চোটপাট চলিল মিনিটখানেক, তারপর আলকাতরার বালতিটা সুধীর কাত করিয়া দিল ভরদ্বাজের মাথার উপর। একটা হৈচৈ বাধিয়া গেল। কাশীবাবু ছুটিয়া আসিল এবং গোলমালের মধ্যে কাশীবাবুর গায়েও কি করিয়া আলকাতরা লাগিয়া গেল খানিকটা! ভরদ্বাজের একজন পার্শ্বচরের সঙ্গে তখন সুধীরের মারামারি চলিতেছে এবং আট দশজন তাদের ছাড়াইবার চেষ্টা করায় মনে হইতেছে মারামারি বুঝি বাধিয়াছে দশ বারজনের মধ্যে। কাশীবাবু কার গালে যেন একটা চড় বসাইয়া দিল। বোধ হয় যাকে সামনে পাইল তারই গালে। ঠিক তার পরেই পিছন দিকে না চাহিয়া একজন দু'পা পিছু হটায় আসিয়া পড়িল একেবারে কাশীবাবুর ঘাড়ে। মনে হইল, একজনের গালে চড় মারার শোধটাই বুঝি আরেকজন নিয়াছে।

গোলমাল থামিবার এক ঘণ্টার মধ্যে মতি, সুধীর এবং আরও আটজন শ্রমিক বরখাস্ত হইয়া গেল। অন্য আটজনের অপরাধ? প্রকাশ্য অপরাধ কারখানার মধ্যে মারামারি করা, যা তারা কেউ করে নাই। ওদের মধ্যে পাঁচজন তো যেখানে গোলমাল চলিতেছিল তার ধারে কাছেও ছিল না। গোলমাল থামিবার পর তারা আসিয়াছিল, যোগ দিয়াছিল শুধু জটলায়। কিন্তু কিছুদিন আগে সত্যপ্রিয় মিলে যে ধর্মঘট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় এই আট জনের নাম উঠিয়াছিল মিলের পক্ষে অবাঞ্ছিতদের লিস্টে। আজকের গণ্ডগোলের সুযোগে মতি আর সুধীরের সঙ্গে এদেরও কাশীবাবু তাড়াইয়া দিল। ওরা মারামারি করে নাই? কাশীবাবু নিজের চোখে ওদের মারামারি করিতে দেখিয়াছে, আলকাতরার জন্য ভরদ্বাজ চোখের পাতা ভাল করিয়া খুলিতে পারিতেছিল না, তবু সেও দেখিয়াছে, কাশীবাবুর আরও কত পার্শ্বচরও যে দেখিয়াছে তার হিসাব হয় না।

দশজনের কাজ গেল। কাশীবাবুর কড়া হুকুমে মিলের মধ্যে কর্মব্যস্ততা আবার চরমে উঠিয়া গেল, মানুষ আর যন্ত্র সমানে কাজ করিতে লাগিল। কি যেন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে কিন্তু হাতে যথেষ্ট সময় নাই, তাই ঊর্ধ্বশ্বাসে কাজ করা। এত ব্যস্ততার মধ্যে একটুও আবেগ

নাই, ব্যাকুলতা নাই, নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া কারখানার দিকে ছুটিবার সময় একজন মাত্র মানুষের মধ্যে যতখানি আবেগ আর ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, এখানে এতগুলি মানুষের সমবেত ব্যস্ততার মধ্যে সেটুকু ভাবোচ্ছ্বাসের ছন্দও নাই।

তবু মানুষ তো যন্ত্রের অধীন নয়, যন্ত্রই মানুষের অধীন, প্রভুত্বটা এখনও ঠিক মতো আয়ত্ত হয় নাই মানুষের, এই যা আপসোস। তাই টিফিনের সময় কারখানার প্রাঙ্গণে দশজন বরখাস্ত শ্রমিককে ঘিরিয়া সকলে জটলা করিতে লাগিল, একটু বক্তৃতাও বুঝি করিল দু-একজন। টিফিনের সময় শেষ হওয়ার পরেও থামিল না। মিলের কাজ বন্ধ হইয়া রহিল। কাশীবাবু ভড়কাইয়া গিয়া ক্রমাগত ফোন করিতে লাগিল হেড অফিসে আর সত্যপ্রিয়র কাছে।

কিন্তু কিছুতেই এবার ধর্মঘট ঠেকানো গেল না। যে দশজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের আবার কাজে না নিলে কেহ কাজ করিবে না। হেড অফিসে ফোনটা সত্যপ্রিয়ের কানেই প্রায় লাগানো ছিল, সমস্তক্ষণ, মিনিটে মিনিটে খবর যাইতেছিল। মন্তব্য প্রায় কিছু করিতেছিল না, কেবল শুনিতেছিল। একবার শুধু বলিয়াছিল—'ব্যাখ্যা আপনাকে করতে হবে না কাশীবাবু, যা ঘটেছে তাই শুধু বলে যান। না, এখনও পুলিস ডাকবেন না, আর একটু দেখা যাক। ভয় পাবেন না মশাই, পুলিস রেডি হয়েই আছে, ডাকামাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাজির হবে। অনাথ পৌঁছয় নি ? দেখুন তো।'

অনাথ সত্যপ্রিয়র সেক্রেটারী। কাশীবাবু দেখিয়া আসিয়া জানাইল, অনাথবাবু ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ওরা তাকে কথাই বলতে দিচ্ছে না, হৈচৈ করছে। একজন একটা ঢিল ছুঁড়েছে অনাথবাবুর দিকে, গায়ে লাগে নি।'

জবাবে সত্যপ্রিয় বলিল, 'আপনি একটি আস্ত গর্দভ কাশীবাবু! ওই দশজনকে দাঙ্গা করার জন্য পুলিসে দিলেই চুকে যেত—বরখাস্ত করে ছেড়ে দিলে ওরা মিলের মধ্যে এসে গোল বাধাবে এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধিও আপনার ঘটে নাই ? শুধু বরখাস্তই যদি করবেন, এতকাল

করতে পারতেন না, সুযোগের জন্য অপেক্ষা করার কি দরকার ছিল ?'

'আজ্ঞে অনাথবাবুকে ফোন করলাম, অনাথবাবু বললেন—'

'অনাথ আপনার মতোই গাধা। ডেকে আনুন অনাথকে, বুঝিয়ে আর কিছু হবে না। পুলিসকে খবর দিচ্ছি, পুলিস এলেই মিল খালি করে গেট বন্ধ করে দেবেন।'

সন্ধ্যার পর মতি, সুধীর আর ওই দশজন বরখাস্ত শ্রমিকের সঙ্গে প্রায় শ'দুই শ্রমিক যশোদার বাড়িতে আসিয়া হাজির। উঠানে স্থান হইল ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনের, বাকী সকলে সরু গলিটুকুর মধ্যে গাদাগাদি করিয়া আর গলির মোড়ে রাস্তায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুধীর খুব লাফালাফি করিতেছিল, যশোদার ধমকে থামিয়া গেল। খন্তি হাতে রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া প্রথমে যশোদা এরকম হুড়মুড় করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার জন্য একচোট গালাগালি দিল সকলকে, তারপর মন দিয়া ব্যাপারটা সব শুনিল, তারপর আবার গালাগালি দিয়া বলিল, 'তোমরা সবাই পাঁঠা, এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই তোমাদের কারু ঘটে। দল বেঁধে হল্লা করলেই হবে? দু'নম্বর মিলে ছুটে যেতে পারলে না সবাই মিলে, সেখানেও ধর্মঘট করতে পারলে না?'

'তাই তো বটে,—এটা তো খেয়াল হয় নাই কারো। কি করা যায় এখন?'

'কি আবার করবে? পাঁচ দশজন মিলে খুঁজে খুঁজে বার করগে দু'-নম্বরের যতজনকে পার। কাল ভোর না হতে তোমরা সবাই গিয়ে দু'-নম্বরে ধর্না দেবে। এবার ভাগো সবাই আমার বাড়ি থেকে, দম আটকে মারবে নাকি?'

বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে একটু বসিয়া যাইতে বলিয়া বাকী সকলকে যশোদা বাড়ির বাহির করিয়া দিল। তারপর ওই বাছা বাছা কয়েক-জনের সঙ্গে পরামর্শ করিল দু'ঘণ্টা ধরিয়া।

পরদিন দুপুরবেলা ডাক আসিল যশোদার, মিলে মজলিস বসিয়াছে, একবার যাইতে হইবে যশোদাকে। কাশীবাবু নিজে গাড়ি নিয়া আসিয়াছে।

'আমি গিয়ে কি করব ?'

'আপনি মাতিয়ে দিয়েছেন ওদের, আপনি না গেলে ওরা কারও কথা শুনবে না।'

যশোদা উদাসভাবে বলিল, 'ওদের দাবি মিটিয়ে দিলেই কথা শুনবে।'

সেই তো সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এখন। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের দাবি বাড়িয়া গিয়াছে, দশজন বরখাস্ত শ্রমিককে ফিরাইয়া নিলেই আর চলিবে না, আগের বার যে সব দাবি উপলক্ষে ধর্মঘট বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল সেইগুলিও মিটাইয়া দেওয়া চাই।

'আপনার পরামর্শে এটা হয়েছে।'

'আমার পরামর্শ কি ওরা শোনে? শুনলে কি আর এ দুর্দশা হয় ওদের? কত বলি যে কাজকর্ম যখন থাকে, পয়সা জমা দুটো, অসময়ে কাজে লাগবে। কানেও তোলে না কেউ আমার কথা।'

গাড়িতে উঠিয়া গম্ভীরভাবে যশোদা মাথা নাড়ে, 'কথায় বলে না অভাবে স্বভাব নষ্ট, তাই হয়েছে ওদের। মজুরি হাতে পেলেই আর ছেঁড়া ন্যাকড়াটি পরা চলবে না, নতুন একটি কাপড় কেনা চাই। একটি গামছা কেনা চাই, জলপানি খাওয়া চাই, গায়ে তেল মাখা চাই—'

যশোদা তামাশা করিতেছে কিনা কাশীবাবু ঠিক বুঝিতে পারে না, দ্বিধা-ভরে বলে, 'তাড়ি খেয়ে খেয়েই ওদের যত দুর্দশা।'

'তাড়ি খেয়ে? তাড়ি না খেলে ওরা বাঁচত? খাওয়ার মধ্যে খায় তো শুধু একটু তাড়ি, নয়তো একটু দিশী, তাও যদি না খাবে, খিদে-তেষ্টা মিটবে কিসে?' শুনিয়া সেই যে কাশীবাবু চুপ করিয়া গেল, আর কথাটি বলিল না। মিলের সামনে পাঁচ ছ'শ শ্রমিক এলোমেলোভাবে ভিড় করিয়া আছে, যশোদাকে দেখিয়া তাদের কি উৎসাহ। ধর্মঘটের চেয়ে আজ সারাদিন যশোদার কথাই তারা বেশী আলোচনা করিয়াছে। মুখে মুখে কত কথাই যে রটিয়াছে যশোদার সম্বন্ধে!

মিলের ভিতরে আপিসঘরে বৈঠক বসিয়াছে। বৈঠকে অনাথ, হেড অফিসের আরও দু'জন বড় কর্মচারী এবং শ্রমিক সমিতির দু'জন প্রতিনিধি আছে। একটি চেয়ারে যশোদাকে বসিতে দেওয়া হইল। এমন

অস্বস্তি যশোদা জীবনে কখনও ভোগ করে নাই। তারপর কত কথা আর কত আলোচনাই যে আরম্ভ হইল, যশোদা কিন্তু শুনিল বেশী, কথা বলিল কম।

শ্রমিক সমিতির একজন প্রতিনিধি অনুযোগ দিয়া বলিল, 'আমাদের না জানিয়ে ধর্মঘট আরম্ভ করা কি আপনার উচিত হয়েছে?'

যশোদা বলিল, 'ধর্মঘট আরম্ভ করার ধ-ও জানি না আমি। সে হোক্, শেষ পর্যন্ত আপনারা তো জেনেছেন?'

কিন্তু এরকম জানায় তারা খুশি নয়, শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিয়াছে বটে, ধর্মঘটটা আসলে যেন যশোদার। এতক্ষণ আলোচনা করিয়া একটা মিটমাট হইয়াছিল, শ্রমিক সমিতি মীমাংসাটা মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু শ্রমিকরা মানিতে চাহিতেছে না। এভাবে ডিসিপ্লিন নষ্ট হইলে—

মীমাংসাটা কি হইয়াছে? দশজনের মধ্যে ন'জন বরখাস্ত শ্রমিককে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, আরও পঁচিশজন নূতন শ্রমিক নিয়া কাজের চাপ কমানো হইবে, কিন্তু কাজের সময় আর মজুরি সম্বন্ধে অন্য যে দাবি করা হইয়াছে, সেগুলি মেটানো হইবে না।

শুনিয়া যশোদা বলিল, 'তবে তো খুব হ'ল!'

তবু এই মীমাংসাই যশোদা মানিয়া নিল, নতুন লোকের সংখ্যাটা কেবল পঁচিশ হইতে চল্লিশে উঠিল এবং ঠিক হইল এর মধ্যে ত্রিশজনকে যশোদা ঠিক করিয়া দিবে। মানিয়া নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যশোদা জানিত এ ধর্মঘট টিকিবে না, বড় অসময়ে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, ঝোঁকটা কাটিয়া গেলেই অনেকে কাজে যোগ দিতে চাহিবে, অনেকে নিরুপায় হইয়া কাজে যোগ দিবে। যশোদা তো জানে ওদের অবস্থা।

'দশজনের মধ্যে বাদ যাবে কে?'

অনাথ বলিল, 'সুধীর। ওকে নেওয়া চলে না। আমাদেরও তো প্রেস্টিজ আছে একটা। প্রেস্টিজ মানে—'

যশোদা একটু হাসিল। প্রেস্টিজ শব্দটা এত বেশী কানে আসে!

যশোদা শর্ত মানিয়া নেওয়ামাত্র অনাথ ফোনটা তুলিয়া নিল। সত্যপ্রিয়

সংবাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। সত্যপ্রিয় মিলে আসে নাই, কোনো-দিন এসব ব্যাপারের ধারে কাছেও সে আসে না, শ্রমিকদের সে বড় ভয় করে। সেই তো মালিক মিলের, উত্তেজিত অবস্থায় সকলে মিলিয়া তাকে যদি আক্রমণ করে, যদি প্রথমে গায়ের জামা-কাপড় টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া তারপর তার দেহটাকে ছিঁড়িতে আরম্ভ করে ঠিক ওইভাবে ? এই কল্পনা আর সেই সঙ্গে গভীর একটা আতঙ্ক সত্যপ্রিয়র মনে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়া আছে।

রাত্রে সকলে খাইয়া গেল, সুধীর আসে না। নন্দকে ডাকিয়া পাঠানো হইল তবু আসে না। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া সে ছাতে গিয়া গুম খাইয়া বসিয়া আছে। শেষে যশোদা নিজেই গেল।

যশোদা কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র, সুধীর গট্‌গট্ করিয়া নামিয়া গেল নিচে। কিন্তু যশোদাও ছাড়িবার পাত্র নয়, সেও পিছু পিছু ধাওয়া করিয়া সুধীরকে পাকড়াও করিল তার ঘরে।

'ভাত খাবে না ?'

সুধীর কথা বলে না, চৌকিতে বসিয়া চুপচাপ দেয়ালের দিকে চাহিয়া থাকে, যেখানে একটা টিকটিকির লেজ শিকার করিবার উত্তেজনায় এ-পাশ ও-পাশ নড়িতেছিল। সহজ রাগটা সুধীরের হইয়াছে যশোদার উপর। আজ সকালে যে যশোদার দরদের পরিচয়ে তার মাথা প্রায় ঘুরিয়া গিয়াছিল, সেই যশোদাই শেষ পর্যন্ত তার এমন সর্বনাশ করিল !

দশজনের মধ্যে আর সকলকে ফিরাইয়া নেওয়া হইল, বাদ পড়ল শুধু সে। মতির হইয়া সে লড়াই করিয়াছে, মতির কাজটা পর্যন্ত বজায় রহিল, বরখাস্ত করা হইল একা তাকে !

'মাথা গরম ক'রো না বাবু ছেলেমানুষের মতো। মাথা গরম করে কাজটির মাথা তো খেলে নিজের।' খোঁচা না দিলে সুধীরের মুখ খুলিবে না জানিয়াই যশোদা খোঁচা দিয়া কথা বলে। সুধীর মুখ ফিরাইয়া বলে, 'আমি খেলাম না তুমি খেলে ?'

'মারামারি করলে তুমি, চাকরি খেলাম আমি ? বেশ তো বিচার তোমার

বাবু?'

যশোদা হাসে, গলা নামাইয়া গোপন কথা বলার সুরে বলে, 'তবে কি জান, শুনে আমি বড় খুশি হয়েছি—সত্যি বলছি তোমায়। মতি চুপচাপ সয়ে গেল, কথাটি কইল না, ছিছি, ওটা কি মানুষ? ভীরু অপদার্থ ওটা। তোমার সাহস আছে, তুমি তাই রুখে দাঁড়ালে—আর কেউ পরের অপমান গায়ে মেখে নিত অমনি করে?'

শুনিতে শুনিতে বাতাসে মেঘ উড়িয়া যাওয়ার মতো সুধীরের মুখের উপর হইতে রাগ দুঃখ অভিমানের ছায়া মিলাইয়া যাইতে থাকে। একটু নরম গলায় সে বলে, 'তুমি বললেই ওরা আমায় রাখত।'

'তাতে লাভটা কি হ'ত বল? এরপর ওখানে আর কাজ করতে পারতে তুমি? ও কাজ গেছে যাক—আমি তোমায় ভাল কাজ জুটিয়ে দেব। বেশী মাইনে, কম খাটুনি। মানুষের মতো তেজ আর বুকের পাটা কটা লোকের থাকে? তোমার তা আছে জেনে ভাবলাম তুমি আরও ভাল কাজের যুগ্যি—এইসব ভেবে আর বললাম না তোমায় ফিরিয়ে নিতে।'

বড় শ্রান্তি বোধ হইতেছিল যশোদার। যতবড় শরীর হোক, সহ্যের তো একটা সীমা আছে? ঘরের কাজে যশোদাকে যে সাহায্য করিতে আসে, অসুখ হইয়া তিনদিন সে আসে নাই। ঘরে বাহিরে কি খাটুনি আর হাঙ্গামাই তাকে পোয়াইতে হইতেছে। তার উপর আবার এই বোকা হাবা ধাড়ী শিশুকে বুঝাইয়া শান্ত করিবার দায়িত্বটা পর্যন্ত তার। চৌকির একপাশে বসিয়া হাই তুলিয়া যশোদা আবার বলে, 'কাজ গিয়ে শাপে বর হ'ল তোমার।'

সুধীর অভিভূত হইয়া যশোদাকে দেখিতে থাকে, সে দৃষ্টিতে অন্য কারও হয়তো রোমাঞ্চ হইত, যশোদা দেখিয়াও দেখে না। আবার হাই তুলিয়া বলে, 'এবার ভাত খাবে চল—দু'টি খেয়ে নিয়ে রেহাই দাও আমায়।'

সুধীর মিনতি করিয়া বলে, 'একটু বোসো চাঁদের মা, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে।'

'কি বললে? গল্প? বসে বসে গল্প করবো তোমার সঙ্গে? খাবে তো খেয়ে যাও সুধীর, নয় তো উপোসে রাত কাটবে বলে রাখলাম।'

৩

প্রচার বিভাগটা সত্যপ্রিয়র ব্যবসার উন্নতির নাম করিয়াই খোলা হইয়াছে বটে, বড় বড় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইতেছে সত্য, কিন্তু জ্যোতির্ময়ের আসল কাজ সত্যপ্রিয়র নামও প্রচার করা। সত্যপ্রিয়র এমন ব্যবসা নয় যে পেটেন্ট ওষুধের মতো তার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়া দেশ ছাইয়া ফেলা প্রয়োজন, সাময়িকপত্রে সত্যপ্রিয়র প্রবন্ধ আর বক্তৃতাররিপোর্ট প্রকাশ করিবার মূল্যস্বরূপ বিজ্ঞাপনগুলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সত্যপ্রিয়র প্রত্যেক প্রবন্ধ আর বক্তৃতায় ভারতবর্ষের শোচনীয় অধঃপতনের জন্য কি হা-হুতাশটাই থাকে আর সমাজ, ধর্ম ও দেশকে সুনিশ্চিত সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যাকুলতাটাই প্রকাশ পায়—তবু যে প্রবন্ধ আর বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশ করিবার জন্য প্রকারান্তরে মূল্যের বাবস্থা করিতে হইয়াছে, এও কি দেশের অধঃপতনের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নয়! কেবল কি তাই? কতকগুলি কাগজ আছে মূল্য দিয়াও তাদের বাগানো যায় না।

'এসব পাগলামি আমাদের কাগজে চলবে না মশায়।'

'ঠিক পাগলামি নয়, একটু খাপছাড়া মতামত আছে মাঝে মাঝে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানেন, লেখাটা না ছাপলে উনি হয়তো চটে যাবেন, বিজ্ঞাপনের কন্ট্রাক্টটা—' একটু হাসে জ্যোতির্ময় —'বোঝেন তো সব? যার যেদিকে খেয়াল চাপে। তা ছাড়া, ওঁর নাম দিয়ে ছাপা হবে, মতামতের দায়িত্ব তো আপনাদের নয়।'

'মতামতের দায়িত্ব না থাক, মতটা প্রচারের দায়িত্ব তো আছে? দেশের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, অর্ধেক জীবন জেলে কাটিয়েছেন, তাঁরা সবাই ভুল করে দেশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সর্বনাশের দিকে, আর টাকার গদীতে শুয়ে আপনারা পাগল জগাই আবিষ্কার করছেন দেশোদ্ধারের একমাত্র উপায়। দু'জায়গায় লিখেছেন, গবর্নমেণ্টের সঙ্গে

বিবাদ করা অন্যায়, আরেক জায়গায় লিখেছেন, প্রকৃতির নিয়মে যখন যে জাতি রাজপদে অধিষ্ঠান করে তাদের প্রাপ্য রাজ-সম্মান না দিলে দেশের কখনও উন্নতি হবে না। রাজার জাতিকে রাজ-সম্মান দিতে থাকলে প্রকৃতির নিয়মে আমরা একদিন নিজেরাই রাজার জাত হতে পারব, নয় তো কোনোদিন পারব না। এসব কোন্ দেশী কথা মশাই?'

'যুক্তিও তো দিয়েছেন।'

'যুক্তি? অমন যুক্তি আমরাও দিতে পারি, শুনবেন? দেয়ালটা সাদা দেখছেন তো? আপনি ভুল দেখছেন। বিজ্ঞানে বলে, সবগুলি রঙ মিশে সাদা হয়, বিজ্ঞান অবশ্য সত্যকে বিকৃত করে দেখে, আপনি যদি বেদের সপ্তম অধ্যায়টা পাঠ করেন, দেখবেন সেখানে লেখা আছে সমস্তই অস্থায়ী। সুতরাং রঙ মিশে সাদা হয় নি, রঙগুলি অস্থায়ী বলে সাদা দেখায়—চোখের ভুল। এবারে দেখতে পাচ্ছেন দেয়ালের রঙটা লাল? এই নীল হয়ে গেল, এই আবার সবুজ হ'ল, দেখতে দেখতে হলদে হয়ে গেল—'

তামাটে মুখ প্রায় কালো করিয়া জ্যোতির্ময়কে ফিরিতে হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি? তবু তাকে চেষ্টা করিতে হয়, চাকরি তো বজায় রাখিতে হইবে?

বন্ধুদের কাছে জ্যোতির্ময় অনুচ্চারিত অভিযোগের জবাব দিবার মতো সবিনয়ে বলে, 'ব্যাপারটা কি জান? সকলের হ'ল দলাদলি মাতামাতি নিয়ে কারবার, কর্তার মতামত প্রচলিত মতামতের বিরোধী। তাছাড়া, কর্তা বড়ই তেজস্বী আর স্বাধীনচেতা পুরুষ,—এইজন্য কর্তাকে অনেকে পছন্দ করে না।'

অপরাধ কার, সে নিজে কেন অপরাধী সাজিয়া থাকে, জ্যোতির্ময় বুঝিতে পারে না। তবুও সত্যপ্রিয়কে যারা মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে না, সত্যপ্রিয়র মতামত নিয়া হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে, তাদের কাছে কেমন যেন ছোট মনে হয় নিজেকে।

জ্যোতির্ময়কে সত্যপ্রিয়র সব সময়েই প্রায় দরকার হয়। কেবল আপিসে কাজ করিয়াই তার রেহাই নাই, সকালে ও সন্ধ্যায় প্রায়ই বাগানবাড়িতে

ছুটিতে হয়, ছুটির দিনগুলিও অধিকাংশই বাগানবাড়িতে কাটে। হয়তো ঘণ্টাখানেক সত্যপ্রিয় তার সঙ্গে কাজের কথা বলে, বাকী সময়টা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তবে অসময়ে খাওয়ার জন্য বাড়িতে জ্যোতির্ময়কে ছুটিতে হয় না, খাওয়াটা সত্যপ্রিয়র ওখানেই হয়। মানুষজনকে খাওয়ানো সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় বড়ই উদার। হয়তো সত্যপ্রিয়র ধারণা আছে, মানুষকে দিয়া গুণ গাওয়ানোর একটা খুব সহজ উপায় মানুষকে ঠাসিয়া নুন খাওয়ানো।

চাকরি জ্যোতির্ময়কে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মুখে সে বলে বটে যে, খাটিতে খাটিতে প্রাণ গেল, এত খাটুনি মানুষের সহ্য হয় না,—বাড়ির চেয়ে আপিসে থাকিতেই সে ভালবাসে, বাড়ির লোকের ভাবনা ভাবার চেয়ে কাজের ভাবনা ভাবিতেই তার আরাম বোধ হয় বেশী। অনেক বয়সে বিবাহ করিলে লোকে নাকি একটু বৌ-পাগলা হয়, জ্যোতির্ময়েরও হয়তো এরকম পাগলামি একটু আসিয়াছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ পায় রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিবার সময়, যখন আর কোনো কাজ করিবার থাকে না, আর কিছু ভাবিবার থাকে না। আগে বিশ্রাম ছিল শুধু ঘুম, এখন জুটিয়াছে পুতুল নিয়া খেলা করার আমোদ,—অপরিপুষ্ট ও অপরিণত অপরাজিতার বিবর্ণ মুখ ও উৎসুক দৃষ্টি শ্রান্তি দূর করিতে সাহায্য করে। সারাদিন মনের রাশ টানিয়া রাখিবার পর আলগা দেওয়া মাত্র প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় প্রচণ্ডভাবে, মনের একটা সাময়িক বিকারের মতো। কি যে সে করে অপরাজিতাকে নিয়া আর কি যে করে না, আদরে সোহাগে দম আটকাইয়া আসে,—শান্ত, সহিষ্ণু ও অন্যমনস্ক মানুষটার আকস্মিক প্রণয়মূলক উন্মত্ততার ভয়ে তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। কোনোদিন তার মূর্ছা হওয়ার উপক্রম হয়, ফ্যাকাসে মুখে চটচটে ঘাম দেখা দেয়, চোখ স্তিমিত হইয়া আসে। জ্যোতির্ময় খেয়ালও করে না অপরাজিতার মুখে একটি কথা নাই, আধমরা মানুষের মতো সে শিথিল হইয়া গিয়াছে। এক গ্লাস জল দিতে বলিলে সে যে নড়িতেছে না সেটা দুষ্টামিও নয়, অবাধ্যতাও নয়,

আলস্যও নয়। আপিসের পিয়ন কথা না শুনিলে জ্যোতির্ময় যেমন বিরক্ত হয়, অপরাজিতার উপর তার তেমনি বিরক্তি জাগে। নেহাত ভদ্রলোক বলিয়াই আপিসের পিয়নের মতো বৌকে গালাগালি করে না, মৃদু অনুযোগ ও উপদেশ দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

অপরাজিতার গা এলানো নির্বাক শিথিল ভাবটা জ্যোতির্ময় যে অসুস্থ দেহ-মনের দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া চিনিতে পারে না, হয়তো তার আরও একটা কারণ আছে। মাঝে মাঝে অপরাজিতাও ক্ষেপিয়া যায়, কি অফুরন্তই মনে হয় সেদিন তার জীবনীশক্তি। গল গল করিয়া ক্রমাগত কথা বলিয়া যায়, অপরিমিত হাসে, প্রাণহীন জড়বস্তুর মতো কেবল সোহাগ গ্রহণ করার বদলে সোহাগের বন্যায় স্বামীকে একেবারে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করে, এমন লজ্জাহীন বেহায়ার মতো আচরণ করে যে, জ্যোতির্ময় প্রায় স্তম্ভিত হইয়া যায়। আবেগের আতিশয্যে কোনোদিন নিজের চুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করে; অস্বাভাবিক ফর্সা মুখখানা তাহার দেখায় রক্তবর্ণ, চোখ হইয়া থাকে বিস্ফারিত।

পরিসমাপ্তিটাই জ্যোতির্ময়কে সবচেয়ে বেশী বিব্রত করে। অকারণে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া অপরাজিতা বলিতে থাকে, 'লোকে বৌকে কত ভালবাসে, তুমি আমায় একটুও ভালবাস না।' কিছুতেই কি সে থামে! জ্যোতির্ময় যতই বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, অন্য যত স্বামী আছে পৃথিবীতে তাদের সকলের চেয়ে সেই বেশী ভালবাসে তার বৌকে, অপরাজিতা তত বেশী কাঁদে আর তত বেশী অনুযোগ করে।

পরদিন নটা দশটার আগে কোনোমতে অপরাজিতাকে তোলা যায় না, সুবর্ণ গিয়া জাগাইয়া দিলেও তার হাত ছুঁড়িয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ আবার ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুম যখন ভাঙে, বুঝিতে যখন পারে, সে কে এবং কোথায় আছে, তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। কোনো রকমে সে নিচে যায়, লজ্জায় ভয়ে কাঠ হইয়া থাকে। অন্য সময়, অন্য অবস্থায়, অন্য লোক তার মুখ আর কালিপড়া চোখ দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ হয়তো তাকে বিছানায়

ফেরত পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া আনিত, কিন্তু এসময়, এ অবস্থায়, এ বাড়িতে কে অনুমান করিবে অসুখের ঝড়েই একরাত্রে মেয়েটার অবস্থা হইয়াছে দুমড়ানো মোচড়ানো চারার মতো? প্রতিদিনকার মতো কালও সে নিয়মিত খাইয়া-দাইয়া ঘরে গিয়াছিল, কাল বরং অন্যদিনের চেয়ে তাকে মনে হয়েছিল একটু বেশী সজীব আর হাসিখুশি। তা ছাড়া, অনেক রাত্রে তার হাসি আর কথার শব্দও তো বাড়ির লোকের কানে আসিয়াছে কিছু কিছু'।

তাই সুধীরা মুখ বাঁকাইয়া শুধু বলে, 'হুঁঃ।' আর সুবর্ণ কেবলি মুচকি মুচকি হাসে, আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গত রজনীর ইতিহাস সব না হোক কিছু শুনিবার জন্য কেবলি তোষামোদ করে আর কেবলি ভয় দেখায়, 'না যদি বল বৌদি, আমার বিয়ে হলে একটি কথা তোমায় বলব না।'

জ্যোতির্ময় কিছু ছাখেও না, বলেও না। ঘুম ভাঙিবার পর আর অপরাজিতার দিকে তাকানোর অবসর তার হয় না। কত দায়িত্ব তার, কত দুশ্চিন্তা! মন পড়িয়া থাকে আপিসের দিকে। অপরাজিতা উঠিবার আগেই হয়তো সে বাহির হইয়া যায়।

হেড আপিসটি বেশ বড়, কয়েকটি বিভাগ আছে, শ'চারেক লোক কাজ করে। জ্যোতির্ময়ের আপিস যে ঘরে তার মাঝামাঝি মানুষ-সমান উঁচু কাঠের পার্টিশন তুলিয়া দু'ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, একভাগে জ্যোতির্ময় বসে, অন্যভাগে অনাথের বড়শালা কেষ্টবাবু। কেষ্টবাবুর কাজটা যে ঠিক কি, এত কাছাকাছি থাকিয়া এতদিনেও জ্যোতির্ময় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এককালে স্বদেশী করিত, অনেকগুলি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ ছিল, সভা-সমিতি ও নেতাদের মজলিসে সব সময়েই প্রায় তাকে দেখা যাইত। কেবল, জেলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এমন কোনো বিপজ্জনক সম্ভাবনার সময় আর তার পাত্তা মিলিত না। প্রৌঢ় বয়সে বোধ হয় কতকটা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার পুরস্কার স্বরূপ আর কতকটা অনাথের খাতিরে এখানে একটা চাকরি পাইয়া এখন একটু আরাম করিতেছে। শ্রোতা

পাইলেই নিজের গৌরবময় অতীত জীবনের গল্প আরম্ভ করে, সগর্বে বলে, 'ছেড়ে দিয়ে এলাম সাধে ? আর সইল না মশায়। ওরা সব ক'টা হামবড়া, কেবল দলাদলি আর নিজে কি করে বড় হবে সেই চেষ্টা। চক্কোত্তিমশায়ের কথাই ঠিক, ওরাই দেশের সর্বনাশ করছে।' শ্রোতা না পাইলে টেবিলের সামনে মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া থাকে, মাঝে মাঝে ফোনটা তুলিয়া নিয়া কথা বলে, আর যখন তখন নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে একে ওকে ডাকিয়া অর্থহীন প্রশ্ন করে এবং উপদেশ ও ধমক দেয়। এইসব পরিশ্রমের কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সত্যপ্রিয়র দামী মোটর আপিসের সামনে আসিয়া দাঁড়ানো-মাত্র তাকে ডাকিয়া দিবার জন্য পিয়ন পাঁচুকে সতর্ক করিয়া দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া একটু ঘুমায়।

ঘুমানোর আগে হয়তো জোর গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কি করছেন জ্যোতির্ময়বাবু ?'

'প্রুফ দেখছি।'

'চক্কোত্তিমশায়ের নতুন প্রবন্ধটার প্রুফ ? সংস্কৃত কোটেশনগুলি ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন কিন্তু অনেক খুঁজেপেতে বার করেছি।'

জ্যোতির্ময় জবাব দেয় না। প্রবন্ধগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যপ্রিয়র অগাধ পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় থাকে, তার উৎস যে কেষ্টবাবু নয়, কেষ্ট-বাবু শুধু সত্যপ্রিয়র কোন বিষয়ে কি ধরনের শাস্ত্রীয় বাক্য প্রয়োজন জানিয়া নিয়া কয়েকজন আসল পণ্ডিতের কাছ হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনে, জ্যোতির্ময়ের তা জানা আছে। তবু মোটামুটি সংস্কৃত জানা থাকায় সংগ্রহের কাজটা কেষ্টবাবু করে এবং করিতে পারে বলিয়া লোকটার উপর জ্যোতির্ময় বড়ই ঈর্ষা বোধ করে।

পিছনের ঘরখানা খাতাপত্রের গুদাম। আপিস-ঘরে ঢুকিলেই জ্যোতির্ময় পুরানো কাগজের সোঁদা গন্ধ পায়—কয়েক বছর নাকে লাগিতে লাগিতে সবদিন গন্ধটা সে আজকাল সচেতনভাবে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু অভ্যস্ত আবেষ্টনীর আরামটা সঙ্গে সঙ্গে বোধ করে। টেবিলের উপর বাঁধানো খাতা, ফাইল, কাগজপত্র, অভিধান পর্যায়ের কয়েকটি

ইংরেজী বাংলা বই, কতকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, আজকের তারিখের সাত-আটখানা ইংরেজী বাংলা ছোটবড় সংবাদপত্র, কাগজ-চাপার তলে কয়েকটি প্রুফ, কাঁচের দোয়াতদান, ব্লটিংপ্যাড, কলিং-বেল, পিনকুশন এই সমস্ত খুঁটিনাটির অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন চোখের পলকে অনুভব করিয়া সে খুশি হইয়া ওঠে।

নিজের রাজ্য পরিদর্শনরত রাজার মতোই তৃপ্তিভরা এক অপরূপ গাম্ভীর্য তার গোলগাল মুখখানিতে ফুটিয়া ওঠে। নূতন ও পুরাতন চেয়ারগুলি, এক কোণে বইভরা বুক সেল্‌ফ ও অন্য কোণে বাদামী কাগজে বাঁধানো পাহাড় সমান পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল এ সমস্ত যে তাকে ঘিরিয়া আছে কাজ করিতে করিতেও সে যেন মাঝে মাঝে তা অনুভব করিতে পারে। কাজের সময় এবং অন্য সময়েও, অনুভব করিতে পারে না কেবল পার্টিশনটার ওপাশে কেষ্টবাবুর অস্তিত্ব। বোধ হয় কেষ্টবাবুর উপর তার রাগ আছে বলিয়া।

নন্দকে জ্যোতির্ময় একটি চাকরি দিয়াছে, সত্যপ্রিয় মিলে ধর্মঘটের কিছুদিন পরেই। যশোদার আর ইচ্ছা ছিল না নন্দ এখানে চাকরি করে, ধর্মঘটের সঙ্গে সে যে ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল তারপর তার ভাইকে এখানে চাকরি করিতে দেওয়াটা একটু খারাপ দেখায়। কিন্তু এদিকে ভাইটাও তার দিন দিন বড়ই বখাটে হইয়া যাইতেছে। গান-বাজনা করিয়া আর তাস পিটাইয়া অলস বেকার জীবন যাপন করিতে করিতে অমানুষ হইয়া পড়িতেছে দিন দিন। যশোদার নিজের হাতে মানুষ করা ছেলে, সেই ছেলের চোখে কিনা মাঝে মাঝে ধরা পড়িতেছে ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু চাউনি! বারণ তাই যশোদা করে নাই। সত্যপ্রিয় মিলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া তো তার হয় নাই, এমন আর কি খারাপ দেখাইবে তার ভাই সত্যপ্রিয়র আপিসে সামান্য মাহিনায় কাজ করিলে। বাস্তব জগতের সংস্পর্শে একটু আসুক নন্দ, নরম মনটা তার গলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, একটু শক্ত হোক।

'একটা ছোটখাট দোকান করে দি, তাই চালা তুই নন্দ, কেমন?'

'না দিদি। চাকরিই করি।'

তা করিবে না? চাকরি ছাড়া আর কিইবা করিবার ক্ষমতা তোমার আছে!

নন্দর কাজটা জ্যোতির্ময়কে সাহায্য করা। সহকারী সে নয়, সাহায্যকারী। নানা ঠিকানায় যেসব চিঠিপত্র পুস্তিকা প্রভৃতি যায় তার উপর ঠিকানা লেখা, কোথায় কি পাঠানো হইল সেটা খাতায় টুকিয়া রাখা, যেখানে জ্যোতির্ময়ের নিজে না গেলেও চলে অথচ পিয়ন পাঠানো যায় না সেখানে ছুটাছুটি করা, জ্যোতির্ময়ের প্রয়োজন মতো হাতের কাছে এটা ওটা আগাইয়া দেওয়া, এই ধরনের সব ছোট ছোট সাধারণ কাজ। এই কাজ পাইয়া নন্দ কিন্তু ভারী খুশি। সে চাকরি করে কেবল এই জন্মই তার গর্বের সীমা নাই, তার উপর জীবনের হঠাৎ একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কি একটা অজানা রহস্যময় জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে যেখানে চলাফেরা ওঠাবসা কথা বলা চুপ করিয়া থাকা সব কিছুরই নিয়ম নতুন!

এককোণে ছোট একটি টেবিল তার রাজ্য। জ্যোতির্ময়ের টেবিলের তুলনায় তার টেবিলটিকে অবশ্য দেখায় সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের কাছে জংলী দেশের জমিদারীর মতো, তবু মোটা মোটা খাতা, দোয়াতদান, ব্লটিংপ্যাড, পিনকুশন এসব সম্পদপূর্ণ এমন একটি সম্পত্তিই বা নন্দর কবে ছিল। অতি যত্নে নন্দ সব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে, মসৃণ ও সমতল করিয়া লাল নীল পেন্সিলের দু'টি মুখ কাটে, লাল কালির কলম ভুলিয়াও কখনও কালো কালিতে ডুবায় না, খাতার কাগজে লিখিবার সময় ধরিয়া ধরিয়া সাবধানে লেখে, খামে ভরিবার আগে প্রচারপত্রটির সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের লিখিত পত্রটি ক্লিপ আঁটিবে না পিন দিয়া আঁটিবে এ কথাটি পর্যন্ত জ্যোতির্ময়কে জিজ্ঞাসা করিয়া নেয়। আর পরম উৎসাহে আপিসের নিয়মকানুন আয়ত্ত করার চেষ্টা করে।

জ্যোতির্ময় গম্ভীর মুখে বলে, 'অনাথবাবু ঘরে এলে উঠে দাঁড়িও!'

নন্দর মুখ ম্লান হইয়া যায়, ভয়ে ভয়ে বলে, 'উনি রাগ করেন নি তো? আর কে কে এলে উঠে দাঁড়াব?'

'বলে দেব'খন।'

বাড়ি ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। তার শুকনো মুখ দেখিয়া যশোদা মনে মনে রাগ করিয়া ভাবে, সামান্য একটা চাকরির পরিশ্রম পর্যন্ত সইবার ক্ষমতা নেই শরীরে, কেন জন্মেছিলি তুই পৃথিবীতে? ভাইকে সে দুধ খাওয়ায়, কলা খাওয়ায়, সন্দেশ খাওয়ায়,—চাকরির শ্রমে ক্লান্ত শরীরটা যদি ভাল ভাল খাদ্য পাইয়া একটু পুষ্ট হইতে রাজী হয়। সন্ধ্যার সময় যশোদা রাঁধাবাড়া নিয়া ব্যস্ত থাকে, তখন অবসর হয় না, রাত্রে নন্দ চাকরির গল্প করে—সমস্ত দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের বিস্তারিত কাহিনী। নন্দর আনন্দ ও আগ্রহ যশোদাকে পীড়ন করে। শুনিতে শুনিতে মনে তার খটকা লাগে যে, চাকরি করিতে গিয়া বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসিয়া নন্দর মন শক্ত হইবে এ আশা বোধ হয় মিথ্যা। যে জগতে নন্দ মানুষ হইয়াছে সেখানকার বাস্তবতা কি কম কঠোর, কম সর্বগ্রাসী। তা-ই যদি নন্দকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া থাকে, সত্যপ্রিয়র আপিসের বাস্তবতা কি পারিবে? এক একটা ছেলে বোধ হয় এইরকম বর্ম পরা মন লইয়া জন্মায়, পৃথিবীর ধূলা কাদা সে মনের নাগাল পায় না। পাপ পর্যন্ত তারা করে পুণ্য করার মতো নির্দোষ আগ্রহের সঙ্গে। যে সব ছেলের সঙ্গে নন্দ এতকাল আড্ডা দিত, এখনও সকাল সন্ধ্যায় দিতেছে, তাদের কাছে পাকামি শিখিতে কি কিছু তার বাকী আছে? কিন্তু কি কাজে লাগিয়াছে তার ওসব শিক্ষা? ছেলেমানুষী ঘোচে নাই, মন পাকে নাই, কয়েকটা কেবল বিকার জন্মিয়াছে মনের, কদর্য এবং কুৎসিত। বসিয়া বসিয়া স্বপ্ন দেখার তাতে তার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। খারাপ দিকেও কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়া নন্দর মনটা যদি একটু শক্ত হইত, শিশু ভিখারী আর কিশোরী মেয়ের মতো ভয়, লজ্জা, অভিমান, বিনয়, নির্ভর-শীলতা, সঙ্কোচ, স্বপ্ন দেখা এসব যদি একটু কমিত, বাঁচিয়া থাকাই যে একটা ভীষণ লড়াই এ বিষয়ে সামান্য একটু জ্ঞান জন্মিয়া ভাবপ্রবণতাটা খানিকটা নিস্তেজ হইয়া আসিত, তাতেও বোধ হয় যশোদা খুশি হইত।

একদিন সত্যপ্রিয় মহাসমারোহে বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধের আয়োজন

করিয়াছে, রাজ্যের লোককে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এক দলকে মধ্যাহ্নে আর একদলকে রাত্রে। আপিসের সকলে রাত্রে সত্যপ্রিয়র বাড়ি খাইতে যাইবে। হঠাৎ দুপুরবেলা সত্যপ্রিয় আপিসে আসিয়া হাজির। কেউ স্বপ্নেও ভাবে নাই সেদিন সে আপিসে আসিবে। সকলেই কম বেশি গা এলাইয়া দিয়াছিল—কেরানীরা পর্যন্ত। কেরানীদের সঙ্গে সত্যপ্রিয়র একরকম কোনো সম্পর্কই নাই, তাদের উপর অনেক উপর-ওয়ালা আছে, অন্যদিন যারা তাদের এক মুহূর্তের জন্য ঘাড় তুলিতে দেয় না। সত্যপ্রিয় না আসিলেও তাদের কাজে ঢিলা পড়িবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু কেবল একজনের কড়াকড়িতে সেখানে নিয়ম-তান্ত্রিকতা জেলখানার অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়, একটি মাত্র স্ক্রু আঁটা থাকিলে যেখানে সংগঠন খাড়া থাকে, সেই একজনের স্ক্রুতে ঢিলা পড়িলেই নিয়ম শিথিল হয়, সংগঠনে আলগা পড়ে। অন্যদিন সত্যপ্রিয় না আসিলেও কিছু আসিয়া যায় না, তার আসিবার সম্ভাবনাতেই যথারীতি কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু আজ সত্যপ্রিয়র আবির্ভাব এক-রকম অসম্ভব জানা থাকায় কাজে কারও মন নাই, মাস্টার আসিবে না জানিয়া স্কুলের ছেলেদের যেমন হয় সকলের মনে সেই রকম একটা মুক্তির আনন্দ আসিয়াছে, উপরওয়ালারাও হঠাৎ বিস্ময়কর উদারতার সঙ্গে কেরানীদের অনেকটা রেহাই দিয়াছে, ধমক দিবার পরিশ্রমটুকুও তারা আজ করিতে নারাজ। অনাথ ও আরও তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সিঁড়ির ঠিক পাশের ঘরে দরোয়ানকে দিয়া দরোয়ানের শিল-নোড়াতেই সিদ্ধি বাটাইতেছে, আপিসের দলাদলিতে এরা অনাথের দল। অন্য ঘরে উপরওয়ালাদের আরেকটি দলের গোপন পরামর্শের আসর বসিয়াছে, আলোচ্য বিষয়—আপিসের কূটনীতি এবং অনাথের প্রতিপত্তি ক্ষয় করিবার উপায় উদ্ভাবন। দুটি ছেলেমানুষ কেরানী বারান্দায় দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে গল্প করিতেছে। কর্মব্যস্ততার গুঞ্জনধ্বনির বদলে আজ আপিস জুড়িয়া উঠিয়াছে গল্পগুজবের চাপা কলরব। কয়েক-জন বৃদ্ধ কর্মচারী শ্রান্ত চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছে আর পাঁচুকে যথারীতি সতর্ক করিয়া না দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া কেষ্টবাবু হইয়া পড়িয়াছে

নিদ্রাগত।

সত্যপ্রিয়র দামী মোটরটি নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল, হাতির দাঁতের ছড়িটি হাতে করিয়া সত্যপ্রিয় নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আপিসের আবহাওয়ায় যেন একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া গেল। কি ভাগ্যে মোটর আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র পাঁচুর চোখে পড়িয়াছিল, চাপা গলায় অনাথকে খবরটা দিয়াই সে উপরে ছুটিয়া গেল। তারপর চওড়া একটা কাগজের তলে চাপা পড়িয়া গেল শিল-নোড়া, যুবক কেরানী দুটির হাতের সিগারেট পায়ের তলে পিষিয়া গিয়া হাতে দেখা দিল কলম, বৃদ্ধ কর্মচারী ক'জন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া কেষ্টবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিল মোটা একটা হিসাবের খাতা; আপিসটা হঠাৎ হইয়া গেল অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ। সত্যপ্রিয় মৃদু একটু হাসিল। এরকম নিঃশব্দ পূজায় সে বড় তৃপ্তি পায়। এক একটি ঘরের সম্মুখ দিয়া সত্যপ্রিয় যায় আর ঘরের ভিতরের কর্মচারীরা তড়াক তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, সত্যপ্রিয় চাহিয়াও দেখে নাই। তবে এ ঘরে ঢুকিবামাত্র পার্টিশনের ওপারে কেষ্টবাবু যে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া চেয়ারটাই উল্টাইয়া দিল, আর এপারে জ্যোতির্ময় ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেই লাগিল, এটা চাহিয়া দেখিল। একটুক্ষণের জন্য মনে হইল, দেওয়াল আর পার্টিশনের শেষপ্রান্তের কয়েকহাত ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়াইয়া সত্যপ্রিয় ঠিক করিতে পারিতেছে না কার অংশে পদার্পণ করিবে। এ ধরনের সমস্যায় সত্যই সত্যপ্রিয়র বিরক্ত জাগে, কৌতুকও বোধ হয়। ব্যাপারটা হাস্যকর বটে, কিন্তু তুচ্ছ নয়। যার অংশে পা দিবে সেটা হইবে তার সম্মান ও পুরস্কার, অন্যজনের পক্ষে যা তিরস্কারের সমান।

'এদিকে আসুন কেষ্টবাবু, দু'জনে জ্যোতির্ময়বাবুর অতিথি হওয়া যাক। কি লিখছেন জ্যোতির্ময়বাবু?'

মুখ তুলিয়া দেখিয়া জ্যোতির্ময়ও তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

'বসুন, বসুন। অত ফর্মালিটি করবেন না, এ যুগে এসব ফর্মালিটি অচল, কি বলেন?'

বলিয়া নিজে সত্যপ্রিয় দাঁড়াইয়া থাকে, বসে না। হাসি মুখে উচ্চারিত সহজ সরল মন্তব্য আর প্রশ্নটি যে তার কতবড় ফাঁদ, সত্যপ্রিয়র কাছে যে অনেকদিন কাজ করে নাই, তার পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সে দাঁড়াইয়া আছে, শুধু বসিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই জ্যোতির্ময় বসে কিনা হঠাৎ তাই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সাধ হইয়াছে সত্যপ্রিয়র। কিন্তু ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের পরীক্ষায় জ্যোতির্ময় কখনও ফেল করে না। সে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যপ্রিয়র কথার ফাঁদের জবাবও জানা আছে—'আজ্ঞে না এটা ঠিক ফর্মালিটি নয়, আপিসের সুপিরিয়র আপিসারের সামনে দাঁড়ানোই নিয়ম·।'

এই কথাগুলি জ্যোতির্ময় উচ্চারণ করিল বটে, কিন্তু বলিল কি শুধু এই-টুকু? কেবল সুপিরিয়র আপিসার বলিয়া দাঁড়ায়, আর কোনো কারণ নাই? কত কারণ আছে আরও। সত্যপ্রিয় অসাধারণ মানুষ, এজগতে তার মতো মানুষ আর নাই, তার অতুলনীয় বিদ্যাবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, কর্মশক্তি, চরিত্রবল, নিষ্ঠা সমস্ত মিলিয়া জ্যোতির্ময়কে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে গদ্‌গদ করিয়া দিয়াছে, এইগুলিই আসল কারণ। তবে এসব কথা মুখে বলিতে নাই, নির্জলা স্তোকবাক্যের মতো শোনায়, এরকম সস্তা মোসাহেবী সত্যপ্রিয়র ভাল লাগে না। না বলিয়াও এই কথাগুলি বলিবার একটা কায়দা আছে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতে, বলার ধরনে কথাগুলি নেপথ্যে থাকিয়াও সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করে। কায়দাটা আয়ত্ত করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু তারপর আর বিশেষ অসুবিধা হয় না। মনের কথা বলাও হইয়াছে, সত্যপ্রিয়র শোনাও হইয়াছে, টের পাইয়া তখন বড়ই আনন্দ হয়। সরব পূজাও অবশ্য আছে সত্যপ্রিয়র, কিন্তু নীরব পূজা যখন জানাইয়া দেয় পূজা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে, তখন প্রায় পুলকের শিহরণের সঙ্গেই মনে হয়, দেবতার সঙ্গে যেন রীতিমতো একটা সম্পর্কই স্থাপিত হইয়া গেল।

কেষ্টবাবুর পূজাটা প্রধানত সরব, জ্যোতির্ময়ের নীরব পূজার মতো মার্জিতও নয়, সরসও নয়। কেষ্টবাবুর ঈর্ষাতুর মুখের দিকে এক নজর চাহিয়া জ্যোতির্ময়ের পূজায় পরিতৃপ্ত দেবতা উপবেশন করে।

তারপর অনাথ আসিয়া জোটে। নিজের ঘরে না গিয়া সত্যপ্রিয় জ্যোতির্ময়ের ঘরে গিয়াছে টের পাইয়া আপিস পরিচালনায় যে ক'জন সত্যপ্রিয়র ডান-হাত আর বাঁ-হাত তারাও আসিয়া জোটে। প্রথমে দাঁড়াইয়া থাকে, বসিতে বলিলে বসে। সত্যপ্রিয় কথা বলে এমনভাবে যেন এ আপিসটির সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নাই, সে কেবল একজন মাননীয় অতিথি, একটু বেড়াইতে আসিয়াছে, গল্পগুজব করিতে আসিয়াছে। বাহিরের লোকের মতোই এক সময় সে ভদ্রতার কুশল জিজ্ঞাসা করার মতো বলে, 'কাজকর্ম চলছে কেমন আপনাদের, ঠিক-ভাবে চলছে তো?' বলিয়া মুখটা এদিকের কাঁধের সান্নিধ্য হইতে ধীরে ধীরে ওদিকের কাঁধের কাছে লইয়া গিয়া নিজেই আবার বলে, 'একটু যেন ঢিল পড়েছে মনে হল। তা হোক, তাই স্বাভাবিক, মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'একটা দিন এরকম ঢিল পড়ে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্য বজায় রেখে পাশ্চাত্য প্রথায় কাজ করা বড় কঠিন, মানুষকে একেবারে যন্ত্র বানিয়ে দিচ্ছে দিনকে দিন—স্বাস্থ্য, শান্তি সব রসতলে গেল।'

এই ভয়টাই সকলের মনে জাগিতেছিল। আজ যখন তার পিতৃশ্রাদ্ধ, কেহ কল্পনাও করিবে না সে আপিসে আসিবে, অতএব আজই একবার দেখিয়া আসা যাক কাজকর্ম কেমন চলিতেছে। সকলেই মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া ক্লিষ্ট হাসি হাসে। অনাথ বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু কাজে ঢিল পড়েছে আজ, কারও মন বসছে না কাজে। ওবেলা আপনার ওখানে যাবার কথা ভেবে—'

'এখন ছুটি দিয়ে দিলে কেমন হয় অনাথ?'

জবাব দেওয়ার আগে অনাথ এক মুহূর্তের মধ্যে সত্যিপ্রিয়র মুখের ভাবটি অধ্যয়ন করিয়া ফেলে, তারপর দৃঢ়স্বরে বলে, 'আজ্ঞে না, খেতে যাবে রাত্রে, এখন থেকে ছুটি কেন?'

সত্যপ্রিয় সকলের দিকে চাহিয়া বলে, 'দেখলেন আপনারা? আপিসের ওপর এতটুকু জোরও আমার নেই, একদিন হাফ হলিডে দিতে চাইলে দিতে পারি না!'

সত্যই যেন আপিসের উপর সত্যপ্রিয়র কিছুমাত্র জোর নাই, এইরকম-ভাবে সকলে নিঃশব্দে হাসিল। এভাবে হাসাই নিয়ম, কারণ এটা রসিকতা। 'ইচ্ছে করলে এক দিন কেন, যতদিন খুশি আপিস ছুটি দিতে পারেন—' এ ধরনের কোনো কথা বলা নিষেধ। কারণ, তাতে দিনকে রাত বলিয়া যে রসিকতা করা হইয়াছে তার জোর কমিয়া যায়। সত্যপ্রিয় সাধারণভাবেই কথা বলিয়া যায়, রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু আপিসের কাজে শৈথিল্য দেখিয়া যে খুশি হয় নাই, সেটা টের পাইতে কারও বাকী থাকে না। খুশি না হওয়ার মধ্যেই এ ব্যাপারের শেষ নয়, বেতনভোগী কর্মচারীদের সম্বন্ধে অমন নিষ্ক্রিয় খুশি অ-খুশির ধার সত্যপ্রিয় ধারে না। কিছু একটা ঘটিবেই। হয়তো সপ্তাহ কাটিবে, মাস কাটিবে, আজিকার আকস্মিক আপিস পরিদর্শনের কথা সত্যপ্রিয়র মনে আছে কিনা টেরও পাওয়া যাইবে না। হঠাৎ একদিন কয়েকটা পরিবর্তন, কয়েকটা নূতন নিয়ম বিনা সমারোহে চালু হইয়া যাইবে। কিন্তু কি পরিবর্তন ? কি নিয়ম ?

কিছুক্ষণ পরে সত্যপ্রিয় উঠিল। বুক-সেল্ফের আড়ালে আধ-ঢাকা নন্দর দিকে কখন চোখ পড়িয়াছিল কেউ জানে না, উঠিয়া দাঁড়াইয়াই কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, 'ছেলেটি কে জ্যোতির্ময়বাবু ?'

জ্যোতির্ময়ও এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। 'একজন হেল্পার নিতে বলেছিলেন, ওই ছেলেটিকে নিয়েছি। নন্দ এদিকে এসো। এঁকে প্রণাম কর।'

ঝুঁকিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করবার সময় মনে হইল নন্দর শির-দাঁড়াটা বুঝি জামা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, আশীর্বাদ করার ছলে সত্যপ্রিয় আলগোছে তারই উপরে একটু হাত বুলাইয়া দিল। হঠাৎ-জাগা ছেলেমানুষী খেয়ালের হাত হইতে মানুষ হইয়া কে রেহাই পায় ? সংযমের জন্য সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

বোধ হয় নিজের এই আকস্মিক ও অকারণ দুর্বলতার কাছে হার মানার জন্যই নন্দর স্বাস্থ্যের শোচনীয় অভাবটা সত্যপ্রিয় ক্ষমা করিয়া ফেলিল। বোধ হয় আপিসের তুচ্ছতম কেরানীটিকেও সে তুচ্ছ করে

না, ডান-হাত বাঁ-হাতগুলিকে এটা বুঝাইয়া দিবার জন্যই বিদায় নেওয়া কয়েক মিনিট পিছাইয়াও দিল। নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল দু'একটা কথা, উপদেশ ও উৎসাহ দিল যথেষ্ট, সামান্য অবস্থা হইতে মানুষ যে শুধু নিজের চেষ্টাতেই বড় হইতে পারে এই সুপ্রাচীন মিথ্যাটি কয়েকবার কয়েকভাবে নন্দর মাথায় ঢুকাইবার চেষ্টা করিল—সমস্তই স্নেহ ও শুভেচ্ছার সঙ্গে।

তারপর হঠাৎ সে যেন চিরকালের মতো বিদায় গ্রহণ করিতেছে, সকলের সঙ্গে এই তার শেষ দেখা এমনি উদাস ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা যাওয়া যাক এবার, কাজ করুন আপনারা। যে সমস্যাতে আপনারা আমাকে ফেলে দিলেন মশায়! মাঝে মাঝে দশজনকে ডেকে খাওয়াতে না পারলে তো বাঁচব না মশায়, পয়সা যে রোজগার করছি দু'টো, আর কিসে তার সার্থকতা বলুন? কিন্তু আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকলেই যদি কাজে ঢিল পড়ে, তবে তো ভাবনার কথা! পয়সাই যে রোজগার হবে না তা হলে, দশজনকে খাওয়াবো কি!'

সে চলিয়া গেলে সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করে। এ আপিসে সব চেয়ে বেশী মাহিনা পায় বীরেনবাবু নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সত্যপ্রিয়র সম্বন্ধে বেশী মাথা ঘামানোর বদলে কাজের দিকেই তার ঝোঁক বেশী। একরকম তারই চেষ্টায় সত্যপ্রিয়র নূতন একটি ব্যবসায় এবং আপিসের নূতন একটি বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গড়িয়া তোলার কাজে সত্যপ্রিয়র সঙ্গে কয়েকবার তার মনোমালিন্যও হইয়া গিয়াছে। সত্যপ্রিয় যে তাকে পছন্দ করে না, তাকে ছাড়া চলিবে না বলিয়াই টিঁকিয়া আছে, অনেকেই তা জানে। বীরেনবাবু সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'ভয় নেই, কেউ আপনারা জবাই হবেন না। উনি শুধু ওয়ার্নিং দিয়ে গেলেন। উনি কাউকে জবাই করেন না।'

কথাটা সেই রাত্রেই প্রমাণ হইয়া গেল অদ্ভুতভাবে।

সত্যপ্রিয়র প্রকাণ্ড বাড়ির প্রকাণ্ড হল, বড় বড় তিনটি ঘর আর উপর ও নিচের লম্বাচওড়া বারান্দায় নিমন্ত্রিতেরা সারি সারি বসিয়া গিয়াছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলাইয়া স্ফটিকের জপমালা হাতে করিয়া

খড়ম পায়ে সত্যপ্রিয় একে একটু হাসি, ওকে দু'টি কথা দিয়া কৃতার্থ করিয়া বিনয় ও ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। পরিবেশন আরম্ভ হওয়ামাত্র হঠাৎ যেন একটা গুরুতর কথা মনে পড়িয়া গেল।

নন্দ সারাক্ষণ ছায়ার মতো জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল, হল ঘরের এক প্রান্তে জ্যোতির্ময়ের কাছেই সে খাইতে বসিয়াছে। কাছে গিয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'ছি ছি, এঁকে এখানে বসালে কে? ওঁর দিদি শুনলে রাগ করবেন যে! তোমাদের কারও ঘটে এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই ভূষণ—সকলকে কুশাসনে বসিয়েছ, পাতায় খাওয়াচ্ছ বলে এর বেলাও তাই করবে? কার্পেটের আসন নিয়ে এসো একটা, আর রুপোর থালা গেলাস বাটি বার করে দিতে বল।'

পরিবেশন বন্ধ হইয়া রহিল, হলের একদিকে কয়েক হাত জায়গা খালি ছিল, সেইখানে লাল ঘাসের মধ্যে সবুজ বাঘ আঁকা কার্পেটের আসন পাতা হইল, সত্যপ্রিয়র সবিনয় অনুরোধে ভীত সন্ত্রস্ত নন্দ পায়ে পায়ে উঠিয়া গিয়া আসনে বসিল। সামনে ঝকঝকে রূপার থালা দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ থালার তিনগুণ তার আকার।

'তুমি শুধু এঁকে পরিবেশন করবে ভূষণ—আর কারো দিকে তোমার তাকাবার দরকার নেই।'

ঘরের শ'দেড়েক মানুষের কারও মুখে কথা নাই। জ্যোতির্ময়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিহ্বল নন্দ এদিক ওদিক তাকায়, মনে হয় বুঝি কাঁদিয়াই ফেলিবে। কাল সাহেবী পোষাকে যে সত্যপ্রিয়কে আপিসে আসিতে দেখিয়াছিল, আজ বাড়িতে আধা সাধকের বেশে সত্যপ্রিয়কে চেনা তার পক্ষে যেমন কঠিন, আজ দুপুরে আপিসে নন্দকে স্নেহকোমলকণ্ঠে আশীর্বাদ, উপদেশ ও উৎসাহ দিতে যে দেখিয়াছিল, এখন বাড়িতে সেই নন্দকে এই অপরূপ উপায়ে পীড়নের আনন্দে মশগুল সত্যপ্রিয়কে চেনাও তার পক্ষে কম কঠিন নয়। সকলেই বেতন পায় কাজের বদলে, সকলেই দাস। তাই ঘরভরা মানুষ স্তব্ধ হইয়া এখনকার সত্যপ্রিয়কে চিনিবার চেষ্টা করে।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পরিবেশন আরম্ভ কর? আপনারা খান।'

সরিয়া আসিয়া জ্যোতির্ময়কে উদ্দেশ করিয়া সত্যপ্রিয় বলে, 'সত্যি বলছি জ্যোতির্ময়বাবু, ওনার পরিচয় জানতাম না। এই খানিক আগে শুনলাম। তাই ক্রটি হয়ে গেছে, যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে পারি নি।'
জ্যোতির্ময় নীরবে লুচি ভাঙিয়া একটুকরা লুচি আর কিছু বেগুন ভাজা মুখে তোলে। না জানিয়া সত্যই অপরাধ হইয়া গিয়াছে। যার প্ররোচনায় সত্যপ্রিয়র হু'টি মিলে ধর্মঘট হইয়াছিল মাত্র কিছুদিন আগে, তার ভাইকে চাকরিটা দেওয়া উচিত হয় নাই।
সত্যপ্রিয়র সংযম আছে, কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে না – একমাত্র অর্থোপার্জনের বিষয়টি ছাড়া। নন্দর সামনে থালা বাটিতে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য জমিতে থাকে, নন্দ হাত গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। কিন্তু সত্যপ্রিয় আর তার দিকে তাকায় না, আর কিছুই তাকে বলে না। আগের মতো একে একটু হাসি এবং ওকে হু'টি কথা দিয়া বেতনভোগী অতিথিদের আপ্যায়ন করিতে থাকে।
বাড়ি ফিরিবার সময় জ্যোতির্ময় বলে, 'কাল থেকে তুমি আর আপিসে যেও না ভাই। যদি পারি অন্য কোথাও তোমার একটা চাকরি করে দেব।'
নন্দ চুপ করিয়া থাকে। জ্যোতির্ময় একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, 'আমার কোনো দোষ নেই বুঝতে পারছ তো ? এক মাসের মাইনেটা তোমায় পাইয়ে দেব।'
'মাইনে চাইনে।'
বিছানায় শুইয়া নন্দ আর সেদিন প্রতিদিনকার মতো ঘুমানোর আগে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে না, চুপচাপ শুইয়া থাকে। নিজের হাতে মানুষ করা ভাই সম্বন্ধে যশোদার অনুভূতি একটু বেশী রকম তীক্ষ্ণ। অন্ধকার ঘরে নন্দর অভ্যস্ত নড়ন চড়নের সাড়া না পাইয়া সে ঘরের অন্য প্রান্তের বিছানা হইতে জিজ্ঞাসা করে, 'ঘুমোলি নন্দ ?'
'না, ঘুমোই নি।'
নন্দ রাগ করিয়াছে ? কি হইল নন্দর ?—'কি আবার হ'ল তোর ?'
'সকলের সঙ্গে ঝগড়া করবে তুমি আর চাকরি যাবে আমার। সর্বনাশ

করে ছাড়বে তুমি আমার।'

নন্দর উল্টা পাল্টা কথা জোড়া দিয়া ঘটনাটা আগাগোড়া গঠন করিতে যশোদার একটু সময় লাগে। তখন সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলে, 'আর তুই কি করলি? ঘাড় হেঁট করে খেয়ে এলি পেট পুরে? মরণ হয় না তোর নচ্ছার হারামজাদা ছেলে!'

'খেয়েছি নাকি আমি কিছু?'

'খাস নি? কিছু খাস নি? বসেই বা রইলি কেন অমন অপমানের পর? কার্পেটের আসন আর রুপোর থালাবাটি যখন আনতে বলল, গট্‌গট্ করে উঠে চলে আসতে পারলি না তুই? বলে আসতে পারলি না, তোমার মতো লোকের বাড়িতে আমি—'

উঠিয়া আলো জ্বালিয়া: 'যাক গে, মরুক গে। যা করেছিস, বেশ করেছিস। কি খেতে দি' তোকে এখন আমি! লুচি পোলাউ ফেলে এলি, ঘরে যা আছে তা কি তোর মুখে রুচবে? দাঁড়া, আনিয়ে দিচ্ছি।'

রাত তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। সুধীরকে সঙ্গে নিয়া গিয়া সেই রাত্রে যশোদা তার শত্রু ও সখী কুমুদিনীকে ডাকিয়া তুলিয়া তার স্বামীর সাইকেলে সুধীরকে খাবার আনিতে পাঠাইয়া দিল। কুমুদিনীর স্বামীর টিফিন ক্যারিয়ারটিও সঙ্গে দিল।

'যত শীগগীর পার ফিরে আসবে কিন্তু—জোরে জোরে চালিয়ে যাও।'

এক ঘণ্টা পরে সুধীর ফিরিয়া আসিল। যশোদার ফরমাস মতো সব জিনিস সে পায় নাই, তবে অনেক কিছুই আনিয়াছে। লুচি, তরকারী, ডাল, মাংস, ডিম ভাজা, মামলেট, সাতরকম মিষ্টি, দই এবং রাবড়ী। রাগ ও ঝোঁকের মাথায় এত সব খাদ্য যশোদা আনিতে দিয়াছিল বটে, এত রাত্রে নন্দকে সব খাইতে দেওয়ার সাহস তার হইল না।

অর্ধেকের বেশী তুলিয়া রাখিল, বাকিটা ভাগ করিয়া দিল সুধীর আর নন্দকে।

'পেট ভরে নি দিদি।'

'খুব ভরেছে, এবার ওঠ।'

'সন্দেশ দাও আরেকটা।'

'উঁহুঁ, যা খেয়েছ তাতেই তোমার অসুখ হয় কিনা ছাখো, আর সন্দেশ খায় না।' ধনঞ্জয়ের কথা যশোদার মনে পড়িতেছিল। সমস্ত খাবারটাই তাকে নির্ভাবনায় দেওয়া চলিত, অসুখের কথা ভাবিতে হইত না। মানুষটা খাওয়ায় ছিল ভীম, হজমশক্তিতে অগস্ত্য। ভাবিতে ভাবিতে যশোদার মনে পড়ে যে, খাইয়া ধনঞ্জয়ের পেট ভরিত কিনা একথা তো একদিনও সে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাই! এ বাড়ির সকলেই যতক্ষণ ক্ষুধা না মেটে চাহিয়া খায়, এ বিষয়ে যে সঙ্কোচ করিবার কিছু থাকিতে পারে কারও তা মনেও আসে না। কিন্তু ধনঞ্জয়ের মতো যে বেশী খায়, একজনে তিন-চারজনের ভাত, তার হয় তো একটু লজ্জা করিত বার বার চাহিয়া খাইতে। মোটামুটি আন্দাজ করিয়াই অবশ্য যশোদা তাকে সব দিত, তবু পরের পেটের খবর কি আন্দাজে লোকে সঠিক জানিতে পারে?

এতরাত্রে হঠাৎ এত সব ভাল ভাল খাদ্য আনাইবার কারণটা জানিবার জন্য সুধীর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিয়া ভাল রকম জবাব পায় নাই। নন্দ শুইয়া পড়িলে যশোদা যখন ঘরে দরজা দিবার উপক্রম করিতেছে, তাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া চুপি চুপি সুধীর আরেকবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কি বল তো চাঁদের মা? এতরাত্রে খাবার আনালে, নিজে কিছু খেলে না, আমাদের খাইয়ে সব তুলে রাখলে?' যশোদা একটু হাসিয়া বলে, 'মাথাটা হঠাৎ বিগড়ে গেল কিনা—'

সুধীর ভয় পাইয়া বলিল, 'মাথার অসুখ আছে নাকি তোমার?'

'নেই? রাত দুপুরে যারা খালি খালি বাজে কথা সুধোয় একবার ছেড়ে দশবার, তাদের মাথাটা ছেঁচে ফেলতে সাধ যায় সুধীর। ভালয় ভালয় শুয়ে পড়গে যাও।'

শুনিয়া সুধীর ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল। কী অকৃতজ্ঞ যশোদা! এতরাত্রে প্রাণপণে সাইকেল চালাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খাবারগুলি নিয়া আসিল, এত জিজ্ঞাসা করা সত্বেও খাবার আনিবার কারণটা তাকে কিছুতেই খুলিয়া বলিল না। ভাল ভাল জিনিসগুলি পেট পুরিয়া তাকে

অবশ্য খাইতে দিয়াছে যশোদা, তবু—

পরদিন সকালে উঠিয়াই নন্দ ছুটিয়া গেল জ্যোতির্ময়ের বাড়ি।

'আমার এক মাসের মাইনেটা পাইয়ে দেবেন তো ?'

যশোদা নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেবল একজন মানুষ তো আরেকজনকে মানুষ করে না, আরও অনেক কিছু করে। দাবিটা অবশ্য নন্দের অন্যায় নয়, নিজের প্রাপ্য সে দাবি করিতে শিখিয়াছে জানিলে যশোদা খুশিই হইবে, কিন্তু এমন সসঙ্কোচে ভিক্ষা চাওয়ার মতো দাবি করা কেন ? কাল রাত্রেই বেতনের যে টাকা কয়েকটা সে নিবে না বলিয়াছিল, সকাল হইতে সে টাকার উপর এত লোভ কেন, ফস্কাইয়া যাওয়ার এত ভয় কেন ?

৪

বর্ষার পরে একদিন ধনঞ্জয় আসিয়া হাজির।

সেইরকম জামা কাপড়, সেই শতরঞ্জি মোড়া বিছানা আর রঙ-চটা টিনের বাক্স, কেবল আগের বারের চেয়ে ধনঞ্জয় নিজে একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছে মনে হয়। এই শরীরে সামান্য জোয়ার-ভাঁটা ধরাই কঠিন, সুতরাং দেখিয়াই যখন টের পাওয়া যায়, ভাঁটাটা সম্ভবত বেশ একটু জোরালোই হইয়াছে।

যশোদা খুশি হইয়া বলিল, 'তুমি কোথা থেকে গো নবাবসায়েব ? এসো, এসো। বাড়ির আমার মান্যি বাড়ল।'

ধনঞ্জয় একটা পিঁড়িতে বসিয়া বলিল, 'আবার ফিরে এলাম চাঁদের মা।'

'তা বেশ করেছ, ফিরে আসবে বৈ কি। সবাই আসছে, তুমি আসবে না কোন্ দুঃখে ?'

বিকালে একটু অবসর পাইয়া কালো আসিয়া যশোদাকে তার দুঃখের কাহিনী শুনাইতেছিল। জগৎ বড় খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে তার সঙ্গে। আর সহ্য হয় না। কি রকম ব্যবহার ? খাইতে দেয় না ? মারে ? না, সে সব নয়, ভাল করিয়া কথা বলে না, বকে, খোঁটা দেয়,

আরও কত কি করে! নালিশ শুনিতে যশোদার ভাল লাগে না, বিশেষত এই সব অভিমান আর ভাবপ্রবণতার নালিশ। তবু সে মন দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল আর কালোর কাঁদ।কাঁদ মুখ দেখিয়া ভাবিতেছিল এমন নরম মন না হলে আর চাঁপা তোমায় কলতলায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, তুমি চুপ ক'রে থাকো! ধনঞ্জয় আসিবামাত্র কালোর কথা শুনিতে তার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। দুঃখের কথা বলিতে না পাইয়া মনের দুঃখে কালো ঘরে ফিরিয়া গেল।

যশোদা ধনঞ্জয়ের খারাপ চেহারা আর সঙ্কোচ লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু অনর্থক মিষ্টি কথা বলা যশোদার ধাতে নাই।—'কাজ করার মন করে এসেছো তো এবার, না আবার লেজ গুটিয়ে পালাবে?'

'না, কাজ করব। উপায় কি।'

যশোদাও তো এই কথাই বলিয়া আসিয়াছে চিরকাল, কাজ যখন করিতেই হইবে কাজ না করিয়া উপায় কি! দেশের জন্য মন অবশ্য কাঁদে, শহর আর শহরতলি ভাল অবশ্য লাগে না সকলের, কিন্তু এসব মন-কাঁদা আর ভাল লাগা-না-লাগাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষের চলিবে কেন?

'বেশ, থাকো এখানে, কাজ একটা জুটিয়ে দেব'খন।'

এখানে থাকার কথায় ধনঞ্জয়ের সঙ্কোচ বাড়িয়া যায়, সে উসখুস করিতে থাকে। যশোদা চিন্তিতভাবে বলিতে থাকে যে, কোন্ ঘরে ধনঞ্জয়কে থাকিতে দেওয়া যায়? টিনের ঘরে তার জায়গাটা আবার বে-দখল হইয়া গিয়াছে, সুধীর যে ঘরে থাকে সেখানে একজনের জায়গা হইতে পারে বটে, কিন্তু বড়ই ঘেঁষাঘেঁষি হইবে। তার চেয়ে—'পাকা ঘরে জায়গা আছে, সেখানে থাক না তুমি? ভাড়া কিন্তু একটু বেশী।'

ধনঞ্জয় বিপন্নভাবে ডান হাতের তালুটা হাঁটুতে ঘষিতে ঘষিতে বলে, 'আমি বলছিলাম কি, যদ্দিন কাজকম্ম না জোটে আমি বরং অন্য কোথাও—'

'এখানে থাকবে না? বেশী ভাড়া না দিতে চাও—'

'বেশী ভাড়ার জন্যে নয়। মানে, কি জান চাঁদের মা, সঙ্গে এবার—'

আর কিছু বলিতে হয় না, যশোদা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া বলে, 'অ! পয়সা-কড়ি সঙ্গে নেই, ট্যাঁক এবার টিক্ টিক্ করছে।'—

যশোদা হাসে, 'কোথায় থাকবে তবে ? বিনি পয়সায় থাকতে দেবে জানাশোনা আছে কেউ ?'

ধনঞ্জয় ছেলেমানুষের মতো বিব্রত হইয়া পড়ে, গলাটা সাফ করিয়া বলে, 'কাজটা যদ্দিন না হয় একরকম করে—'

যশোদা গম্ভীর মুখে বলে, 'রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেবে আর কলের জল খেয়ে পেট ভরাবে। তাই করোগে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন ? আমি কাজ জুটিয়ে দেব, সে পর্যন্ত আমার অন্ন খেতে মনে বাধবে—এমন যদি মানী দুর্যোধন তুমি, রোজগার করতে বেরিয়েছ কেন ঘর থেকে ? বৌয়ের আঁচল ধরে বসে থাকলেই পারতে ঘরে !'

ধনঞ্জয় হঠাৎ গরম হইয়া বলিল, 'বৌ কোথা যে বৌয়ের খোঁটা দিচ্ছ !'

যশোদা আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'বৌ নেই তোমার ? আরবার যে বললে ছেলেমেয়ে আছে চারটি ?'

ছেলেমেয়ে থাকিলেই যে বৌ থাকিবে তার কি মানে আছে ? বৌ মরিতে জানে না ? কেবল একটি নাকি, দু'টি বৌ মরিয়াছে ধনঞ্জয়ের। চারটি ছেলেমেয়েই তার প্রথম বৌএর, পাঁচ নম্বর সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়া সে বৌ মরিয়া যায় পাঁচ বছর আগে। তারপর ধনঞ্জয় যাকে বিবাহ করিয়াছিল, প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়া সেও মরিয়া গিয়াছে আজ প্রায় দু'বছর। সেই হইতে ধনঞ্জয়ের বৈরাগ্য আসিয়াছে, আর সে বিবাহ করিবে না।

'আমার বৌ বাঁচবে না চাঁদের মা, ছেলেমেয়ে হতে গেলেই মরে যাবে। মোদের গাঁয়ের রাধাচরণ কবরেজ নিজে বলেছে।'

'এক চড়ে মাথাটি ঘুরিয়ে দিতে পার নি তোমাদের গাঁয়ের রাধাচরণ কবরেজের ? কথা শোন একবার !'

দেহ্ বড় হইলে বুদ্ধি নাকি কম হয়। এই হিসাবে ধনঞ্জয়ের এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকাও উচিত নয়। সে যেন তার প্রমাণ দিবার জন্য বলে, 'না না, কথাটা সত্যি। তবে যদি তোমার মতো বড়সড় কাউকে—'

পাকা ঘরে ধনঞ্জয়ের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রে রান্নাঘরে তাকে ডাকিয়া যশোদা তার দেশের গল্প শুনিতেছিল। উনানে মস্ত কড়াই

চাপাইয়া সে তখন তেল গরম করিতেছে, ডাল সম্বরা দিবে। কি বলিতেছে খেয়াল করিয়াই ধনঞ্জয় সভয়ে থামিয়া গিয়াছিল, কে জানে এবার যশোদা রাগের মাথায় কড়াই-এর গরম তেলটাই তার গায়ে ঢালিয়া দিবে কি না! কিন্তু যশোদা রাগিল না, প্রচণ্ড শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'তাই করো তবে এবার, আমাকেই বিয়ে করে ফেলো।' বলিয়া হাসি আর যশোদার থামে না। জগতে যত মানুষ প্রাপ্য হাসি প্রত্যাখ্যান করিয়া হাসে না, তাদের সকলের ভাগের হাসি যশোদা যেন একাই বে-দখল করিয়াছে। হাসির শব্দে সুধীর আসিয়া রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইল, হাসির ধমক কিছুতেই সামলাইতে না পারিয়া কোনোমতে কড়াইটা নামাইয়া রাখিয়া যশোদা পালাইয়া গেল উঠানে।

উঠানে বড় তাড়াতাড়ি যশোদার হাসি থামিয়া গেল। এতটুকু উঠানে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া হাসা যশোদার পক্ষে অসম্ভব। এখানে দাঁড়াইলেই যেন চারিদিকের ঘরগুলি সরিয়া সরিয়া আসিয়া তার হাসি-কান্না চাপা দিবার চেষ্টা করে। ঘরে তো এরকম হয় না? এখানে তবু মাথার উপরে আকাশ আছে, ঘরে শিক বসানো জানালা ছাড়া কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। হয় তো ঘরের পক্ষে খাঁচা হওয়াটাই স্বাভাবিক বলিয়া পীড়ন করে না, উঠান ফাঁকা হওয়া উচিত বলিয়া এখানকার সঙ্কীর্ণতা বাগে পাইলেই যশোদার দম আটকাইয়া দিতে চায়।

'বাপ্‌রে বাপ্‌—কি হাসাতেই পারে লোকটা। দম আটকে মরলাম হাসতে হাসতে!' বলিয়া আর একটুও না হাসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া যশোদা আবার উনানে কড়াইটা চাপাইয়া দেয়। ভাবিতে থাকে যে, কি কুক্ষণে বেশী লোককে থাকতে দেবার জন্যে উঠানে ঘর তুলেছিলাম! ঘর থেকে বেরিয়ে একটু হাঁপ ছাড়বার জায়গা নেই। এই কথা ভাবিয়া মনে মনে আপসোস করিতে করিতে চাঁদের কথা মনে পড়িয়া যশোদার বড় কষ্ট হয়। প্রবল বন্যার মতো যেভাবে হাসি আসিয়াছিল, সেইভাবে পুত্রশোক ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু এমন খাপছাড়া অদ্ভুত সংযম যশোদার যে, হাসি ঠেকাইতে না পারিলেও শোকটা অনায়াসে চাপিয়া রাখিয়া রান্না করিয়া যায়।

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে এত হাসাহাসি সুধীরের ভাল লাগে নাই, এক ফাঁকে সে যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, ওকে যে দালান ঘরে থাকতে দিলে, ভাড়া দিতে পারবে ? মতি কি বলছিল জান, ওর একটি কানাকড়ি সম্বল নেই।'

রেলের ইয়ার্ডে যশোদা সুধীরের একটি চাকরি করিয়া দিয়াছে। কাজটি ভাল, আগের চেয়ে সুধীরের উপার্জন বাড়িয়াছে। সুধীরের গর্ব ও গৌরবের সীমা নাই।

যশোদা বলে, 'তোমার সেকথা ভাববার দরকার ? কাজকর্ম হলেই সম্বল হবে।'

সুধীর সবজান্তার মতো হাসিয়া বলে, 'হচ্ছে ! কাজ করার মতলব ওসব লোকের থাকে ? রোজগার করলেও একটি পয়সা আদায় করতে পারবে ভেবেছো ? যদ্দিন পারে থেকে তোমার ঘাড়টি ভেঙে পালাবে।'

যশোদা বলে, 'পালায় পালাবে, তোমার কি ক্ষেতি হবে শুনি ? তোমরা বড় বাকী রেখেছ আমার ঘাড় ভাঙতে ? কতগুনো টাকা পাব তোমার কাছে একবারটি মনে পড়ে ?'

শুনিয়া অপমানে মুখ কাল করিয়া সুধীর সরিয়া যায়। শত্রু অকথ্য গাল দিলেও সুধীরের এরকম অপমান বোধ হইত না, আপন জনের মতো ভাল পরামর্শ দিতে আসিয়া এরকম আঘাত খাইলে মানুষের সহ্য হয় ? মনে মনে গর্জাইতে গর্জাইতে সুধীর ভাবে কি, এ মাসের বেতনটা একবার হাতে পাইলে হয়, যশোদার একটি পয়সা বাকি রাখিবে না। কিন্তু এক মাসের বেতনে তো কুলাইবে না ! যশোদার কাছে সে যে অনেক টাকা ধারে ! যশোদার পাওনাটা অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার সুখটা অনুভব করিবার আগ্রহে কত মতলবই যে সে মনে মনে ঠাওরাইতে থাকে। মানুষের পাওনা ফাঁকি দিবার মতলব ঠাওরানোই যার চিরদিনের অভ্যাস একেবারে উল্টো ধরনের ভাবনা ভাবিবার সময় তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে এমন একটা আশ্চর্য দুঃখের ছাপ পড়ে যে, দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়, মনে হয় এইমাত্র লোকটার কোনো আপনজন মরিয়া গেল নাকি ?

মানুষকে কাজ জুটাইয়া দিতে যশোদা বড় ওস্তাদ। অনেক বছর ধরিয়া ধীরে ধীরে আপনা হইতে অনেকগুলি ছোট বড় কলকারখানার সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, অনেক কারখানার ম্যানেজার হইতে সর্দার কুলি পর্যন্ত তাকে চেনে—চোখে না দেখিলেও নাম শুনিয়াছে। অনেক শ্রমিকের সঙ্গে যশোদার মুখোমুখি পরিচয় আছে, অনেকে তাকে কেবল দু'একবার চোখে দেখিয়াছে, অনেকে সহকর্মীদের মুখে তার নাম শুনিয়াছে। কার কাজ নাই, কার কাজ চাই, কে কাজের লোক, কে অকেজো, কোথায় কোন কারখানায় কি ধরনের লোক নেওয়া হইতেছে বা হইবে, এসব খবর ঘরে বসিয়াই এত বেশী পাওয়া যায় যে খাতাপত্রের সাহায্য ছাড়া মনে রাখা অসম্ভব। কিন্তু ওসব হিসাব রাখার বালাই যশোদার নাই, সেটা তার পেশাও নয়। কোনো আদর্শ, উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করে নাই, শ্রমিক-জগতে আপনা হইতে তার একটা স্থান জুটিয়া গিয়াছে, প্রথমে খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল এখন পরিসর বাড়িয়াছে।

কিন্তু নিজের স্থানটির সীমা যশোদা কখনও অতিক্রম করে না, চেষ্টা করিয়া পরিসর বাড়াইবার চেষ্টাও করে না। যাদের সঙ্গে তার সংযোগ আছে, সোজাসুজি পরিচিত না হোক অন্তত পরিচিত কারও মধ্যস্থতায় যাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ একটা স্থাপিত হইয়াছে অথবা হয়, কেবল তাদের সম্বন্ধে যেসব খবর কানে আসে সেইগুলিই সে বাছিয়া বাছিয়া মনে রাখে। চেষ্টা করিয়া সে মনে রাখে তা নয়, মনে থাকিয়া যায়। হয়তো কানে আসিল ভারতলক্ষ্মী মিলের লুমে কাজ করিবার জন্য কয়েকজন লোক চাই; সঙ্গে সঙ্গে যশোদার মনে পড়িয়া গেল ভারতলক্ষ্মী মিলের সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও লোকটি তাকে বড় বিশ্বাস করে, আজ পর্যন্ত যত লোককে সে পাঠাইয়াছে প্রত্যেককে ওখানে দেওয়া হইয়াছে; সেই সঙ্গে যশোদার আরো মনে পড়িয়া গেল লুমে কাজ করিয়াছে এমন সাতজন বেকারকে সে জানে তাদের দু'জন একেবারে অপদার্থ, দু'জন সুবিধা-জনক নয়, তিনজন ভাল। একটুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া পেন্সিল দিয়া

যশোদা তখন আঁকা-বাঁকা অক্ষরে সাতজনের নাম লেখে, তিনজনের নামের পর লেখে good, দু'জনের নামের পরে লেখে not good, আর দু'জনের নামের পর লেখে bad ; লিখিয়া not good ও bad চারজনকে একটু সুযোগ দিবার অনুরোধ করিতে গিয়া যশোদার ইংরাজী জ্ঞানে কুলায় না, চোখ কান বুজিয়া বাংলাতেই অনুরোধটা জানায়, তারপর নিজের নাম স্বাক্ষর করে। অনুরোধটা কাকে করিতেছে, কি জন্য করিতেছে, সাতটি নাম ও নামের পাশের মন্তব্যের অর্থ কি এ সব কিছুই কাগজের টুকরাটি পড়িয়া বুঝিবার উপায় থাকে না, কিন্তু ভারতলক্ষ্মী মিলেরই একজন শ্রমিকের সঙ্গে সাতজন কর্মপ্রার্থীকে মিলে পাঠাইয়া দিলে সেখানকার গুজরাটি সহকারী ম্যানেজার জলের মতো সমস্ত পরিষ্কার বুঝিয়া ফেলে। কাগজের টুকরাটি যত্ন করিয়া রাখিয়া সাতজনকেই হয় তো কাজে লাগাইয়া দেয়, হয় তো পাঁচজনকে কাজে লাগাইয়া বাকি দু'জনকে ফিরাইয়া দেয়।

যশোদার মতে যারা bad কাজ না পাইলে অথবা কাজ পাইয়া কিছুদিন পরে বরখাস্ত হইলে তারা যশোদার কাছে নালিশ জানাইতে আসে। যশোদা বলে, 'আমি কি করব ? কাজ জানো না, তার ওপর কাজে ফাঁকি দেবে, কে রাখবে তোমাদের ? তার চেয়ে এক কাজ কর না তোমরা, অন্য কাজে লেগে যাও। অন্য কাজে হয় তো তোমাদের মন বসবে।'

তারা রাজী হয় না, কিছুতেই রাজী হয় না, রাগ করিয়া যশোদাকে প্রথমে কড়া কড়া কথা বলিয়া গাল দিবার উপক্রম করিয়াই যশোদার মুখ দেখিয়া থামিয়া যায়। তারপর একমাস কাটে, দুমাস কাটে। মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া একদিন তারা আবার আসিয়া দাঁড়ায় যশোদার কাছে। কিছুদিন পরে হয় তো তাদের একজনকে দেখা যায় একটি আপিসের বারান্দায় বুকের কাছে লাল হরফে আপিসের নামের সঙ্কেত লেখা লম্বা কোট গায়ে চাপাইয়া কলিংবেলের টুং টুং আওয়াজের প্রতীক্ষায় টুলে বসিয়া ঢুলিতেছে, আরেকজনকে দেখা যায় পাড়ারই ডায়মণ্ড র‍্যাস্টুরেণ্টে (ডবল ডিমের মামলেট মাত্র ১৫ পয়সা) পাড়ার চা-প্রিয় ছেলে-বুড়োকে চা সরবরাহ করিতেছে। মুখের উপর হইতে

একটা পর্দা যেন সরিয়া গিয়াছে দু'জনেরই, জীবন-যাপনে দু'জনেই বেশ মশগুল।

যশোদা কি করিয়া টের পায় ভগবান জানেন, বোধ হয় অনেকদিন এদের সঙ্গে এদেরই একজন হইয়া বাস করিতেছে বলিয়া, কয়েক জন অলস ও অকর্মণ্যকে কেবল জীবিকা অর্জনের ভিন্ন পথ ধরাইয়া সে কাজের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। তার সখী কুমুদিনীর বাড়ির ঠিক পাশে ন'কড়ি ছিল কুঁড়ে, একমাসের বেশী ন'কড়ি কোথাও চাকরিতে টিকিয়া থাকিতে পারিত না, তার ছেলেমেয়ে বৌ-এর সে কি দুর্দশা! একবার যশোদার একখানা শাড়ি মাঝামাঝি ভাগ করিয়া ন'কড়ির বৌ আর মেয়ে তিনদিন ঘরের মধ্যে আটক থাকিবার পর বাহিরে আসিতে পারিয়াছিল। তারপর যশোদা ন'কড়ির তাড়িখানায় চাকরি করিয়া দিয়াছে, এবং জীবন-যুদ্ধে এই চাকরির কর্মটা ন'কড়ির গায়ে যেন আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে, কোনোদিন খসিয়া পড়িবে না। আর সম্প্রতি ন'কড়ির বৌ একখানা নতুন ডুরে শাড়ি পরিয়া সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইয়াছে, যশোদাকে পর্যন্ত!

ধনঞ্জয়ের জন্য কাজ যোগাড় করতে গিয়া যশোদা কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। একেবারে আনাড়ী মানুষটা, কোনো কাজ জানে না, কাজ শিখিবার বয়সও চলিয়া গিয়াছে। গায়ে জোর আছে, মাথায় মোট বহা আর ঠেলাগাড়ি ঠেলার মতো যেসব কাজ শুধু গায়ে জোর থাকিলেই মোটামুটি করা যায়, সেসব কাজও লোকটা করিবে না—অপমান হইবে। সহ্যও বোধ হয় হইবে না, প্রকাণ্ড একটা দেহ থাকিলেই তো কষ্ট সহ্য করার শক্তি জন্মায় না। চাষবাসের কাজ জানে, কিন্তু এখানে চাষবাসের কাজ যশোদা কোথায় পাইবে!

'নিজের হাতে চাষ করতে তো? না অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে ফপরদালালি করতে?'

'নিজে কিছু করতাম বৈ কি।'

'কিছু কিছু করতে!'

সেটা যশোদা আগেই টের পাইয়াছিল, মানুষটা একটু আরামপ্রিয়

অর্থাৎ সহজ ভাষায় কুঁড়ে। আরামপ্রিয় মানুষ না হইলে রাগ অভিমান এমন প্রবল হয়, কথায় কথায় বোধহয় অপমান! নিখুঁত সৃষ্টি ভগবানের কুষ্ঠিতে নেই ভাবিয়া যশোদার বড় আপ্‌সোস হয়। কি অপরূপ একটা শরীর! ধরাবাঁধা কাজে অলস কিন্তু বাজে কাজে পরিশ্রম করিতে খুব পটু, পনের মাইল হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসে, না বলিতেই বালতি বালতি জল তুলিয়া ছাতে বর্ষার শ্যাওলা সাফ করিয়া দেয়—রাত্রে চিত হইয়া শুইয়া শরৎকালের আকাশ দেখিবে! দেহের গড়নটা তাই তার বিকৃত হয় নাই, কেবল ভাল করিয়া খাইতে না পাওয়ার জন্যই বোধ হয় একটু—ধনঞ্জয়ের সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া যশোদা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করে ভাল করিয়া খাইতে না পাওয়ার জন্য কত-টুকু ক্ষতি তার দেহের হইয়াছে, খাওয়া পাইলে আরও কতখানি পরিপুষ্ট দেখাইত তাকে।

কিন্তু কাজ? উপার্জনের ব্যবস্থা? বসাইয়া বসাইয়া লোকটাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইলেই তো চলিবে না, যতই ভাল লাগুক ওর খাওয়া দেখিতে! অনেক ভাবিয়া যশোদা একদিন বলিল, 'এক কাজ কর তুমি সুধীরের সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে যাও, চাদ্দিক ঘুরে ফিরে কাজকম্মো দেখো গিয়ে, তারপর ওখানেই সুবিধামতো একটা কাজ তোমাকে জুটিয়ে দেব।'

'কাজ হবে কিনা না জেনে—'

যশোদা জোর দিয়া বলিল, 'হবে। নইলে মিছিমিছি তোমায় পাঠাব, মাথা খারাপ নাকি আমার? কাজ তুমি করতে পারবে কিনা সে হল ভিন্ন কথা।'

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যশোদা এইসব আলোচনা করে আর সুধীর এদিক হইতে ওদিক যাওয়ার সময় আর ওদিক হইতে আসার সময় তীব্র দৃষ্টিতে দু'জনকে দেখিয়া যায়। গা জ্বালা করে সুধীরের। না খাইয়া কাজে গেলে ক্ষুধায় সে কষ্ট পাইবে বলিয়া এই যশোদাই কি একদিন তাকে খাওয়ার সুযোগ দিতে ছল করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল? তার জন্য নিশ্চয় নয়, বুড়া মতির জন্য। বুড়ো মানুষকে যশোদা কষ্ট

দিতে চায় নাই। তা ছাড়া, দু'বেলা খাইতে দেওয়ার জন্য যশোদা টাকা নেয়, জোর জবরদস্তি করিয়া খাওয়া বন্ধ করিবার তার কি অধিকার আছে, তাতে গোলমাল হইতে পারে। এই সব ভাবিয়াই হয়তো যশোদা সেদিন ওরকম বুদ্ধি আঁটিয়া তাদের খাওয়ার সুযোগ দিয়াছিল, নিজেরও মান বাঁচাইয়া ছিল। চালাক তো কম নয় যশোদা। অসুখের সময় সেবা করা? জরিমানার টাকা দেওয়া? এ সমস্তের চমৎকার ব্যাখ্যা সুধীর এখন আবিষ্কার করিতে থাকে। কি আর এমন সেবাটা যশোদা তার করিয়াছিল, ওরকম সে তো অসুখ-বিসুখের সময় সকলেই করে। যাদের কাছে থাকা আর খাওয়ার জন্য টাকা নেয় দুবেলা রাঁধিয়া তাদের খাওয়ানোর মতো অসুখের সময় সেবা করাটাও তো যশোদার সাধারণ কর্তব্য।

জরিমানার টাকাটা যশোদা দিয়াছিল, নিছক তাকে হাতে রাখিবার জন্য। সে কাজের লোক, তার মতো কাজের লোক আর কটা আছে? সে হাতে থাকিলে ধীরে ধীরে জরিমানার টাকাটাও আদায় হইয়া যাইবে, অন্যদিকেও অনেক সুবিধা হইবে, এই সব হিসাব করিয়াই যশোদা তার সেই উপকারটা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। রেলের ইয়ার্ডে তাকে কাজটা জুটাইয়া দিয়া মাঝখান হইতে যশোদা কিছু টাকা মারিয়াছে কিনা তাই বা কে জানে!

সুধীর চিরকাল জানিয়া আসিয়াছে মানুষের চালচলনই এই রকম, এই ধরনের ব্যবহারই মানুষ মানুষের সঙ্গে করিয়া থাকে, অন্য সময় অন্য কারও সঙ্গে হইলে রাগ করার কিছু আছে বলিয়া সে ভাবিতে পারিত না। এখন যশোদার সম্বন্ধে একটির পর একটি পরিবর্তনশীল মানসিক ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া তার যেন ধাঁধা লাগিয়া যাইতে থাকে। অভিনব প্রত্যাশা ও প্রার্থনার মন্দিরে গোঁয়ার-গোবিন্দরা চিরদিন হরিজনের মতো ভীরু, সঙ্কোচ আর অস্বস্তিতে মৃতপ্রায়—যতদিন না ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া মনের সুখে মন্দিরটাই ভাঙিয়া চুরমার করিবার সুযোগ পায়।

কাজে যাওয়ার সময় ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়া গিয়া চারিদিক দেখাইয়া শুনাইয়া দিবার প্রস্তাবে সে চোখে অন্ধকার দেখে।—'আমার কাজটি

ওকে দেবার মতলব করছ বুঝি ?'

'তোমার কাজটি ছাড়া জগতে আর কাজ নেই ?'

শরৎকাল আসিবার পর অন্যান্য বছরের মতো এবারও চারিদিকে সকলের মধ্যে যশোদা একটা বিস্ময়কর মানসিক উদ্বেগ লক্ষ্য করে। চাঁপা ও কালোর বিবাদ চরমে উঠিয়াছে, ঠেলাঠেলি ও গালাগালির বদলে চাঁপা এখন নিজে কালোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে আর একদিকে জগৎকে দিয়া তাকে পীড়ন করায় অন্যদিকে সকলের কাছে তার নামে অকথ্য কুৎসা রটায়। জগৎকে হারানোর ভয়ে ব্যাকুল হইবার কোনো কারণ ঘটে নাই, জগৎ নিজেও বরং বিবাহের দিনটি আগাইয়া আনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, তবু চাঁপার দুর্ভাবনার যেন সীমা নাই। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অকারণে তার মুখে এমন একটা হতাশার ছাপ দেখা যায় যে, কালোর সম্বন্ধে তার বাড়াবাড়িটা একটু কমানোর জন্য তাকে ধমক দিবে ভাবিয়াও যশোদা ধমক দিতে পারে না।

পরেশকে একদিন পুলিস ধরিয়া নিয়া যায়।

এতকালের মধ্যে এই দ্বিতীয় বার চুরির জন্য যশোদার ভাড়াটে পুলিসের হাতে পড়িল। যশোদার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া যায়। পরেশকে চলিয়া যাইতে বলাই উচিত ছিল। আগে কোনোদিন চুরি করে নাই বা ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে করিবে না, কিন্তু চুরি করা যে কোনোদিন এদের কারও পেশা ছিল না, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া গোপন অভিযানে বাহির হইবার ত্রাস ও উত্তেজনার স্বাদ যে এরা কেউ পায় নাই, যশোদা তা জানে। পরেশের মতো সে সব মানুষের জাতই আলাদা, তাদের চিনিতেও যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না। তবু জানিয়া বুঝিয়াও পরেশের সম্বন্ধে কেন যে মনের দুর্বলতা আসিয়াছিল !

পরেশের বৌকে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'এবার তুমি কি করবে ?'

পরেশের বৌ বলিল, 'কালীঘাটে আমার বাপের বাড়ি, আমায় যদি কালীঘাটে দিয়ে এসো যশোদাদিদি !'

কালীঘাটে তার বাবার বাড়ির ঠিকানা পরেশের বৌ জানে না, কিন্তু

মন্দিরের কাছে গেলে সেখান হইতে চিনিয়া যাইতে পারিবে। নন্দর সঙ্গে তাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে বলায় পরেশের বৌ আপত্তি করিল, মিনতি করিয়া বলিল, 'না দিদি, পুরুষের সঙ্গে যাব না।'

'নন্দ তো ছেলেমানুষ, খোকার মা?'

হোক ছেলেমানুষ, পুরুষমানুষ তো, নন্দর সঙ্গে তাকে যাইতে দেখিলেই তার বাবা সন্দেহ করিবে, পাড়া-প্রতিবেশী সন্দেহ করিবে।

'তুমি আমায় দিয়ে এসো দিদি, পায়ে পড়ি তোমার।'

ধনঞ্জয়কে সঙ্গে করিয়া যশোদা পরেশের বৌকে পরদিন সকালবেলা তার বাপের বাড়ি পৌঁছিয়া দিল। তারপর গেল মন্দিরে। এককালে এ অঞ্চলও নাকি শহরতলি ছিল। কবে? যখন এখানে সবে শহরের পত্তন হইয়াছিল, তখন?

ধনঞ্জয় মস্ত বিদ্বান, স্কুলে ইতিহাস পড়িয়া যত বড় শরীর প্রায় তত বড় ঐতিহাসিকে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'কলকাতা শহর যখন পত্তন হয়, সেই ইংরেজ আমলে, এটা তখন গাঁ ছিল।'

'সেই ইংরেজ আমল মানে? এটা কোন্ আমল?'

'ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে গো। ঐ যে ভবানীপুর না, যেখানটা এখন আসল শহর, ঐখানটাও আগে শহরতলি ছিল, শ্যাল ডাকত দিন-দুপুরে।'

'দ্যূৎ!'

'দ্যূৎ? কেন, দ্যূৎ কেন? তিনটে গাঁ নিয়ে হল কলকাতা শহর, তা হলে একদিন ভবানীপুর কেন চৌরঙ্গীতেও তো শ্যাল ডাকতেপারত অনায়াসে, ওখানটা যখন গাঁ ছিল?'

কথাটা বিবেচনা করিয়া যশোদা বলিল, 'সে হিসাবে সব জাগাই তো এককালে গাঁ ছিল।'

ধনঞ্জয় করুণার হাসি হাসিয়া বলিল, 'সে কেন হবে? কলকাতা হল বাংলার রাজধানী, ভারতবর্ষের রাজধানী হল দিল্লী। কলকাতার যখন চিহ্নও ছিল না তখনও দিল্লী শহর ছিল। এটা শহর নাকি? এটা হল— এটা হল নরক। বাঙালীরা খুব বজ্জাত কিনা তাই ইংরেজরা তাদের

জন্যে এই নরক বানিয়েছে, কলকাতা শহর আছে বলেই তো বাঙালীর এই দুর্দশা। ছেলেগুলো একবার কলকাতা আসে আর বিগড়ে যায়, আমাদের গাঁয়ে কত ছেলে অমন গেছে। একটা বছর কলকাতা থাক, বাস্ আর গাঁয়ে গিয়ে বাস করতে পারবে না। কলকাতার মতো পাজী জায়গা আছে। পেটভরে মানুষ খেতে পর্যন্ত পায় না বাছা তোমাদের কলকাতায়, এঁ্যা!'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'কেন, পেটভরে খেতে দিই না তোমাকে?'

ধনঞ্জয় লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আমার কথা বলছি নাকি? যেমন ধর ওই খাবারের দোকানটা, চার আনার খাবার কেনো, একবারটি মুখে দিতে কুলোবে না।'

'ভারি খাইয়ে তুমি তাই বলছ। একসের রসগোল্লা খেলে ঢেকুর তুলবে।'

যশোদা আর একটু খোঁচাইতেই ধনঞ্জয় রাগ করিয়া তার খাওয়ার শক্তির পরিচয় দিতে স্বীকার হইয়া গেল। পাঁচ টাকার একটা নোট সঙ্গে করিয়া যশোদা বাহির হইয়াছিল, নতুবা সে এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ধনঞ্জয়কে ক্ষেপাইয়া তুলিত কিনা সন্দেহ। নিজেরও যশোদার ক্ষুধা পাইয়াছিল বৈ কি, ভাল খাবার খাইতে তার নিজেরও তলে তলে বেশ একটু লোভ ছিল বৈ কি। যশোদা ভাত খায় তার সব চেয়ে জোয়ান ভাড়াটের তিনগুণ, সেই জন্যই সে মাঝে মাঝে রীতিমতো সঙ্কোচ বোধ করে, প্রাণ ভরিয়া ভাল খাবার খাওয়ার সাধটা তার সাধারণত চাপাই থাকে। আজ ধনঞ্জয়ের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে পেট ভরিয়া খাবার খাইল— ধনঞ্জয়ের খাওয়ার পরিমাণটা তার চেয়েও বেশী, এই জন্য ধনঞ্জয়ের কাছে বসিয়া খাইতে তার লজ্জা করে না।

দু'জনকে একত্র দেখিলেই লোকের একটু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকার কথা, দোকানী সবিস্ময়ে দু'জনের খাওয়া দেখিতে লাগিল। তারপর হাসিয়া ফেলিল।

চোখে পড়ায় ধনঞ্জয় রাগিয়া বলিল, 'হাসি কি জন্যে শুনি?'

যশোদা বলিল, 'আমাদের খাওয়া দেখে হাসছে আর কি।'

দোকানীর হাসি নিভিয়া গিয়াছিল, হাত জোড় করিয়া সে তাড়াতাড়ি

বলিল, 'আজ্ঞে না গিন্নিমা, খাওয়া দেখে কি হাসতে পারি! আপনারা খাবেন আজ্ঞে, তবে তো আমাদের দুটো পয়সা! আপনাদের দেখে বড় আনন্দ হল কিনা মনে, তাই হাসলাম একটু মনের সুখে। আমার একটি দিদি আছে গিন্নিমা, আমার পিসতুতো দিদি, তেনাও আপনারি মতো আজ্ঞা।'

যশোদা বলিল, 'বটে নাকি?'

দোকানী বলিল, 'আজ্ঞা। তবে তেনার বয়েসটা কিছু বেশী হবে, চুলে পাক ধরে গেছে। আমরা যাই, তা তামাশা করে বলেন কি যে গুরুজন আমি, আমায় পেন্নাম কর রসিক। যেই পেন্নাম করতে মাটিতে মাথা ঠেকাই, মাথার পরে পা'টি তুলে দেয়। বাস্ সব নড়নচড়ন বন্ধ। পা'টি না সরালে আর মাথাটি সরাবার যো নেই।'

বেশ বুঝা যায় শেষটুকু বাড়ানো ও বানানো গল্প। যত শক্তিমতী পিসতুতো বোনই মাথায় পা রাখুক, মাথা নাড়ানো চলিবে না এত জোরে পায়ের চাপ দিয়া তামাশা করার শক্তি তার থাকিতে পারে না, কারণ মাথায় ওরকম চাপ পড়িলে ডাক্তার ডাকিবার দরকার হয়। রসিক কেবল রসালো খাবারের দোকান করে নাই, মানুষটাও সে রসিক বটে। যশোদার শুনিতে বেশ মজা লাগিতেছিল।

রসিক বলিল, 'কিন্তু হায় অদেষ্ট! বোনাইটি আমার এই এইটুকুন মনুষ্যি —একটা বাচ্চা ছোকরার সমান। মা কালী আপনাদের কেমন সুন্দর মিল করেছেন দেখে তার কথাটা মনে পড়ল কি না, তাই হাসছিলাম গিন্নিমা।'

অনেক বেলা হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে বসিবার আর সময় ছিল না, তবু দু'জনে একটু বসিল। খাওয়াটা বড় বেশী হইয়াছে। অনেক নারী পুরুষ ঘাটে স্নান করিতেছে, লজ্জাটা নারী ও পুরুষ উভয়েরই কম, মানুষের যতটা দরকার প্রায় ততটুকু—দেখিলে কে বলিবে তারা শহর বা শহর-তলির অধিবাসী, স্নানের সময় অন্তত স্বাভাবিকতার পবিত্রতাটুকু পাওয়ার জন্যই যেন তারা বাড়তি সভ্যতা ত্যাগ করিয়াছে।

'আমি সত্যি হাতির মতো দেখতে, না?'

'কই না, তুমি তো মোটা নও।'

'হাতি কি আর মোটা, হাতির চেহারাই হাতির মতো। কোত্থেকে যে হলাম এমন! আমার বাপ-মা তো এমন ছিল না, আমার ভাইটা তো এমন নয়, বোন আছে একটা সে রীতিমতো সুন্দরী—হ্যাঁ, মাইরি বলছি তোমায়। বিশ্বাস হল না?'

ধনঞ্জয় কি একবার যশোদাকে বলিতে গেল, তুমিও রীতিমতো সুন্দরী? কথাটা কেমন শোনাইত কে জানে, জীবনে প্রথম একজন মানুষের কাছে কথাটা শুনিতে যশোদার কেমন লাগিত তাই বা কে জানে! কিন্তু ধনঞ্জয় কথাটা জলো করিয়া ফেলিল এইভাবে যে, 'তুমিও তো খুব বেশী খারাপ নও।'

'খুব বেশী না হই—খারাপ তো?'

'কে বললে খারাপ?'

যশোদা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তিনটি যুবতী তৈরি করা চলিত এতগুলি হাড়-মাংসের পুতুলের মতো। একটু বুঝি বিশ্বাস তার হয় কথাটাতে, বড় সাধ কিনা বিশ্বাস করার। দেখিতে সে খারাপ নয় একথা বিশ্বাস করিবার সাধ ছিল না কি যশোদার? হয়তো ছিল, এতদিন খেয়াল করিয়াও খেয়াল করে নাই, খেয়াল করিতে সাহস পায় নাই। ধনঞ্জয় তাকে স্পষ্ট সুন্দরী বলিলে সে বোধহয় এই খেয়ালখুশীর রসালো ফাঁদে পড়িত না, শুনিতে ভাল লাগা আলাদা কথা, সে মিঠা কথায় কাবু হওয়ার মানুষ যশোদা নয়, কিন্তু ধনঞ্জয় যেভাবে যা বলিয়াছে, সে কথাটা তো সত্য হওয়া আশ্চর্য নয়। তবু উঠিবার আগে ছড়া কাটিয়া রসিকতা করিতে যশোদা ছাড়িল না—

'ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুশী ভারী,
ছদ্মবেশী ভীমকে পেয়ে কীচক খুশী নারী।'

ধনঞ্জয় রসিকতা না বুঝিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, 'আহা, কীচক তো ভীমকে আর দেখতে পায় নি চোখে, ভেবেছিল দ্রৌপদী বুঝি। আমি তো তোমায় চোখে দেখে বলছি, দেখতে তুমি খারাপ নও।'

যশোদা হাসিয়া বলিল, 'আ মর! এ দেখি কচি খোকার মতো অভিমান

করে। তুমি কি বাবু কীচক, না আমি ছৈরিন্ধ্রী, যে গায়ে লাগল ?—নাও ইবারে বাড়ি চল, যা রোদটা উঠেছে।'

এদিকে পাড়ার দু'জন স্ত্রীলোকের উপর রান্নার ভার দিয়া ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যশোদাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সুধীর চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকে। কেন গেল যশোদা, কি দরকার ছিল যশোদার যাওয়ার ? যদি বা গেল, নন্দ থাকিতে ধনঞ্জয়ের সঙ্গেই বা গেল কেন ? সুধীরকে তো সে বলিতে পারিত, আমার সঙ্গে চলো সুধীর। একদিন না হয় সুধীর কাজে যাইত না।

নন্দ কীর্তন শিখিতে যাইতেছিল, তার কাছে সুধীর পরেশের বৌ-এর বিবরণ এবং যশোদার কালীঘাট যাওয়ার প্রয়োজন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানিয়া একটু যেন শান্ত হইল মনটা। যশোদা বাধ্য হইয়া গিয়াছে। হয়তো সুধীরের কাজে যাওয়া হইবে না ভাবিয়াই বেকার ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়া গিয়াছে। তবু, সব কথা একবার তো সে বলিতে পারিত যে, এই দরকারে আমি এখানে যাচ্ছি সুধীর, তোমার কাজ কামাই হবে তাই ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে গেলাম !…এ ভাবে তাকে জানাইয়া যাওয়ার অর্থই যে তার অনুমতি নিয়া যশোদার কালীঘাটে যাওয়া এবং তার অনুমতি নিয়া যশোদার কোনো কাজ করার সঙ্গত বা অসঙ্গত কোনো কারণই থাকিতে পারে না, এসব সুধীরের মাথায় আসে না। অত সব ভাবিবার জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা তো তার নাই। সে রাগ করিতে জানে, তাই সোজাসুজি যশোদার উপর রাগ করে।

তারপর সে ইয়ার্ডে যায় কাজ করিতে।

ওয়াগনে কুলিরা মাল বোঝাই দেয়, সুধীর সর্দারি করে। মাল তুলিতে একটু সাহায্য করে, কুলিদের তাড়া দেয়, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিড়ি টানে, হঠাৎ ওয়াগনের ভিতরে ঢুকিয়া একটা মাল এদিকে একটা মাল ওদিকে কয়েক ইঞ্চি সরাইয়া দেয়, থাকিয়া থাকিয়া বস্তাগুলি গোণে আর রাজেনকে জিজ্ঞাসা করে, 'কটা বস্তা যাবে বললেন আজ্ঞে এটাতে ?'

রাজেন যশোদার সখী কুমুদিনীর স্বামী, রাজেনকে বলিয়াই যশোদা

এখানে সুধীরের কাজ জুটাইয়া দিয়াছে। কুমুদিনী জানিলে অবশ্য যশোদার লোককে কাজ দেওয়ার সাহস রাজেনের হইত না, কিন্তু কুমুদিনী জানে না। যশোদাকে রাজেন পছন্দ করে, ভয় আর খাতিরও করে—সেটা কুমুদিনীর অজ্ঞাতই আছে। আড়ালে যাই বলুক দেখা হইলে কুমুদিনী সখীর মতো আলাপ করে যশোদার সঙ্গে, তখন তার কথা শুনিয়া আর মুখের ভাব দেখিয়া কে অনুমান করিবে যশোদাকে সে দু'চোখে দেখিতে পারে না, যশোদার নাম শুনিলেই তার মোটা শরীরের ঢিলা চামড়ায় জ্বালা ধরিয়া যায়! যশোদার কাছে কোনো উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা ঘটিলে নির্বিবাদে সেটা আদর করিয়া নিতেও কুমুদিনীকে কোনো দিন কুণ্ঠিত দেখা যায় নাই। উপকার পাওয়ার পরেই যশোদার নিন্দায় কুমুদিনী মুখর হইয়া উঠিলে রাজেন প্রায় নির্বিকার-ভাবেই স্ত্রীর কথাগুলি শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে সায় দিয়া বিস্ময় ও বিরাগের দু'একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হয়তো করে। কাঁচা-পাকা চুলে ঢাকা মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলে, 'ছি ছি, ওকে আর বাড়িতে ঢুকতে দিও না!'

তারপর কাজে যাওয়ার সময় হয়তো যশোদার বাড়িতে একবার উঁকি দিয়া যায়, জীর্ণ-শীর্ণ মুখের চামড়া কৌতুকের হাসিতে কুঁচকাইয়া কুমুদিনীর নিন্দাগুলি সব যশোদাকে শোনায়, বলে, 'শুনলে যশোদা, কি সব বলে তোমার নামে?'

যশোদা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলে, 'বলুকগে যাক্, মরুকগে যাক্, আজ তো নতুন নয়। ছেলেবেলা থেকে এমনি করে বলছে আমার নামে। তবে কি জান সরকার মশায়, আমার জন্যে ওর সত্যি মায়া আছে। এমনি বলে মুখে, কিন্তু—'

বাড়িতে যতই নিরীহ হইয়া থাক, যশোদার কাছে যতই কৌতুকের হাসি হাসুক, মেজাজ কিন্তু রাজেনের একেবারেই ঠাণ্ডা নয়। সুধীর কয়েকবার বোকার মতো প্রশ্ন করিলেই তার মেজাজ গরম হইয়া যায়।

'মনে থাকে না তোর নচ্ছার? ক'বার বলব?'

নাকের মাঝখানে আঁটা চশমার ভিতর দিয়া রাজেন হাতের খাতাটির

বাদামী রঙের পাতায় চোখ বুলাইয়া বলে, 'তেইশটা।'

'জায়গা থাক্‌বে।'

'থাকবে তো তোর কি? তোর বাবার ওয়াগন?' নির্দোষ মন্তব্যের জবাবটা একটু কড়া হইয়া গিয়াছে ভাবিয়াই হয়তো রাজেন একটু মৃদু গলায় বলে, 'ছেচল্লিশটা বস্তা দুটো ওয়াগনে যাবে, তেইশ ভাগ হবে না-রে পাঁঠা কোথাকার!'

'অ!' সুধীর তাড়াতাড়ি আর একবার ওয়াগনের ভিতরে গিয়া বস্তাগুলি গুনিয়া ফেলে। আরও কয়েকটি ওয়াগনে একই সময়ে মাল বোঝাই হইতেছিল। চটে মোড়া, কাঠের বাক্সে প্যাক করা, চৌকো গোল ছোট বড় কত মাল এখানে আসিয়া জমা হইয়াছে, কাছে ও দূরে কত বিভিন্ন তাদের গন্তব্য স্থান। প্রতিদিন রাশি রাশি মাল বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু শহরের মালের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত। কথাটা ভাবিতে গেলে মাঝে মাঝে বিব্রত হইয়া সুধীরকে মাথা চুলকাইতে হয়, ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মাল যে কেবল এখান হইতে বাহিরে চলিয়া যায় তা অবশ্য নয়, ধুঁকিতে ধুঁকিতে ইঞ্জিন যে লম্বা ওয়াগনের সারি বাহির হইতে টানিয়া আনে সেগুলিও মালে বোঝাই থাকে, কিন্তু যে মাল বাহিরে যায় তার সঙ্গে এইসব মালের তফাতটা অনায়াসেই সুধীর বুঝিতে পারে। একই বস্তা হয়তো ফিরিয়া আসে, ওয়াগনে তুলিবার সময় যে প্যাকিং কেসটির উপর সে পানের পিক্ ফেলিয়াছিল, কয়েক মাস পরে সেই প্যাকিং কেসটিই অন্য এক ওয়াগন হইতে নামানো হয়, কিন্তু তবু সুধীর জানিতে পারে ভিতরের মাল বদলাইয়া গিয়াছে। কারণ সুধীর এইভাবে মনের মধ্যে যুক্তি খাড়া করে—যে জিনিস এখান হইতে দুশো তিনশো মাইল দূরে চালান গিয়াছিল সেই জিনিস কিছুকাল পরে আবার ফিরিয়া আসিবে কেন? মানুষ তো পাগল নয় মিছিমিছি গাড়ি ভাড়া গুণিবে!

সুধীরের শ্লথ অপরিণত মস্তিষ্কে এই শহরের মাল আনাগোনার ব্যাপারটার বিরাটত্ব সমুদ্র দর্শনার্থীর প্রথম সমুদ্র দর্শনের মতো একটা আয়ত্তাতীত বিস্ময় ও আনন্দে চিরদিন স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এ

সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে, ব্যাপক ও বিচিত্র। ভাবিতে গেলে তার মনে হয়, চিরটা জীবন সে বুঝি কেবল এই শহরের আমদানি রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজই করিয়া আসিয়াছে। জেটিতে সে কুলির কাজ করিয়াছে, চোখ মিটমিট করিতে করিতে চাহিয়া দেখিয়াছে, ক্রেনের সাহায্যে মাল ওঠানো নামানোর সশব্দ প্রক্রিয়া, ছোট-বড় স্টীমার আর পানসী নৌকায় নিজে সে তাড়াহুড়া হৈচৈ করে মাল বোঝাই দিয়াছে, মাল নামাইয়া নিয়াছে, শহরতলির খালগুলির দুপাশে গুদাম ও আড়তে কাজ করিবার সময় নৌকায় ধীরে-সুস্থে মাল আনা-নেওয়া দেখিয়াছে; রেলের ইয়ার্ডে কাজ করার সময় দেখিয়াছে, মালগাড়ির আশ্রয়ে মালের দু'মুখী স্রোত আর কাজের অবসরে শহরতলির প্রধান পথের ধারে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে, মালবোঝাই লরী ও গরু মহিষের গাড়ির আনাগোনা, ঝাঁকা ও মোট মাথায় মানুষের যাতায়াত। বিদেশে কি যায় বিদেশ হইতে কি আসে, মফঃস্বলে কি যায়, মফঃস্বল হইতে কি আসে সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট আবছা ধারণা সুধীরের আছে। ধারণাটি লইয়া সময়ে অসময়ে সে মনে মনে খেলা করে, সৃষ্টি করে অর্থহীন অবাস্তব কতকগুলি সমস্যা এবং ভাবিতে ভাবিতে বিফল ও বিরক্ত হইয়া ওঠে। কত সমস্যাই যে মনে জাগে সুধীরের! নদীটা যদি হঠাৎ মজিয়া যায়, জাহাজ স্টীমার নৌকার আনাগোনা যদি হইয়া যায় বন্ধ, কি হয় তাহা হইলে? রেল কোম্পানী যদি হাঙ্গামা সহিতে নারাজ হইয়া একদিন বলিয়া বসে, 'ধুত্তোর' এবং বলিয়া রেলগাড়ির চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়, কি হয় তাহা হইলে? বাজার-গাড়িতে, লরীতে, মানুষের মাথায় শহরে মাছ তরকারী আসা বন্ধ হয়, শহরের লোকের মাছ তরকারী সংগ্রহ করিবার কি উপায় হইতে পারে? এই রকম আরও কত দুর্ভাবনাই আসে সুধীরের মাথায়। পচা জিনিস সম্বন্ধে মাছি যতটুকু জানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে এতকাল এতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বেচারী ব্যাপারটা ততটুকুও বোঝে না কিনা।

কাজে ফাঁকি দিলে যতটা না হয় সুধীরকে চিন্তিত দেখিলে রাজেন রাগিয়া আগুন হইয়া যায়।

'তুই বড় বজ্জাত সুধীর, এক নম্বর বজ্জাত।'

এত গরমে ক্রমাগত গালাগালি কাঁহাতক মানুষের সহ্য হয় ? সুধীরের রক্ত আর মাথা এক সঙ্গে গরম হইয়া ওঠে। মনে মনে রাজেনকে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে ওয়াগনের দরজা বন্ধ করিতে যায়। দরজা সীলমোহর করিতে হইবে, খড়ি দিয়া ওয়াগনের গায়ে সঙ্কেত ও নির্দেশ লিখিতে হইবে, তারপর সরাইয়া দিতে হইবে পাশের লাইনে। প্রথম কাজ দু'টি অন্য লোকের, শেষ কাজটা করিতে হইবে সুধীরকে। দরজা বন্ধ করিয়া সুধীর তীব্র দৃষ্টিতে রাজেনকে দেখিতে থাকে— শুকনো মোচার মতো শীর্ণ মুখ তুলিয়া রাজেন তার দিকে চাহিলেই সে মুখ ফিরাইয়া নিবে, সেটুকু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সুধীরের আছে, কিন্তু যশোদার উপর নিরুপায় ক্রোধের জ্বালায় পেট ভরিয়া সুধীর খাইতে পারে নাই, তার চেয়ে তার রাগের বড় প্রমাণ বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু কাজে আসিয়া সুধীর তার অতীত ও বর্তমান জীবনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এইসব কথাই ভাবে। কাজ যারা করে তাদের জীবনে এই জন্যই কি রোমান্স থাকে না ?

কাজে সুধীর ফাঁকি দেয় না কিন্তু তাকে ফাঁকে চিন্তিত মুখে বিড়ি টানিতে দেখিলে রাজেন বড় রাগিয়া যায়। নিজের জানা একটি লোক ছিল রাজেনের, এই কাজটা সে তাকে জুটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, যশোদার অনুরোধে সুধীরকে কাজটা জুটাইয়া দিতে হওয়ায় সুধীরের উপরেই তার মেজাজটা একটু বিগড়াইয়া আছে।

'এক নম্বর ফাঁকিবাজ তুমি সুধীর—একনম্বর বজ্জাত।'

সুধীরের রক্ত আর মাথা একসঙ্গে গরম হইয়া উঠে। পেটটাও বুঝি তার ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মাঝ-দুপুর পার হইয়া গিয়াছে। চোখ তুলিয়া চাহিয়া ছাখে, ধনঞ্জয় কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিড়ির ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে রাজেনের গালাগালিতেই বোধহয় আমোদ পাইয়া মুখে হাসিও ফুটাইয়াছে। শুকনো মোচার মতো শীর্ণকায় রাজেনের উপর যে রাগটা হইয়াছিল, সে রাগটা সুধীরের তাই গিয়া পড়ে দৈত্যের মতো বিশাল-দেহ মানুষটার উপর। মনে মনে রাজেনের বদলে ধনঞ্জয়কে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে সে ওয়াগনের

আরও কাছে সরিয়া যায়। ধনঞ্জয়কে সুধীর ভয় করে। ভূতপ্রেত দৈত্য-দানার যে ভয় আচমকা ছোট ছেলেদের ঘুম ভাঙাইয়া দেয়, অন্ধকারে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া যে ভয়ে ছোট ছেলে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদে। সেই সঙ্গে হিংসা তো আছেই। গত কয়েকদিনের মধ্যে যে হিংসার তীব্রতা মারাত্মক রোগের মতো ভিতরে ভিতরে একটা দুর্বোধ্য যাতনায় সুধীরকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

ধনঞ্জয় কাছে আগাইয়া আসে। 'কালীঘাট গেলাম ভাই যশোদার সঙ্গে—যা মিষ্টিটাই একপেট খাওয়ালে যশোদা। যত বলি আর খাব না, তত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খাওয়ায়, বলে, এই খাওয়ার ক্ষমতা নিয়ে তোমার এত গব্বো! আর কটা রসগোল্লা যদি না খাও তুমি, চাদ্দিকে তোমার নিন্দে রটিয়ে বেড়াব। —বাড়ি এসে ফের বলে কি, নাও চান করে, ভাত খেয়ে নাও চটপট, তারপর সুধীরের সঙ্গে কাজকম্মো দেখবে যাও।'

সুধীর এখান হইতে ওখানে যায়, মাল গোণে, ওয়াগনের দরজা বন্ধ করে, কুলিদের সঙ্গে ঠেলিয়া এ লাইন হইতে ওয়াগন পাশের লাইনে সরাইয়া দেয়। এই সব গোলমালের মধ্যে যে ওয়াগনটি কিছুক্ষণের জন্য নড়িবার কথা ছিল না সেটাকে সুধীর কিভাবে কখন ঠেলিয়া দেয় আর কিভাবে ওয়াগনের চাকা ধনঞ্জয়ের একটি পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায় ঠিক মতো কেউ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

হাসপাতালে যশোদার কাছে ধনঞ্জয় বলে, 'সরতে পেলাম কৈ? পাশের লাইনে একটা ইঞ্জিন যাচ্ছিল তাই দেখছি, পাশ থেকে গাড়িটার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। লাইনের বাইরে পড়েছিলাম গো যশোদা, দুটো পা-ই যদি গুটিয়ে নিতাম তাড়াতাড়ি, হায় হায়! কেমন যেন হক-চকিয়ে গেলাম।'

ধনঞ্জয় কাতরায় আর কাঁদে। এতবড় একটা দৈত্যের মতো মানুষের চোখ দিয়া জল পড়িতে দেখিয়া যশোদারও মনে হয়, একমাত্র চাঁদের শোকে দু'একটা দিন সে যা করিয়াছিল, আজ বুঝি তাই করিয়া বসিবে

—সোজাসুজি কাঁদিয়া ফেলিবে। তবু সে জেরা করে।

'একটা পা গুটিয়ে নিলে, আরেকটা নিলে না কেন?'

তা কি ধনঞ্জয় জানে? অনেক ভাবিয়া সে আন্দাজে বলে, 'পড়বার সময় একটা পায়ে চোট লেগেছিল বলে বোধ হয়।'

সেটা সম্ভব। যশোদা কয়েকবার যে প্রশ্ন করিয়াছে, আবার তাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করে, 'কিন্তু গাড়িটা ঠেলে দিলে কে?'

'কে জানে। দু'একজন সুধীরের নাম করছিল, কিন্তু তারাও ঠিক ছাখে নি, জোর করে বলতে নারাজ।'

কিন্তু সুধীর ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবে কেন ধনঞ্জয়ের গায়ের উপর? দিলেও ইচ্ছা করিয়া নিশ্চয় দেয় নাই। ভ্রূ কুঁচকাইয়া যশোদা ভাবিতে থাকে, তার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটা বার বার জাগিতে থাকে যে, ধনঞ্জয়ের গায়ের উপর সুধীর ইচ্ছা করিয়া ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবে কেন?

নন্দ বড় চমৎকার কীর্তন গাহিতে পারে। ছেলেবেলা হইতেই তার গানের দিকে ঝোঁক, গান শোনার সুযোগ পাইলে সে আর সব ভুলিয়া যাইত। এখনও ভুলিয়া যায়, গান শোনার সময় আর নিজে গাওয়ার সময়। মাইলখানেক দূরে কদমতলার বিখ্যাত কীর্তনিয়া দীননাথ তাকে কীর্তন শিখাইয়াছে। শিক্ষা এখনও শেষ হইয়াছে বলা যায় না, তবে যেটুকু নন্দ শিখিয়াছে সাধারণ লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট, আর কিছু শিখাইবার মতো বিদ্যা গুরুরও তার আছে কিনা সন্দেহ। তবু নন্দ এখনও নিয়মিতভাবে শিখিতে যায়, দীননাথ যা শেখায় ব্যাকুল আগ্রহে তাই শেখে, মাঝে মাঝে দু'চার টাকা গুরুদক্ষিণা দেয়। কীর্তন দীননাথের জীবিকার উপায়ও বটে, জীবনের একমাত্র নেশাও বটে, এখন পর্যন্ত নন্দর এটা শুধু নেশা হইয়াই আছে। নন্দর ইচ্ছা শুধু কীর্তন করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিবে—কীর্তনের মতো আর কি আছে জগতে? সোনার মতো নাম বলিয়া সুবর্ণ যার নাম, তার কথা অবশ্য আলাদা। তবে নন্দর কল্পনার চিরন্তনী রাধার সঙ্গে ভাবভঙ্গি চাল-চলন কোনোদিক দিয়াই সুবর্ণের মিল নাই বলিয়া নন্দর বড় আপসোস। কথা সুর ভাব ও আবেগ এই সব নিয়া যে কীর্তন, নন্দর মনে সত্য-

সত্যই তার একটা মূর্তি আছে, কখনও স্পষ্ট দেখিতে পায় কখনও আবছা হইয়া যায় ; সুবর্ণের সঙ্গে কতকটা মিল আছে মূর্তিটির, কিন্তু সে মিল কোনো কাজের মিল নয়, তার কোনো দাম নাই। নন্দর রূপধরা কীর্তন বিজনে বসিয়া মালা গাঁথা, ফুল গাছের পাতাটি খসিয়া পড়ার শব্দে চকিত হইয়া ওঠে, উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকে, চুল আর আঁচল উড়াইয়া যমুনা নামক নদীর তীরে (শহরের কয়েক মাইল উজানে গঙ্গার ধারে নন্দর একটি চেনা স্থানের সঙ্গে যার আশ্চর্য মিল আছে) ছুটিয়া যায়, ধূলায় সোনার অঙ্গ লুটাইয়া কাঁদে, অভিমানে মুখ ভার করিয়া থাকে, আরও কত কি করে। সুবর্ণকে নন্দ কোনোদিন এসব করিতে দেখে নাই।

মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দীননাথ দলবলসহ কীর্তন গাহিতে যায়, নন্দও সঙ্গে যায়। কোনোদিন গুরু আসর জমায়, কোনোদিন শিষ্য। সাধারণ জীবনে নন্দ ভীরু ও লাজুক চোখ তুলিয়া লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারে না, কিন্তু কীর্তনের আসরে শ্রোতাদের মধ্যে আবেগ, রোমাঞ্চ ও শিহরণ বিতরণ করার সময় তার সবটুকু আড়ষ্ট ভাব কাটিয়া যায়, লজ্জা-ভয়ের চিহ্নও থাকে না। সর্বাঙ্গের ভাবভঙ্গির মধ্যে শব্দে যা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা গেল না, তারই অভিব্যক্ত দিবার চেষ্টাটা যেন আপনা হইতেই চলিতে থাকে। কীর্তনের কথায় হঠাৎ রাধিকার লজ্জা পাওয়ার সময় নন্দকে দেখিতে দেখিতে সত্যই মনে হয় ভিজা কাপড়ে পরপুরুষের সামনে পড়িয়া গৃহস্থ বধূ যেন নিজের মধ্যে নিজেই লুকাইতে চাহিতেছে, কাপড়টি এখানে একটু টানিয়া না দিলেই নয়, কিন্তু আঁচলের তলা হইতে হাতটি বাহির করিতে যাওয়ায় হাতটিই তার লজ্জায় অবশ হইয়া গেল, মচকান ডালের মতো মরিয়াই গেল নাকি কে জানে!

কোনো কোনোদিন রাধার বিরহে কৃষ্ণের কি অবস্থা হইয়াছিল আত্মহারা হইয়া সকলকে তাই বুঝাইতে থাকে, শুনিতে শুনিতে দীননাথ কাঁদিয়া ফেলে। নন্দকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'আমি কি পারি ? এমন কিশোর কোমল কণ্ঠ আমি কোথায় পাব ? বিরহ যাতনায় শ্যামের যখন আমার চেতনা লোপ পেয়ে এসেছে, রাধার নাম নিতে নিতেই শেষ

নশ্বাস ফেলবেন ভেবে অস্ফুটস্বরে বলছেন, রাধা রাধা, আর নিজের মুখে রাধার নাম শুনে দেহে যেন জীবন ফিরে আসছে—তখনকার সেই আকুল মিনতিভরা ডাক আমার এই কর্কশ কণ্ঠে আমি কেমন করে ফোটাবো গো।'

সত্য সত্যই এমনিভাবে বলে দীননাথ, নাটকের পার্টের মতো আগে হইতে যেন মুখস্থ করা ছিল। আসরে যে আবহাওয়াটা তখন সৃষ্টি হইয়া আছে, শ্রোতারা যে রকম মুগ্ধ ও বিভোর হইয়া গিয়াছে, তাতে দীননাথের কথা ও কান্নায় সকলের চোখ সজল হইয়া আসে, অনেকে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চায়, কেউ কেউ কাঁদেও।

বড় আসরে অনেকক্ষণ জমজমাট কীর্তন করিয়া আসিবার পর দু'তিন দিন নন্দ হাসে না, কথা বলে না, খাইতে চায় না, নড়াচড়া করিতে চায় না, প্রাণহীন জড়পিণ্ডের মতো শুইয়া বসিয়া সময় কাটায়। যশোদা ভয়ে ভয়ে ভাবে যে, কি জানি কি হইবে, এরকম প্রচণ্ড ভাবাবেগ আর তার প্রতিক্রিয়া এই রোগদুর্বল ছেলেমানুষের কতদিন সহ্য হইবে? নন্দর কীর্তনের মোহ কাটাইতে কত চেষ্টাই যে যশোদা করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিলে দিন দিন নন্দর ভাবপ্রবণতা আর অবরুদ্ধ উত্তেজনার চাঞ্চল্য এমনভাবে বাড়িয়া যাইতে থাকে যে, তাতেও যশোদা ভয় পাইয়া যায়।

একি অপদার্থ একটা জন্মিয়াছিল তার ভাই হইয়া? এর চেয়ে কোকেনখোর আফিমখোরেরাও ভাল, তারা কেবল নিজেদেরই সর্বনাশ করে, এ ছোঁড়া আরও কত ছেলেমেয়েকে গোল্লায় পাঠাইতেছে তার হিসাব নাই।

একদিন সত্যপ্রিয় নন্দর কীর্তন শুনিবার আগ্রহ জানাইয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। অনুরোধটা আসিল জ্যোতির্ময়ের মারফতে। সেদিন পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে নন্দকে নিয়া একটু নির্দোষ পরিহাস করায় নন্দ যে রাগ করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছে, একথা জানিয়া সত্যপ্রিয়র নাকি দুঃখের সীমা নাই। নন্দর জায়গায় অবশ্য আরেকজন লোক নেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সত্যপ্রিয় যত শীঘ্র সম্ভব নন্দকে আরেকটি চাকরি দিবে।

আগামী রবিবার সত্যপ্রিয় বাড়িতে একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিয়াছে, ঐদিন নন্দ যদি একটু কীর্তন করে তার বাড়িতে, আর যশোদা যদি দু'টি শাকান্ন গ্রহণ করে, সত্যপ্রিয় বড়ই বাধিত হইবে। বলিলেন, 'মিল আর শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চান।'

সত্যপ্রিয় মিলে আবার একটা ধর্মঘটের গুজব চলিতেছিল, দু'চারজন পাণ্ডা আসিয়া যশোদার সঙ্গে দেখাও করিয়াছে। হঠাৎ নন্দ আর তাকে সত্যপ্রিয়র এতখানি খাতির করার কারণটা অনুমান করিতে যশোদার অবশ্য দেরি হইল না, তবু সে রাজী হইয়া গেল। এখন ধর্মঘট করার পক্ষপাতী সে নয়, মিলে কাজ খুব কম, এখন ধর্মঘট করিয়া বিশেষ কিছু লাভ হবে না। তা' ছাড়া, ধর্মঘট হবে কি-না তাও এখনও ঠিক নাই। এদিকে সত্যপ্রিয়কে শ্রমিকদের অনেক দিনের ন্যায় সঙ্গত দাবির কিছু কিছু অন্তত মিটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, সেটা গ্রহণ করিতে দোষ কি? লাভ হয়তো কিছুই হইবে না, তবু চেষ্টা করিতে দোষ নাই।

নন্দর কীর্তন করা সম্বন্ধেই কেবল যশোদার মনটা খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। অনেক লোকের মধ্যে কীর্তন করিতে গেলেই নন্দর বড় বেশী উত্তেজনা হয়। কিন্তু বাধা দিয়াই বা কি হইবে? এখানে না হোক দু'দিন পরে অন্য একটা বড় আসরে নন্দ কীর্তন করিতে যাইবে—আধমরা হইয়া বাড়ি ফেরার আগে সে হয়তো জানিতেও পারিবে না নন্দ কীর্তন করিতে গিয়াছিল।

উপলক্ষ্য সামান্য, সত্যপ্রিয়র পিতার মাসিক শ্রাদ্ধ। শোনা যায়, জীবনের শেষ দশ বৎসর সত্যপ্রিয়র পিতা ছেলের মুখ দর্শন করেন নাই, মুখ দর্শন করিবার পর বাঁচিয়াছিলেন মোটে কয়েকমাস। কেউ কেউ নেহাত তামাশা করিয়াই বলে বটে যে, সত্যপ্রিয় নিজের মুখটা না দেখাইলে বুড়া আরও কয়েকটা বছর হয়তো টিঁকিয়া যাইত। কিন্তু এসব কথা সত্যপ্রিয়র কানে যায় কি না সন্দেহ, গেলেও পিতৃহত্যার পাপ মাথায় চাপিয়াছে এ ধরনের খুঁতখুঁতানির জন্যই সে বার্ষিক বা মাসিক একটা

শ্রাদ্ধও বাদ দেয় না, একথা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। জ্যোতির্ময় এবং তার বাড়ির মেয়েদেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। উপলক্ষ্য যত সামান্যই হোক, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা শ'তিনেকের নিচে নামিবে না। সত্যপ্রিয়র বাড়িতে কোনো উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা এর কম বড় একটা হয় না, কম করা চলে না। লোকে বলিবে কি?

রবিবার সকালে জ্যোতির্ময় অপরাজিতাকে বলিল, 'কীর্তন যদি শুনতে চাও তিনটের আগে যেতে হবে, তা যদি না শোনো তাহলে সন্ধ্যার সময় গেলেই চলবে। আর শোনো, উনি যে নেকলেসটা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়, সেটা পরে যেও।'

'আমি যাব?'—অপরাজিতা বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল।

'যাবে না? ওঁর বাড়ি নেমন্তন্ন, এত কাছে থেকে না গেলে চলবে কেন?' তবে অবশ্য কোনো কথা নাই, না গেলে যখন চলিবেই না তখন যাইতে হইবে বৈ কি। 'না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম যাব কি না।' গভীর শ্রান্তিতে অপরাজিতার হাই ওঠে, আবার শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে।

'নেকলেসটা কিন্তু পরা চলবে না।'

জ্যোতির্ময় একটু হাসিয়া বলিল, 'কেন? সাজবার সাধ নেই? না না, পোরো নেকলেসটা, কর্তা দেখলে খুশী হবেন। চোখে অবশ্য ওঁর পড়বে কি না সন্দেহ, তবু যদি সামনে পড়েন কখনো, প্রণাম করবার সময় পড়তে পারে চোখে। সামনে পড়লে প্রণাম ক'রো কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে।'

'নেকলেসটা কেমন কালো হয়ে গেছে, ও আর পরা যাবে না।'

জ্যোতির্ময় আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কালো হয়ে গেছে মানে? দেখি।'

অপরাজিতা অপরাধীর মতো মখমলের কেসটা বাহির করিয়া আনে। কেসটি তেমনি উজ্জ্বল আছে, কিন্তু নেকলেসটির কেমন যেন জ্যোতি নাই। সোনাটা পিতলের মতো দেখাইতেছে, পাথর আর মুক্তাগুলি যেন কাঁচ আর পুঁতি।

'কাউকে দেখাই নি এ্যাদ্দিন, লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমায় বলতেও কেমন—'

জ্যোতির্ময় বিহ্বলের মতো চাহিয়াই থাকে। অপরাজিতা আবার বলে,

'আমাদেরি ভুল হয়েছিল, জিনিসটা নকল।'
জ্যোতির্ময় যেন চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে না, 'তাই কি হয়, উনি আসল জিনিস বলে নকল দেবেন ?'
'আসল জিনিস বলে তো দেন নি।'
জ্যোতির্ময় নেকলেসটা নাড়াচাড়া করিতে থাকে, তার মুখের খানিকটা জ্যোতিও যেন নিভিয়া গিয়াছে।
অপরাজিতা মিনতি করিয়া বলে, 'আচ্ছা, নাইবা গেলাম আমি ? শরীরটা একটু—'
শুনিবামাত্র কি রাগটাই যে জ্যোতির্ময়ের হয় ! চোখ পাকাইয়া সে বলে, 'বড় ছোট মন তো তোমার ? যদি দিয়েই থাকেন একটা নকল জিনিস, তাই বলে ওঁর বাড়ি যাবে না তুমি ? মাস গেলে উনি মাইনে দেন বলে দু'বেলা পেট ভরছে সেটা খেয়াল আছে ?'
অন্য কেউ হয়তো বলিত যে, একা সত্যপ্রিয় নয়, কাজ করিলে সকলেই মাস গেলে মাহিনা দিয়া থাকে, এটা এমন কিছু সৃষ্টি ছাড়া উদারতার পরিচয় নয়। অপরাজিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মখমলের কেসটা বন্ধ করিয়া তার হাতে দিয়া জ্যোতির্ময় বলিল, 'বাক্সে তুলে রেখে দাও, কেউ যেন না ছাখে। কাউকে বোলো না।'
নেকলেসটা নকল বলিয়াই যেন জ্যোতির্ময় রাগ করিয়া বেলা একটা বাজিতে না বাজিতে গাড়ি আনিয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেবল নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়া নয়, এখন হইতে রাত্রি দশটা এগারটা পর্যন্ত অপরাজিতাকে সত্যপ্রিয়র বাড়িতে থাকিতে হইবে। যশোদার সরু গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করাইয়া তাকে ডাকা হইল, কিন্তু যশোদার এখন গেলে চলিবে না। ওবেলার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে।
সন্ধ্যার সময় যশোদা যখন সত্যপ্রিয়র বাড়িতে গেল, নিচের হল ঘর-টিতে নন্দর কীর্তন চলিতেছে। হল ঘরটি পুরুষ শ্রোতায় ভরিয়া গিয়াছে, পাশের দু'টি ঘরের বড় বড় চারটি দরজার কাছে মেয়েদের ভিড়। নন্দর কীর্তন শুনিবার লোভ যশোদার কম নয়, তবু সে না শুনিয়া

এড়াইয়া চলিবার চেষ্টাই করে, পাড়ায় কোথাও নন্দর কীর্তন হইলেও সহজে যাইতে চায় না। সে ভাবিয়াছিল এতক্ষণে কীর্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। একটি দরজার কাছে মেয়েদের মধ্যে বসিয়া কীর্তন শুনিতে শুনিতে সে ভাবিতে থাকে, আজ তো বিভোর হইয়া নন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্তন করিয়া চলিয়াছে, কাল্ তার কি অবস্থাটাই না জানি হইবে! কিন্তু বেশীক্ষণ যশোদা এসব দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে পারে না।

নন্দর কীর্তন শুনিতে শুনিতে যশোদারও মানসিক জগৎটা ধীরে ধীরে একেবারে বদলাইয়া যায়। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়, বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করিতে থাকে আর যত সব আবোল-তাবোল খাপ্ছাড়া কথা মনে আসে। নন্দ এদিকে নিজেই রাধা হইয়া তার কৃষ্ণের মতো কালো তমালকে কত যে মনের কথা বলে আর যশোদা এদিকে ভাবিতে থাকে যে, ধনঞ্জয়টা সত্যই কি নিষ্ঠুর, এ জগতে কেবল সেই পারে যশোদাকে বুকে তুলিয়া লইতে কিন্তু একবারও কি সে বলিল, এসো যশোদা, আমার বুকে এসো ? 'যাইতে বলিলেই যে চলিয়া যায় সে কেমন ধারা প্রেমিক গো !' বলিয়া নন্দ এদিকে যত অনুযোগ করে, যশোদার তত মনে হয়, তাই তো বটে, ঠিক তো, সে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না বলিয়া কাছে ঘেঁষিবে না, কেমন ধারা মানুষ ধনঞ্জয় ?

তারপর এক সময় সুবর্ণের দিকে চোখ পড়ায় যশোদা যেন চেতনা ফিরিয়া পায়, মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। মুখখানা লম্বাটে হইয়া গিয়াছে সুবর্ণের, ছোট একটু হাঁ করিয়া আছে, দু'চোখ বড় বড় করিয়া খোলা, কি একটা রোগের যন্ত্রণায় মেয়েটা যেন মুখ ভেংচি দিয়াছে। একটু আগে তার নিজের মুখভঙ্গিটা কি রকম হইয়াছিল কে জানে ! আর ধনঞ্জয়ও তো কাটা পা নিয়া পড়িয়া আছে হাসপাতালে।

জোর করিয়া যশোদা বাড়ির কথা ভাবিতে আরম্ভ করে, এসব পাগলামিকে আর প্রশ্রয় দিবে না। সকাল সকাল সে রান্না সারিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, ও বাড়ির নদেরচাঁদের বৌকে পরিবেশন করিতে বলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু খাওয়ার সময় বোধহয় গোলমাল বাধিবে,

যা শয়তান তার বাড়ির লোকগুলি, হৈচৈ এত ভালবাসে! এসব কথা ভাবে বটে যশোদা, কিন্তু ভাবিতে যেন ভাল লাগে না, আবেগে ব্যাকুল হওয়ার জন্য মনটা আকুলি বিকুলি করিতে থাকে—ঘরবাড়ি, ভাড়াটে, ডাল্‌ভাত পরিবেশন এ সমস্তের চিন্তায় রস কই, নেশার মতো রস?

এদিকে কাশীবাবুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে সত্যপ্রিয় জ্যোতির্ময়কে জিজ্ঞাসা করিতেছিল যশোদা আসিয়াছে কি না। যশোদার সম্বন্ধে আজ তার আগ্রহের সীমা নাই। কীর্তন শেষ হইবার পর যশোদাকে সঙ্গে করিয়া জ্যোতির্ময় দোতলার একপ্রান্তে একটি মাঝারি আকারের ঘরে নিয়া গেল। এটি সত্যপ্রিয়র অবসর যাপনের ঘর, একপাশে চৌকীর মতো সাদাসিধে ছোট একটি খাটে বিছানা, একটি রিভলভিং বুক সেল্‌ফে কতকগুলি বই আর মেঝেতে আসন করিয়া বসিয়া লিখিবার জন্য একটি ডেস্ক ছাড়া আর কোনো আসবাবের বালাই নাই। একটি চেয়ারও চোখে পড়ে না। বাড়ির অন্যান্য অংশে গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে দেখিতে এ ঘরে আসিয়া ঢুকিলে মনে হয়, এখানে বুঝি কোনো সংসারবিরাগী নিস্পৃহ সন্ন্যাসী বাস করে। সত্যপ্রিয়র বেশ আর ঝক্‌ঝকে মেঝেতে তার বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া কথাটা আরও বেশী করিয়া মনে হয়।

সত্যপ্রিয়র বেশ দেখিয়া জ্যোতির্ময় পর্যন্ত আজ একটু অবাক হইয়া গেল। যশোদাকে ডাকিয়া আনিতে যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয়র পরনে সাদা কাপড় ছিল, গায়ে জামা ছিল—দূরে কোথায় অসময়ে বাদলা দেখা দেওয়ায় শহরতলিতে শীতের আমেজ টের পাওয়া যাইতেছিল। এখন কিন্তু খালি গায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া সত্যপ্রিয় মেঝেতে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়াছে, পরনের কাপড়খানা গরদের। কাঁধে মোটা পৈতা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বাহুতে অনেকগুলি কবজ ও তাবিজ, কব্জির কাছে স্ফটিকের জপমালা জড়ানো। মনটা হঠাৎ যেন কেমন করিয়া উঠিল জ্যোতির্ময়ের, সত্যপ্রিয় কি দর্শক অনুসারে বেশ বদলায়? সত্যপ্রিয়কে নানা বেশে সে দেখিয়াছে, কোনোদিন হ্যাটকোট পরা খাঁটি সাহেবী পোষাক, কোনোদিন মাথায় টুপি, গায়ে লম্বা কোট—খানিকটা

পশ্চিম ভারতীয়েরপোষাক, কোনোদিন মটকার পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, কাঁধে ভাঁজ-করা চাদর—বাঙালীপোষাক, কোনোদিন মাঝে মাঝে সত্যপ্রিয়র বেশে মুসলমান ভদ্রলোকের বেশের একটু ধাঁচ যেকি করিয়া আমদানি হয় জ্যোতির্ময় বলিতে পারে না। আজ হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের মনে পড়িয়া গেল, যত বার সত্যপ্রিয়কে সে ভিন্ন ভিন্ন পোষাকে দেখিয়াছে তার প্রত্যেক বার বিশেষ প্রয়োজনে হয় ভিন্ন দেশীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার অথবা তার নিজের গিয়া দেখা করিবার কথা ছিল।

ঘরের রিক্ততা ও সত্যপ্রিয়র বেশ যশোদাকেও একটু কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। মানুষটাকে প্রণাম করিবার কোনো সংকল্পই তার ছিল না, কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া প্রৌঢ় ও সাধুবেশধারী ব্রাহ্মণকে সে একেবারে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল, কারও বলিয়া দিবার দরকার হইল না—যশোদা, ইনিই তিনি, একে প্রণাম কর। দেখিয়া জ্যোতির্ময় ভাবিতে থাকে, এই জন্যই কি সত্যপ্রিয় তাড়াতাড়ি বেশ বদলাইয়াছে, যশোদার মনে শ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য? একটু পিছাইয়া আসিয়া মেঝেতে হাতের ভর দিয়া একটু কাত হইয়া যশোদা সসম্ভ্রমে বসে আর জ্যোতির্ময় মনের মধ্যে নকল নেকলেসের দীপ জ্বালিয়া নতুন দৃষ্টিতে সত্যপ্রিয়কে দেখিতে থাকে। এ কি সম্ভব? মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী দেখা করিতে আসিবে বলিয়া সত্যপ্রিয় ইচ্ছা করিয়া বেশের খানিকটা বাঙালীত্ব লোপ করিয়া দেয়, পুরাপুরি মাড়োয়ারী সাজে না সেটা মাড়োয়ারীও দৃষ্টিকটু হইবে বলিয়া? কেবল এইটুকু বেশ পরিবর্তন করে যার অলক্ষ্য প্রভাব আগন্তুকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইতে তাকে সাহায্য করিবে, অজ্ঞাতসারে তার দৃষ্টিকে তৃপ্তি দিবে?

'আপনিও বসুন জ্যোতির্ময়বাবু।'

জ্যোতির্ময় বসিলে সত্যপ্রিয় বলিল, 'তোমার ভাই বড় সুন্দর কীর্তন করে বাছা, শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু—তুমি প্রায় আমার মেয়ের বয়সীই হবে, তোমায় বলতে দোষ নেই—ছেলেটির স্বাস্থ্য ভাল নয়।'

মেয়ের বয়সী না হইলে নন্দর স্বাস্থ্য ভাল নয় একথাটা তাকে বলিলে

কি দোষ হইত যশোদা বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু খুশী সে হয়।
—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর জন্য মাঝে মাঝে বড় ভাবনা হয়।'
'বয়স বাড়লে হয়তো স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। পড়াশোনা কতদূর করেছে?'
'প্রথম পাসের পরীক্ষায় ফেল করেছে।'
'বেশ, বেশ। পাস করে তো সব রাজা হচ্ছে আজকাল। দেশের বেকার সমস্যা যে কি উৎকট হয়ে দাঁড়িয়েছে তা টের পাই বাছা আমরা, চাকরির জন্য রোজ দলে দলে ছেলেরা আসছে, তাদের দেখে কি দুঃখই যে হয়। আমার দেশের সোনারচাঁদেরা, দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, দু'টি অন্নের জন্য তারা হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে। সকলের আগে এখন আমাদের কি করা দরকার জান বাছা, দেশের বেকার সমস্যা দূর করা। খেতেই যদি না পায় মানুষ তবে সে করবে কি, আগে পেটের ভাতের যোগাড় করে তবে না অন্য কথা?'—কথা বলিতে বলিতে সত্যপ্রিয় যশোদার মুখের ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে থাকে, পেটের ভাতের কথাটা যশোদার খুব প্রিয় বুঝিতে পারিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করে, 'কিন্তু দেশকে যারা চালায়, তারা কি তা বুঝতে পারে, না বুঝতে চায়? সব ভেসে চলেছে স্রোতে, নাম চাই, হাততালি চাই। না, না, সবাই ফাঁকিবাজ আমি তা বলছি না বাছা, দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, এ রকম মহৎ লোক কি নেই দেশে, অনেক আছে—কিন্তু বল তো বাছা, তুমিই বল, চোখ-কান বুজে শুধু ত্যাগ করলেই কি কাজ হয়? না খেয়ে যে মরতে বসেছে যথা-সর্বস্ব বিক্রি করে, বিলেত থেকে দামী ওষুধ এনে খাওয়ালে সে কি বাঁচে? 'ইংরেজকে তাড়াও', 'ধর্মঘট কর', 'স্বাধীনতা চাই'—এইসব বলে বাবুরা চেঁচাচ্ছেন, এদিকে দেশের চাষী-মজুররা খেতে পাচ্ছে না, ছেলেরা সব বেকার যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করছে—'
প্রথমটা যশোদা একটু ভড়কাইয়া গিয়াছিল, এখন সামলাইয়া উঠিয়া গম্ভীর মুখে শুনিয়া যায়। মিলের কথা শান্তভাবে আলোচনা করিয়া মিলের শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোনো অনুরোধ করিয়া যে লাভ হইবে না, বুঝিতে যশোদার আর বাকী থাকে না। ভদ্রলোক ভাবপ্রবণতা

আনিয়াছে। আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, এ বর্ম ভেদ করিয়া শ্রমিকদের দুঃখের কাহিনী দিয়া তার মর্ম ভেদ করার ক্ষমতা কারও নাই। কথা বলিতে বলিতে আবেগের আতিশয্যে কারও মুখ দিয়া যখন থুতু ছুটিতে আরম্ভ করে, পরের কথায় সে তখন কান দেয় না।

একটু আত্মসম্বরণ করিয়া সত্যপ্রিয় বলে, 'যাক্ যাক্। দেশের অবস্থা তোমারও অজানা নয়, আমারও অজানা নয়। তোমার ভাইকে একটি চাকরি দিতে হবে, না? ছেলেমানুষ ঝোঁকের মাথায় কাজটা ছেড়ে দিল, নইলে ওই কাজেই ওর উন্নতি হত। বেশ কাজ করছিল ছেলেটি, না জ্যোতির্ময়বাবু? তা, কয়েকটা মাস যাক এখন, ক'মাস পরে তোমার ভাইকে একটি ভাল চাকরি বোধ হয় দিতে পারব। আমার মিল দু'টোতে ক'মাস পরে আগাগোড়া সংস্কার করব ভাবছি, নতুন লোকজন নিয়ে কাজের ভাল ব্যবস্থা ক'রে ফেলব। মিলের লোকেরাও নানা রকম দাবিদাওয়া করছে, সে বিষয়ে একটু বিবেচনা করে দেখতে হবে।'

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছয়টা দরজার একটার দিকে পা বাড়াইয়া বলে, 'এবার সকলকে খেতে বসানো দরকার, দেখি গিয়ে কি ব্যবস্থা হল। দু'টি শাকান্ন মুখে দিয়ে যেও কিন্তু বাছা।'

সত্যপ্রিয় চলিয়া গেলে জ্যোতির্ময় নেকলেসের কথা, সত্যপ্রিয়র বেশ পরিবর্তনের গোপন রহস্যের কথা, সব ভুলিয়া গিয়া প্রায় গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'দেখলে চাঁদের মা, শুনলে? এমন মানুষ আর দেখেছ?'

যশোদা স্বীকার করিয়া বলিল, 'খানিক খানিক দেখেছি—এমন তুখোড় দেখি নি।'

তারপর যশোদা অন্দরে গেল। তাকে দেখিয়াই সুবর্ণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, 'কী সুন্দর কীর্তন করে তোমার ভাই, যশোদাদিদি! এমন আর জীবনে শুনি নি!'

কত সুদীর্ঘ জীবন সুবর্ণের, কত কীর্তনই সে শুনিয়াছে! সে আর জীবনে কখনও এমনটি শোনে নাই, নন্দর এতবড় সার্টিফিকেট যেন আর হয় না।

'গলাটা মিষ্টি বলে শুনতে ভাল লাগে, নইলে শিখেচে কচু।'

স্থবর্ণ উত্তেজিত হইয়া বলে, 'না, না, তুমি জান না যশোদাদিদি, ভাল করে না শিখলে কেউ এমন করে গাইতে পারে? সবাই কি বলেছ জান? কীর্তন যে এমন হয় এ্যাদ্দিন কেউ ভাবতেও পারে নি।'

যশোদা একটু হাসে আর মনে মনে বলে, সবাই তো তোমারি মতো পণ্ডিত। কীর্তন যে গাহিয়াছে যশোদাই তার দিদি শুনিয়া মেয়েরা কেউ কেউ আসিয়া তার সঙ্গে কথা বলে, কীর্তনের প্রশংসা জানায়। যশোদা প্রতিবাদ করে না, মৃদু একটু হাসিয়া কতকটা কথা বদলানোর উদ্দেশ্যে আর কতকটা মেয়েমানুষের প্রকৃতিগত কৌতূহলের জন্য জিজ্ঞাসা করে, এ মেয়েটি কে, ও বৌটি কে। অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ মেয়ের পরিচয় যশোদার জানা হইয়া যায়। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা আজ খুব কম, কিন্তু সত্যপ্রিয়র অন্দরেই যত নারী বাস করে, একটি সাধারণ কাজের বাড়ি ভরাট করিয়া তুলিবার পক্ষে তারাই যথেষ্ট। কেউ বসিয়া থাকে, কেউ ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও দল বাঁধিয়া কয়েকজন গল্পগুজব করে। বেশীর ভাগ মেয়েকে স্থবর্ণ-ই যশোদাকে চিনাইয়া দেয়, কোনটি সত্যপ্রিয়র মেয়ে, কোনটি তার বৌ, কোনটি ভাগ্নী অথবা ভাইঝি অথবা দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া।

সত্যপ্রিয়র অন্দরের কমবয়সী মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে স্থবর্ণ মন্তব্য করে, 'কি বিচ্ছিরি করে সেজেছে, এমন গেঁয়ো ওরা! গায়ে রাশ রাশ চাপিয়ে দিলেই যেন সাজা হয়!'

যশোদা ভাবে, 'থাকলে তুমিও গায়ে চাপাতে ছাড়তে না। স্থবর্ণের মন্তব্য শুনিয়া নয়, আপনা হইতেই এবাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে যশোদার একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠিতে থাকে। বাড়ির লোকের কাছে বাড়ির কর্তা কতকটা রাজার মতো, সেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের ও কর্তৃত্বের চাপে কারও স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই, সকলেই অল্প-বিস্তর বিকার পাইয়াছে। তা'ছাড়া আছে বড়লোকের অন্দরমহলের অধিবাসিনী হওয়ার অপরিহার্য পরিণাম। এ বাড়ির মেয়ে হওয়ার অর্থ-ই যে অন্য বাড়ির মেয়ের মতো না হওয়া, এটা সকলেই জানে। আশ্রিতা আছে বহু, কারও দাবির জোর বেশী, মানমর্যাদাও বেশী, কারও দাবির

জোর কম, মানমর্যদাও কম এবং এই হিসাব মতো এ ওর মন যোগাইয়া চলে, এ ওকে অবজ্ঞা করে, হিংসাটা হইয়া থাকে বিশ্বব্যাপী। আশ্রিতারাই কি বাড়ির মেয়েদের মন বিগড়াইয়া দেয় বেশী, আবহাওয়াটা করিয়া তোলে বেশী বিকৃত? সত্যপ্রিয়র সেজমেয়ে আর মেয়েটির সমবয়সী পিসতুতো বোনটির আজন্ম একসঙ্গে লালিতপালিত হওয়ার ফলটা কয়েক মিনিট চোখে দেখিয়াই যশোদার তাক লাগিয়া যায়। সেজমেয়ের কাপড়খানার দাম অনেক বেশী, গয়নাও তার গায়ে অন্যজনের চেয়ে দশগুণ। আজ একটি নতুন দুল পরিয়াছে সেজমেয়ে।

সেজমেয়ে (মুখ ভার): সবাই চলে গেলেই তোমার দুল ফিরিয়ে দেব।

পিসতুতো বোন (ভীতা): কেন ভাই?

সেজমেয়ে: দিদির কানবালা ধার করে পরতে পারবে বলেই তো যেচে যেচে নিজের বিচ্ছিরি দুল দুটো আমায় পরালে।

পিসতুতো বোন: তুই নিজেই তো চেয়ে নিলি ভাই?

সেজমেয়ে: কখন চাইলাম?

পিসতুতো বোন: না ঠিক, এমন বোকা আমি।

সেজমেয়ে: বোকা তুমি নও। দুল দুটো পরলে নিজেকে খুব সুন্দর দেখায় জানো কিনা তাই আমি যেই দুলদুটো নিয়ে এলাম, অমনি ফন্দি এঁটে দিদির কানবালা নিয়ে পরলে, যাতে আরও সুন্দর দেখায়। ফর্সা রঙের অহঙ্কারে ফেটে পড়ছো, বোকা হতে যাবে কোন্ দুঃখে?

পিসতুতো বোন: আমার রঙটা তো ফ্যাকাসে সাদা ভাই, তোর মতো দুধে আলতা তো নয় ভাই? কানবালা খুলে ফেলব?

বাড়ির একটি বিশেষ শ্রেণীর আশ্রিতাদের সঙ্গে যশোদাকে খাইতে বসানো হইল, দাসী চাকরাণী নয়, সত্যপ্রিয়র সঙ্গে সত্যই তাদের সম্পর্ক আছে, তারা আত্মীয়া। তবে, সত্যপ্রিয়র মেয়ে আর বৌরা যে যশোদাকে একেবারে খাতির করিল না তা নয়, একটু দূরে দাঁড়াইয়া যশোদা আর যশোদার খাওয়া চাহিয়া দেখিয়া তাদের কি ফিস্‌ফাস্ কথা আর চাপা হাসি। সুবর্ণ বোধ হয় অন্য ঘরে খাইতে বসিয়াছিল।

পিসতুতো বোনের সঙ্গে কলহের পর সেজমেয়ের মনটা ভাল ছিল, কে

একজন যশোদার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। যশোদা তখন বড় বড় লেডিকিনি মুখে তুলিতেছিল। খাওয়া বন্ধ করিয়া সে বলিল, 'এই ছুঁড়ি এদিকে শোন্।'

মেয়েদের হাসিগল্পের গুঞ্জন থামিয়া গেল, সেজমেয়ে কয়েক পা' আগাইয়া আসিয়া মুখ লাল করিয়া বলিল, 'তোমার তো আস্পদ্দা কম নয়!'

'তোমারি বা কম কি দিদি? আমায় নেমন্তন্ন করে এনেছ, বয়সে আমি তোমার মা মাসীর সমান, আমার খাওয়া দেখে কি বলে তুমি হাসলে? এরকম যে হাসতে নেই, ছোটলোকের বাড়ির মেয়েরও সেটুকু শিক্ষে আছে।'

'আমায় তুমি ছোটলোকের মেয়ে বললে! দাঁড়াও, বাবাকে বলে তোমায় মজা দেখাচ্ছি।' সেজমেয়ে ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল।

যশোদা খাইয়া উঠিয়া বাড়ির পিছনের বারান্দায় সত্যপ্রিয়র স্ত্রীর কাছে একটু বসিল। রাত প্রায় এগারটা বাজে, জ্যোতির্ময়ের বাড়ির সকলে কোথায় যে উধাও হইয়া গিয়াছে! একসঙ্গে ফেরা যাইত।

সত্যপ্রিয়র স্ত্রী বড় শান্ত ও নিরীহ মানুষ, কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলিয়া যশোদা এটা টের পাইয়াছিল। সব সময়েই কেমন যেন ভ্যাবাচেকা লাগিয়া আছে।

'মেয়ে নাকি কি বলেছে আপনাকে?'

'কি আবার বলবে? ছেলেমানুষ, ওর কথার ভারি দাম!'—যশোদা একটু হাসিল।

'আপনি রাগ করবেন না, ছেলেমেয়েগুলো আমার বড় বেয়াড়া। বলুন রাগ করবেন না?' বলিয়া সত্যপ্রিয়র স্ত্রী যশোদার হাত ধরিল। ইস্, এইজন্য সে এখানে একা বসিয়া আছে, বাড়ির গিন্নী সে! ধনীর গৃহিণীতে পরিণত হইতে না পারায় স্বামী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী কারও সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারায় একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের একটা মানসিক বিকারের অবাস্তব জগতে ভাসিয়া গিয়াছে, সকলের অপরাধে নিজেকে যেখানে সে অপরাধী মনে করে, তার হাত

ধরিয়া ক্ষমা চায়।

কিছুক্ষণ পরে সত্যপ্রিয় আসিল।

'খাওয়া হয়েছে ? বড় রাত হয়ে গেল। গাড়ি বলে দিয়েছি।'

'গাড়ি কি হবে ? এইটুকু পথ হেঁটেই চলে যাব।'

কিন্তু তা হয় না, যশোদা যে সত্যপ্রিয়র অতিথি। পথ যতটুকুই হোক, রাত্রিকাল, স্ত্রীলোক, হাঁটিয়া যাওয়া চলে ?

যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, 'জ্যোতির্ময়বাবুর বাড়ির সবাই কি চলে গেছে ?'

'আধ ঘণ্টা আগে। আমিই বললাম জ্যোতির্ময়বাবুকে, একটু পরে তোমাকে পাঠিয়ে দেব তোমার ভায়ের সঙ্গে। গাড়িটা একটু আটকা ছিল। তা তোমার ভাইকে তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না যশোদা।'

'সে তবে আগেই চলে গেছে। কেত্তন করলে ওর শরীর বড় দুর্বল লাগে।'

সত্যপ্রিয় নিজেই সঙ্গে করিয়া যশোদাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। বোধ হয় সেদিন নন্দকে যে অপমান করা হইয়াছিল, আজ সুদে আসলে নন্দর দিদিকে সম্মান দিয়া তার ক্ষতিপূরণ হইতেছে। যশোদা ভাবিল, কি মতলব আঁটছ তুমি কে জানে! সত্যপ্রিয়কে একটু বেশী গম্ভীর ও অন্যমনস্ক মনে হইতেছিল। যশোদাকে আরেকদিন আসিবার জন্য অনুরোধ করিল।

'শুনলাম বেয়াদবির জন্য মেয়েকে নাকি ধমক দিয়েছ। আমার কাছে নালিশ করতে এসেছিল, আমিও ধমক দিয়েছি। তবু আমার বাড়িতে আমার মেয়েকে অমন করে বলবার সাহস কারও হতে পারে, ভাবতেও পারি নি যশোদা।'

'ছেলেমানুষের দোষ দেখিয়ে দেব, তাতে আর সাহসের কি আছে!'

সত্যপ্রিয় হঠাৎ যেন বড় সরল হইয়া গিয়াছে, যশোদার সঙ্গে যেন তার অনেকদিনের পরিচয়। ম্লানমুখে একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি জান না যশোদা, আমার চাকরবাকরের দোষ দেখিয়ে দেবার সাহস পর্যন্ত অনেকের হয় না। যাদের কোনোদিন একটি পয়সা পাবার ভরসা নেই

যারা চায়ও না একটি পয়সা, তারা পর্যন্ত ভয়ে মরে আমি পাছে চটে যাই।'

একথার জবাবে যশোদা কিছু বলিল না। প্রত্যাশা না থাকে, সত্যপ্রিয় চটিলে যে ভয়ের কারণ আছে এটুকু সেও বোঝে। টাকা অনেক কিছু করিতে পারে। তার বাড়ির কাছেই এমন দু'একজন মানুষ বাস করে যাদের হাতে মোটে শ'খানেক টাকা গুঁজিয়া দিলে একদিন এই সত্য প্রিয়র মাথাটা ফাটাইয়া কয়েক মাস জেল খাটিয়া আসিতে রাজী হইয়া যাইবে। টাকার পরিমাণটা বেশী করিলে একেবারে খুন করিয়া ফাঁসি-কাঠে ঝুলিবার ঝুঁকিটা নিতেও হয়তো রাজী হইয়া যাইতে পারে। এরা সব নীচুস্তরের জীব, কিন্তু উঁচুস্তরেও এমন কত জীব আছে, যারা এদেরই রকমফের, হাতে কিছু টাকা গুঁজিয়া দিলে যারা খুন না করিয়াও মানুষের এমন সর্বনাশ করিতে পারে, যা খুন করারও বাড়া। এমন শক্তি যে টাকার, সত্যপ্রিয় সেই টাকা গাদা করিয়াছে। প্রত্যাশা যারা করে না, তারাও তাকে ভয় করবে বৈ কি। তা'ছাড়া, প্রত্যাশা করা না করার প্রশ্নই কেবল নয়, গেরুয়া কাপড় দেখিলেই ধর্মভীরু গৃহস্থের যেমন পায়ে লুটাইতে ইচ্ছা হয়, বড়লোককে ভয় আর খাতির করা সেইরকম একটা সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে মানুষের।

পরদিন দুপুরবেলা কীর্তনের অবসাদে নন্দ ঝিমাইতেছে, কোথা হইতে স্থবর্ণ আসিয়া হাজির।

'একটু কীর্তন গাইবে? একটুখানি?'

উত্তেজনা সে যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে-মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যশোদা যে ঘরের অন্যদিকে চৌকিতে বসিয়া জামা সেলাই করিতেছিল, তার চোখে পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। একটা ঘরে ঢুকিয়া সেই ঘরেই যশোদার মতো একটি মানুষকে চোখে না পড়ার মতো অবস্থা, আবেগ একটু বেশীরকম উথলাইয়া না উঠিলে হওয়া সম্ভব নয়।

নন্দ মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'এমনি তো হয় না, মানে, আয়োজন

চাই কি না অনেক, আর অনেকক্ষণ ধরে না গাইলে—'

এ বাড়িতে স্থবর্ণের আসাটাই খাপছাড়া ব্যাপার, তাও এমন অসময়ে কাল নন্দর কীর্তন শুনিয়া তার কি রকম লাগিয়াছিল নন্দকে জানাইবার জন্য সে ছটফট করিতেছিল, সবুর সয় নাই। নতুবা জানাইবার স্থযোগের অভাব তার হইত না, নন্দই হয়তো আজকালের মধ্যে তাদের বাড়ি যাইত।—'কীর্তন যে এমন হয়, আমি সত্যি জানতাম না, কাল শুনতে শুনতে আমার যে কি রকম হচ্ছিল—'

যশোদা মনে মনে বলে, 'রকম ছাখো ছুঁড়ির, ও রকম তো তোর সব সময়েই হচ্ছে।'

মুখে অবশ্য ভদ্রতা করিতে হয়, এ ধরনের ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য গালে চড় কশাইয়া দিবার নিয়ম নাই। বড় জোর গম্ভীর মুখে, কড়া স্থরে এদিকে আসিয়া বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করা চলে যে, ব্যাপারখানা কি। কিন্তু তাতে কি এসব মেয়ের মাথা ঠাণ্ডা হয়?

'তুমি শুনেছ যশোদাদিদি? কাল শুনেছ কীর্তন? ও, হ্যাঁ, তুমি তো কাল গিয়েছিলে নেমন্তন্ন খেতে। কীর্তন শুনে কাল বাড়ি ফিরে বৌদি কাঁদছিল। ঘরে নয়, সবাই ঘুমোবার পর সিঁড়িতে বসে। আমি জিজ্ঞেস করতে বললে, কীর্তন শুনে এমন মন কেমন করছে ছোট্ ঠাকুরঝি!—বৌদি আমায় ছোট ঠাকুরঝি বলে।'

'সবাই ঘুমোবার পর তুমি বুঝি জেগে ছিলে?'

'হ্যাঁ, কিছুতেই ঘুম আসছিল না কাল।'

'চান কর নি আজ?'

'না, গায়ে জল লাগলেই এমন ছ্যাক্ ছ্যাক্ করে উঠছিল যশোদাদিদি। ঐ যা, আসল কথাই ভুলে গেছি। বৌদি তোমায় একবার যেতে বলেছে, বড্ড দরকার।'

'চলো তবে, এখুনি শুনে আসি দরকারটা কি।'

ছেলেমানুষ। রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। জ্বরও বোধহয় আসিয়াছে। চোখ দেখিলে মনে হয়, কোনো পাগলা-গারদ হইতে যেন পলাইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেলাই রাখিয়া যশোদা উঠিয়া পড়ে। বাড়ি

নিয়া গিয়া সর্বাগ্রে নিজের হাতে লেবু দিয়া বড় এক গ্লাস শরবত বানাইয়া মেয়েটাকে খাওয়াইবে, তারপর অন্য কথা।

কিন্তু স্থবর্ণ নড়িতে চায় না।—'তুমি, যাও না যশোদাদিদি, আমি যাচ্ছি একটু পরে।'

'না, আমার সঙ্গে এসো। এখানে কি করবে তুমি?'

'একটু কীর্তন শুনব।' নন্দর দিকে চাহিয়া মিনতি করিয়া বলে, 'জোরে না গাও, গুন্‌গুন্ করে একটু গাও না? সেই যেখানটা গাইতে গাইতে কাল তুমি কাঁদছিলে, সেখানটা।'

যশোদা আর কথা না বলিয়া সোজাসুজি স্থবর্ণের ডান হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিয়া তাকে একরকম গায়ের জোরে টানিয়াই সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়। আর ভদ্রতা করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কে বলিতে পারে কখন মেয়েটা মেঝেতে চিত হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে মুখে ফেনা তুলিতে আরম্ভ করিয়া দিবে? কেবল লেবুর শরবত নয়, যাওয়ার সময় দু'পয়সার বরফও কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে কিষেণের দোকান হইতে। স্থবর্ণের মাথাটাও ধোয়াইয়া দিবে বাড়ি গিয়াই।

'হাত ছাড় যশোদাদিদি—উঃ রে বাবারে, হাতটা ভেঙে ফেলবে নাকি তুমি আমার?'

বাড়ির বাহির হইয়া যশোদা হাত ছাড়িয়া দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে স্থবর্ণ তার সঙ্গে চলিল আর বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল অস্ফুটস্বরে সে-ই জানে।

'কেঁদো না স্থবর্ণ। রাস্তায় যদি কাঁদো ঠাস করে গালে চড় বসিয়ে দেব বলে রাখছি।

শুনিয়া স্থবর্ণের কান্না ও বিড়বিড়ানি দুই-ই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। বরফ কেনার সময় ক্ষীণকণ্ঠে সে একবার জিজ্ঞাসা করিল বটে, 'বরফ কিনছ কেন যশোদাদিদি?—যশোদা জবাবও দিল না!

জ্যোতির্ময়ের বাড়ি গিয়া গলা নরম করিয়া যশোদা বলিল, 'তোমার যে অসুখ হয়েছে বোন, জ্বর হয়েছে। মাথাটা ধুয়ে দিই এসো, তারপর

তুমি শুয়ে পড়গে যাও। বরফ দিয়ে আমি সুন্দর শরবত বানিয়ে দিচ্ছি, খেলেই তোমার জ্বর কমে যাবে।'

মিষ্টি কথা শোনামাত্র সুবর্ণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমার অসুখ হয়েছে আর তুমি আমায় এমন করে মারলে যশোদাদিদি!...'

সুবর্ণের ব্যবস্থা করিয়া জ্যোতির্ময়ের ঘরে বসিয়া ভদ্রলোকের বিজ্ঞাপন দেওয়া খাপছাড়া দরদের কথা যশোদার মনে হইতে থাকে। বেশ সাজানো ঘরখানা, আসবাবপত্র একটু বেশীরকম ঠাসা। একঘরে খাট, ড্রেসিং টেবিল, লেখাপড়ার জন্য মাঝারি আকারের একটি টেবিল ও চেয়ার, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, অর্গ্যান, আলনা ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিস ভর্তি করায় নড়াচড়ার স্থানাভাব ঘটিয়েছে। অধিকাংশ আসবাবই জ্যোতির্ময় ভালবাসিয়া কিনিয়া দিয়াছে, অর্গ্যানটি তো মাত্র ক'মাস আগে কেনা।

'ভাল কি গাইতে জানি? তবু কিনে দিলেন।—অপরাজিতা সলজ্জ আনন্দে যশোদাকে জানায়। সুবর্ণকে কিনিয়া দেওয়ার বদলে স্ত্রীর নামে সংগীত-যন্ত্রটি কেনায় বাড়িতে যে কথা হইয়াছিল, যশোদার কানে তাহা আগেই পৌঁছিয়াছে। জ্যোতির্ময়কে যশোদা মোটামুটি চেনে তাই এমন একটা সহজ সাংসারিক চালে তার ভুল হওয়ায় সে আশ্চর্য হয় নাই। দু'দিন পরে যে বোন বিবাহ হইয়া শ্বশুরবাড়ি চলিয়া যাইবে, তার নাম করিয়া ওটা কিনিলেই কোনো গোল হইত না! কিন্তু সেটা জ্যোতির্ময়ের খেয়াল হয় নাই। বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে অর্গ্যানটি দিতে হইতে পারে, এ আশঙ্কা অবশ্য একটু ছিল। কিন্তু সেও তো জ্যোতির্ময়েরই হাত। যার নামেই কেনা হোক মেয়ে দেখিতে আসিলে এই অর্গ্যান বাজাইয়া সুবর্ণকে গান একটু শুনাইতেই হইবে, অর্গ্যানটি কার সম্পত্তি, বরপক্ষ তখন সে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিবে, তখন বলিলেই হইবে এটি জ্যোতির্ময়ের স্ত্রীর জিনিস। তাছাড়া, বরপক্ষ যদি অর্গ্যান একটা দাবি করে, নাছোড়-বান্দা হইয়া দাবি করে, স্ত্রীর নামে কেনা হইয়াছে বলিয়াই এটি দান না করিয়া জ্যোতির্ময় কি পারিবে? আরেকটু সস্তা দামের অন্য একটা অবশ্য—

ভদ্রলোকের অন্দরমহলে আসিলেই যশোদার চুল ধরে আর এই ধরনের চিন্তা মনে গিজ্ গিজ করিতে থাকে। তবে অপরাজিতা আজ যে সব কথা বলিতেছিল কানে যাওয়ার পর সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিল।

'ওমা, এসব কি কথা বলছ বৌ ?'

বলিবার যে খুব বেশী প্রয়োজন ছিল অপরাজিতার তা নয়, তার চেহারা দেখিয়া মুখচোখ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় ভিতরের কিছু গোলমাল হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাটা যে এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও কি তা অনুমান করিতে পারিয়াছিল ?

ভয়ে অপরাজিতার মুখ ছাইবর্ণ হইয়া গেল। 'খুব খারাপ নাকি দিদি ?'

যশোদা তাড়াতাড়ি অভয় দিয়া বলিল, 'খারাপ তো কিছুই ছিল না বৌ, শরীরটা এমনি খুব দুর্বল করে ফেলেছে কিনা, তাই যা একটু ভয়। ওনাকে বল নি ?'

'কখন বলি ?'

তাওতো বটে, উপহারে আসবাবে যে ঘর ভরিয়া দেয়, প্রত্যেক রাত্রি যার পাশে শুইয়া কাটে, এতবড় বিপদের কথাটা তাকে বলিবার তোমার সুযোগ কোথায়! প্রথমটা যশোদার বড় রাগ হয়, মনে হয়, এমন ন্যাকামি করা যাদের স্বভাব চুলোয় যাক তারা, কাজ নেই তাদের কথায় থাকিয়া। কিন্তু অপরাজিতার শীর্ণ বিবর্ণ মুখে ভাসা ভাসা ভয়ার্ত চোখের চাউনি দেখিয়া মনটা আবার গলিয়া যায়।

'তা বললে তো চলবে না বোন। ওনাকে বলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে তো ?'

অনেক বুঝাইয়া, অনেক পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া যশোদা বাড়ি ফিরিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে যে, বেশী বয়সে বিয়ে করা বৌকে কি লোকে এতই বেশী ভালবাসে ? এমনভাবে সীমা ছাড়াইয়া যায় সেই ভালবাসা যে, বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে থাকিলেও খেয়াল পর্যন্ত হয় না খাপছাড়া কিছু ঘটিতেছে ? সুশ্রী ও কচি মুখখানা আর সুগঠিত ও কোমল দেহখানা দেখিয়া বৌটার জন্য যদি দরদ জাগিয়া থাকে জ্যোতির্ময়ের বুকে, সে দরদ কেন তাকে

এখন বলিয়া দেয় না, সে শ্রীও নাই, সে লাবণ্যও আর নাই ? বৌটাও বা এমন হাবা কেন, স্বামীকে অসুখের কথা বলিতে লজ্জা পায় ? ভদ্র স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার খেলা এই রকম ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলে নাকি ? ভাগ্যে সংসারে সকলে ভদ্র নয় !

হাসপাতাল হইতে ধনঞ্জয় ফিরিয়া আসিয়াছে।

ডান পা'টি হাঁটুর নিচ হইতে বাদ গিয়াছে। এখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তবে ঘা শুকাইয়া আসিয়াছে। আরও কিছুদিন পরে কাঠের পা লাগানো চলিবে।

'কি পাপে আমার এমন দশা হল যশোদা ?'

পাপ ? পাপের কথা না ভাবাই ভাল। সবই ভগবানের ইচ্ছা। ভগবান যা করেন মানুষের বুঝিবার উপায় আছে কি কেন করেন ? সহ্য করা ছাড়া মানুষের আর উপায় নাই।

'প্রাণে যে বেঁচে গিয়েছি—'

'এর চেয়ে মরাই ভাল ছিল।'

ধনঞ্জয় মরে নাই, আধমরা হয়ে গিয়াছে। এ শরীরে আগে জোয়ার ভাঁটা টের পাওয়া যাইত না, এখন যেন ভাঁটার সময় কালীঘাটের কাছে আদি গঙ্গার যে অবস্থা যশোদা অনেকবার দেখিয়া আসিয়াছে, সেই রকম হইয়া গিয়াছে ধনঞ্জয়ের চেহারা।

'দেশে খবর দেবে না ?'

ধনঞ্জয় ভাবে, অকর্মণ্য হইয়া সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াছে, যশোদা তাই তাড়াতাড়ি দেশে খবর দিয়া তাকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখ বাঁকাইয়া সে বলে, 'তাড়াবার জন্য তর সইছে না চাঁদের মা ? ধন্য তোমরা শহুরে মানুষ ! তুমি বললে সুধীরের সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে কাজ শেখো গে যাও, তোমার জন্য আমার এই সর্বনাশ হল, আর তুমিই আমাকে—'

ধনঞ্জয়ের চোখে জল আসিয়া পড়ে। এত বড় অপবাদের জবাবে যশোদা শান্তভাবে শুধু জানায় যে তাড়ানো দূরে থাক, ধনঞ্জয় এখন যাইতে

চাহিলে যশোদা তাকে যাইতে দিবে না কি ? ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক এইখানেই এখন ধনঞ্জয়কে থাকিতে হইবে কিছুকাল, পায়ের ঘা শুকাইয়া যতদিন কাঠের পায়ের ব্যবস্থা না হয়। তারপর সে যদি দেশে যাইতে চায় দেশে চলিয়া যাইবে। আর যদি এখানে কোনো কাজকর্ম করিতে চায়, তাও হয় তো যশোদা ঠিক করিয়া দিতে পারিবে।

'কাজ ? আর কি আমি কাজ করতে পারব যশোদা ?'

'কেন পারবে না ? কাঠের পা নিয়ে লোকে রোজগার করে খাচ্ছে না ? দেশে খবর দেবার কথা বলছিলাম, কাউকে যদি তুমি দেখতে চাও ?'

কে আর আছে দেশে ধনঞ্জয়ের, কাকেই বা সে দেখিতে চাহিবে। এখন আর খবর দিয়া কাজ নাই, ভাল হইয়া রোজগারপাতি করার মতো সুদিন যদি কখনও ধনঞ্জয়ের আসে—

'আমার দেনাটাও তখন আস্তে আস্তে শোধ করে দিতে পারবে।'

যশোদার আর সব ভাল, মিষ্টি করিয়া কথা বলিতেও সে জানে, কেবল মাঝে মাঝে এই রকম এক একটা কথা বলিয়া এমন সে প্রাণে আঘাত দেয় মানুষের ! এমন প্রাণে আঘাত পাইলেও যশোদার আশ্রয়ে যশোদার অন্নে প্রাণধারণ করিয়া থাকিতে থাকিতে কয়েকদিন পরে যশোদার এই কথা মনে করিয়াই লজ্জাটা যে তার কম হইবে, প্রাণে একটু স্বস্তি বোধ করিবে, এসব অবশ্য ধনঞ্জয়ের খেয়াল হয় না। সামান্য একটু সাময়িক মনঃকষ্ট দিয়া অনেক দিনের অনেক বেশী মনঃকষ্ট নিবারণের এসব উপায়ের সঙ্গে তার পরিচয় নাই—ক'জন মানুষেরই বা থাকে !

সুধীর প্রথমটা ধনঞ্জয়ের কাছে ভেড়ে নাই। ধনঞ্জয় হাসপাতাল হইতে বাড়িতে আসিয়াছে, দু'তিন দিন এটা তার অজানাই রহিয়া গেল। তারপর একদিন সকালবেলা কাজে যাওয়ার আগে মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য আনিয়া আস্তে আস্তে সে ধনঞ্জয়ের ঘরে গেল।

'কেমন আছ ধনা'দা ? খাও, বিড়ি খাও একটা।'

ধনঞ্জয় বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিল। সুধীরের দেওয়া বিড়িটা ধরাইয়া সে বলিল, 'বোসো দিকি ভাই এখেনে, তোমাকে একটা কথা সুধোই পষ্ট করে। যা হবার তা তো হ'ল, সব আমার অদৃষ্টের দোষ, গোলমাল

টোলমাল আমি আর করব না, মা কালীর দিব্যি। গাড়িটা কে ঠেলে দিয়েছিল বল দিকিন?

শুনিতে শুনিতে সুধীরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।—'কে ঠেলে দেবে, কেউ ঠেলে দেয় নি।—বড়বাবু নিজে এসে সবাইকে জিজ্ঞেস করে রিপোর্ট দিলে—'

'সে তো জানি, তুমি নিজে ছাখো নি কিছু?'

সুধীর রাগিয়া বলিল, 'কি বললে? আমি দেখেছি? দেখেও চুপ মেরে আছি? আমি মিথ্যুক? বড়বাবু নিজে এসে—'

হয়তো একটা কলহ বাধিয়া যাইত দু'জনের মধ্যে, যশোদা আসিয়া পড়ায় সেটা আর ঘটিতে পারিল না।

যশোদা রাগ করিয়া সুধীরকে বলিল, 'কাজে যাও তো তুমি। কেমন ধারা মানুষ তুমি, রোগা মানুষটার সঙ্গে ঝগড়া করছ? যাও, এখুনি চলে যাও, একটি কথা নয় আর।'

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সুধীরের কলহ হইয়া গেলেও বোধ হয় এর চেয়ে ভাল ছিল। সোজাসুজি কলহবিবাদের ঝাঁঝ কতক্ষণ মানুষের মনে থাকে? যশোদা আসিয়া এমন করিয়া বলায় সুধীরের মনে যে জ্বালা ধরিয়া গেল তার ঝাঁঝ সহজে মিটিবার নয়। তার জন্য দরদ ছিল যশোদার মনে, ধনঞ্জয় আসিয়া সে দরদ সাফ করিয়াছিল। এখনও, ধনঞ্জয়ের ঠ্যাং কাটা যাওয়ার পরেও, এই ধনঞ্জয়কেই যশোদা দরদ করিবে? সে তুচ্ছ হইয়া থাকিবে?

কেন এমন হইল? কেন যশোদা তাকে আর পছন্দ করে না?

যশোদা ধনঞ্জয়ের সেবা করে, তাকে বাটিভরা দুধ খাওয়ায়, না বলিতে দরকার মতো তাকে বিড়ি পর্যন্ত কিনিয়া দেয়। অসুখে বিসুখে আরও দু'একজনকে এ বাড়িতে সুধীর শয্যাগত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সে নিজেও একবার অসুখে ভুগিয়াছিল, তখন যশোদা যেমন সেবাকরিয়াছিল ধনঞ্জয়ের সেবা করার সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাত। অবশ্য সমস্ত কাজ যেন যশোদার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, অন্য সকলের সুবিধা অসুবিধার জন্য তার যেন আগের মতো ভাবনা নাই, ধনঞ্জয়ের সুখ-

সুবিধার ব্যবস্থা করাটাই যেন তার এখন একমাত্র কর্তব্য, সব সময় সে যেন কেবল ধনঞ্জয়ের কথাই ভাবে, ধনঞ্জয়ের ডাক শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে। অন্তত দেখিয়া শুনিয়া সুধীরের তাই মনে হয়। দেখা-শোনাটা সারাদিন চলে না, সুধীরকে কাজে যাইতে হয়। কিন্তু কল্পনা তো আছে সুধীরের, কাজে যাওয়ার আগে আর কাজে যাওয়ার পরে সে যতটুকু দেখে আর শোনে, ওয়াগনে মাল বোঝাই দিতে দিতে তারই ভিত্তিতে স অহর্নিশি যশোদার আত্মবিস্মৃত সেবাযত্নের এমন কল্পনা গড়িয়া তোলে যে সত্য সত্যই সেই অনুপাতে ধনঞ্জয়ের সেবা করিয়া থাকিলে দু'চার দিনের মধ্যে যশোদাও শয্যা গ্রহণ করিত আর তার নিজেরই দরকার হইত সেবার। এই সব দুর্ভাবনায় অন্যমনস্ক হইয়া রাজেনের গালাগালিতে সুধীরের প্রাণান্ত হয়। সুদীর্ঘ সরীসৃপের মতো লম্বা মালগাড়ির একপ্রান্তে ইঞ্জিন আসিয়া ঠেকিলে ওয়াগনের সঙ্গে ওয়াগনের ধাক্কায় যে শব্দ ওঠে তাতে সে চমকাইয়া ওঠে। না, এর চেয়ে তার একটা পা কাটা গেলে যেন ভাল ছিল! অথবা পা কাটার বদলে ধনঞ্জয় যদি একেবারে মরিয়া যাইত। ধনঞ্জয় অবশ্য এখনও মরিতে পারে,—কিন্তু লোকটার মরা-বাঁচার ভার কি ভগবান সুধীরের হাতে ছাড়িয়া দিবেন একদিন এক মুহূর্তের জন্য, সেদিন তাকে আলগা ওয়াগনটার পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া হঠাৎ সুধীরের মাথায় ওয়াগনটা ঠেলিয়া দিবার বুদ্ধি যেমন যোগাইয়া দিয়াছিলেন?

এই চিন্তাটা মাথায় আসিলে সুধীরের মুখের ভাব এমন হয় যে বকিতে গিয়া রাজেন পর্যন্ত তাকে কিছু বলিতে সাহস পায় না কথাগুলি গিলিয়া ফেলে।

বাড়ি ছাড়িয়া কাজে আসিতে সুধীরের ভাল লাগে না, নানা ছুতায় সে বাড়িতে বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করে। কাজে যাইবে না কেন, কি হইয়াছে সুধীরের? অসুখ হইয়াছে,—পেট ব্যথা করিতেছে। বেশ, তবে আর এবেলা সুধীরের কিছু খাইয়া কাজ নাই।

'তোমার ব্যাপারখানা কিছু ধরতে পারছি না সুধীর। কাজে নাকি ফাঁকি দিচ্ছ আর মেজাজ দেখাচ্ছ, রাজেন বললে। এ তো ভাল কথা নয়? এ

কাজটা যদি যায় তোমার, আর কাজ আমি জুটিয়ে দিতে পারব না বলে রাখছি।'

'না দিলে কাজ জুটিয়ে, কাজ করব না।'

খাইয়া দাইয়া দেরি করিয়া স্থধীর সেদিন কাজে গেল বটে, মাঝরাত্রে ফিরিয়া আসিল মাতাল হইয়া। আসিয়া এমন মাতলামিই সে আরম্ভ করিয়া দিল, শুধু মদ খাইয়া মাতাল হইয়া যেটা কোনো মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব নয়। কুড়ি বাইশজন কুলিমজুরকে বাড়িতে রাখিয়াও যশোদা তার বাড়িকে এতদিন ঠিক বস্তির পর্যায়ে নামিতে দেয় নাই, স্থধীর একাই সেই কাজটা করিয়া দিল।

সকলে ভাবিয়াছিল পরদিন যশোদা বোধ হয় তাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু যশোদা কিছুই বলিল না। বলার খুব বেশী স্থযোগ সে পাইল না, কারণ পরদিন কারও কাছে কিছু না বলিয়া স্থধীর উধাও হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিল তিন দিন পরে।

তখনও যশোদা তাকে কিছু বলিল না।

কদিন বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া স্থধীরের বোধ হয় হাওয়া পরিবর্তনের কাজ হইয়াছিল সেই সঙ্গে মতেরও বোধ হয় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। চোরের মতো পলাইয়া গিয়াছিল যশোদার ভয়ে, ফিরিয়া আসিল যেন লাটসাহেব হইয়া। ভয় নাই, অনুতাপ নাই, মুখ ভার করিয়া থাকা নাই, এ জগতে কাউকে সে গ্রাহ্যও করে না। কৈফিয়ত হিসাবে নয়, নেহাত যেন দয়া করিয়াই যশোদাকে হঠাৎ উধাও হওয়ার কারণটা জানাইয়া দিল।

'মনটা ভাল ছিল না চাঁদের মা, তাই একবার একটু ঘুরে এলাম।'

যশোদা বলিল, 'বেশ করেছ। রাজেনকে বলে দিয়েছি, এবার কিছু বলবে না, আর কিন্তু এরকম পাগলামী কোরো না কখনো।'

'তোমার জন্যেই তো। তুমি আমার সঙ্গে ওরকম কর কেন?'

যশোদা কথা বলে না। স্থধীরের সম্বন্ধে কি করা দরকার এখনও সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

স্থধীর বলিতে থাকে, 'জানো চাঁদের মা, সেই যে সেদিন তুমি মুখে

বললে আমি ভাত পাব না, কিন্তু পাছে ভাতটি না খেয়ে যাই তাই জন্যে নিজে তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে, সেদিন টের পেয়েছি সংসারে টাকা বল, রূপ-যৌবন বল, দরদ ছাড়া সুখ নেই মানুষের।'

যশোদা রীতিমতো বিব্রত হইয়া বলে, 'অ! সেদিন টের পেয়েছ।'

আবেগের মাথায় সুধীর বলিয়া বসে, 'তুমি বললে তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি চাঁদের মা।'

'প্রাণ তোমাকে দিতে হবে না, নদের চাঁদের বৌটা জ্বরে ভুগছে, ওকে একটু ওষুদ এনে দাও দিকি?'

খানিক পরে খবর আনিতে গিয়া যশোদা দেখিল ঔষধ আনা হইয়াছে কিন্তু খাওয়ানো হয় নাই। বিছানায় চাঁপার মা কোঁকাইতেছে, ঘরের কোণে চাঁপা আর সুধীর মশগুল হইয়া আলাপ করিতেছে।

চাঁপা বলিল, 'ওষুধটা কবার খাওয়ার বুঝে নিচ্ছিলাম দিদি।'

'ওষুদটা খাইয়ে গল্প কর চাঁপা।' বলিয়া যশোদা চলিয়া আসিল।

তারপর হইতে সুধীরকে চাঁপার যেন সর্বদাই দরকার হইতে লাগিল। দু'বেলা ডাকিয়া পাঠায়, নিজে আসিয়া সুধীরের সঙ্গে গুজ্‌গাজ্‌ ফিস্‌-ফাস্‌ করে, কি যেন একটা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে দু'জনে। ও-বাড়িতে গেলেই যশোদা দু'জনকে একসঙ্গে দেখিতে পায়। দু'একবার কালোকেও তাদের সঙ্গে দেখা গেল, তিনজনে হাসিগল্প করিতেছে। কথা বেশী বলিতেছে সুধীর, হাসি চাঁপাই হাসিতেছে বেশী, কালো হাঁ করিয়া শুনিতেছে। যশোদা ওদের এড়াইয়া চলিতে লাগিল, চাঁপা যদি জগৎকে ছাড়িয়া সুধীরের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে যশোদার কিছু বলিবার নাই। নিজের ভালমন্দ চাঁপা ভাল করিয়াই বোঝে। চাঁপার জন্য সুধীরের দরদ জাগিয়া তার জন্য দরদটা যদি একটু কমে তাহা হইলেই যশোদা এখন বাঁচে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, যশোদাকে উপেক্ষা করার লক্ষণ সুধীরের দেখা গেল না। কয়েকদিনের মধ্যে চাঁপার সম্বন্ধে তার একান্ত উদাসীনতা দেখা গেল, চাঁপা ডাকিলে সব সময় সে যাইতে চায় না। কেবল চাঁপা যখন কালোকে পাঠাইয়া, তাকে বিশেষ দরকারে ডাকিয়া পাঠায়,

তখন কালোর সঙ্গে যে মুখ গম্ভীর করিয়া শুনিয়া আসিতে যায় দরকারটা কি এবং গিয়াই ফিরিয়া আসে অল্পক্ষণের মধ্যে। ধীরে ধীরে আবার যেন তার আগেকার অস্থিরতা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ধনঞ্জয় আর যশোদাকে একসঙ্গে দেখিলেই কোথা হইতে সে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিছুতেই আর নড়িতে চায় না। যশোদাকে একা পাইলে কাছে বসিয়া আবোল-তাবোল গল্প জুড়িয়া দেয়, ধনঞ্জয়ের যত পারে নিন্দা করে, তার জানা একটি স্ত্রীলোকের উপর ধনঞ্জয়ের কি গভীর অনুরাগ ছিল সেই গল্প ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া এমন করিয়া বলে যে কথাটা সত্য না মিথ্যা জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন হয় না।

তারপর একদিন সুধীর বলে কি, 'একটা কথা বলি শোন চাঁদের মা। শুনে রাগ কোরো না কিন্তু। আমার কোনো কু-মতলব নেই আগেই বলে রাখছি তোমাকে।'

'তুমি মস্ত সাধুপুরুষ। শুনি কথাটা।'

আর তো সুধীর থাকিতে পারে না যশোদাকে ছাড়া, সে যে পাগল হইয়া গেল যশোদার জন্য তা কি যশোদা দেখিতে পায় না? এমনভাবে আর কতদিন চলিবে? তারচেয়ে এখানকার বাড়িঘর বিক্রয় করিয়া যশোদা চলুক না তার সঙ্গে দূরদেশে, যেখানে তারা দু'জনে ঘর বাঁধিয়া পরম সুখে থাকিতে পারিবে?—'তুমি ভাবছ আমার চেয়ে বয়সে তোমার দু'এক বছর বেশী, চেহারাটা তোমার জবরদস্ত, তোমার জন্য আমার মন কাঁদতে পারে না, বাড়ি বিক্রির টাকার 'পরে আমার লোভ? আগেই তো বলেছি তোমাকে, আমার কোনো কু-মতলব নেই। বেশ বাড়িঘর থাক তোমার, এমনিই চল তুমি আমার সঙ্গে, আমিই রোজগার করে তোমায় খাওয়াব।'

কথাটার আকস্মিকতায় যশোদা খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া থাকে, তারপর বলে, 'বটে? ফাজলামির আর পাত্তর পেলে না তুমি, তাম্‌সা জুড়েছ আমার সঙ্গে? আস্পদ্দা তো কম নয় তোমার!'

সুধীর ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, 'তাম্‌সা নয় চাঁদের মা, সত্যি তাম্‌সা নয়। মতিদা বলছিল, কেউ কোনোদিন তোমায় দরদ দেখায় নি বলে মনটা তোমার

বিগড়ে গেছে, কেউ দরদ করলেই ভাব তাম্‌সা জুড়েছে। কি করলে তোমার বিশ্বাস হবে বলো, আমি তাই করব। তুমি জান না যশোদা—'

'জানতে চাই না আমি। যাও তুমি, বেরোও আমার বাড়ি থেকে—এখুনি বেরোও। ফের যদি আমার সামনে পড়, কিলিয়ে তোমায় নিকেশ করব।'

কেবল এই কথা কয়েকটি নয়, আরও অনেক কিছু যশোদা অবশ্য তাকে বলিল, যেরকম জোরালো ঝাঁঝালো, অকথ্য কথার ফোঁড়ন না থাকিলে সুধীরের মতো মানুষের পক্ষে বোঝাই কঠিন হয় যে তাকে সত্য সত্যই তিরস্কার করা হইতেছে।

তখন দুপুরবেলা। সুধীর সেদিন কাজে যায় নাই। ফতুয়াটা গায়ে দিয়া সুধীর বাহির হইয়া গেল আর সারাটা দিন রাগে যশোদা গরগর করিল। রেল ইয়ার্ডের একটা কুলি, সে কাজটা জুটাইয়া দিয়াছে বলিয়া দু'বেলা দু'টি অন্ন জুটিতেছে, সে কিনা তাকে এমনভাবে অপমান করিতে সাহস পায়! এই কি লাভ হইয়াছে তার কুলিমজুরকে আপন করিতে গিয়া? রাগের প্রথম অবস্থাটা কাটিয়া যাইবার 'পর বড় দুঃখ হয় যশোদার, একবার চোখে জলও আসিয়া পড়ে। সুধীর কুলিমজুর বলিয়াই যশোদার এতখানি অপমান বা রাগ বা দুঃখ নয়, সুধীরের প্রেমনিবেদনের ভঙ্গীটাই তাকে বড় যন্ত্রণা দিতেছিল। দু'জনে মিলিয়া তারা পলাইয়া যাইবে এ যেন সুধীর প্রার্থনা করে নাই, যশোদাই অনেকদিন হইতে তার পায়ে ধরিয়া সাধিতেছিল, এতদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীর রাজী হইয়া গিয়াছে। সুধীরের মনের ভাব টের পাইতে যশোদার বাকী ছিল না, কদিন হইতে এই সমস্যাটাই সে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছিল, ভাবিতেছিল কি উপায়ে তার এই পাগলামি ঘুচানো যায়। একদিন পোষা কুকুরের মতো পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া সে তার ভালবাসার কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারে, এ ভয়ও যশোদার ছিল। কিন্তু এমনভাবে সোজাসুজি এমন একটা প্রস্তাব তার কাছে করিবার সাহস যে সুধীরের পক্ষে হওয়া সম্ভব, যশোদা তা কল্পনাও করে নাই?

রাত্রে রান্নার শেষে যশোদা দেখিতে পাইল, সুধীর চোরের মতো পা

টিপিয়া টিপিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে। ক্ষমা-টমা সে চাহিবে না, যশোদা তা জানে। ওসব কায়দাত্নরস্ত চালচলন এখনও এদের আয়ত্ত হয় নাই। একটু পরে সুধীর আবার চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল। দোকানে খাবার কিনিয়া খাইতে গেল বোধ হয়। মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল, পরিষ্কার করিয়া ব্যাপারটা যশোদা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিতেছিল না। এসব মানুষকে বিচার করা বড় কঠিন। এদের মতো একাধারে এমন বোকা-হাবা, পাকা, বজ্জাত, ঝানু, শিশু, কোমল, কঠোর, সাহসী, ভীরু, ভাল আর মন্দ জীব আর হয় না। সুধীরের আসল উদ্দেশ্যটা ধরিতে না পারিয়াই যশোদা বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সুধীর কি সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিল। যশোদা তার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে রাজী হইবে? এরকম একটা বিশ্বাস তার মনে জন্মিল কিসে? যশোদা ধমক দিলে যার মুখ শুকাইয়া যায়, যশোদার স্নেহ মমতার জন্য তার ব্যাকুলতা জন্মিতে পারে, যশোদার সঙ্গে পীরিত করার শখ হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এমন একটা ধারণা তার মনে আসে কি করিয়া যে যশোদা তাকে প্রশ্রয় দিবে?

কখন আবার সুধীর আসিয়া ঢুকিয়াছিল যশোদা দেখিতে পায় নাই, পরদিন সকালে ঘরের বাহিরে আসিয়া কলতলায় যশোদাকে দেখিয়াই চোরের মতো সুধীর আস্তে আস্তে পলাইয়া যায়। দোষ করিয়া গুরুজনের কাছে ছোট ছেলে যেমন করে। দেখিয়া কে বলিবে এই সেই গোঁয়ার-গোবিন্দ সুধীর, মতির হইয়া যে মিলে মারামারি করিয়াছিল, যশোদাকে কাল যে ডাক দিয়া বলিয়াছিল, চলগো যশোদা, আমরা হাত ধরাধরি করে পীরিত করতে যাই!

সারাদিন সুধীরের পাত্তা মিলিল না, সারাদিন যশোদা তারই কথা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। এক রাত্রেই যশোদার মন শান্ত হইয়া গিয়াছে; নিজের ভাবপ্রবণতার মেঘ কাটিয়া যাওয়ায় আর সুধীরের মতো গৃহসুখে বঞ্চিত অশিক্ষিত বর্বর দুর্ভাগাগুলির জন্য তার স্বাভাবিক মমতা ফিরিয়া আসায়, এবার ধীরে ধীরে সে সুধীরের পাগলামির মানে বুঝিতে পারে। কবে যেন সুধীর প্রথম টের পাইয়াছিল

সংসারে টাকা বল, রূপ-যৌবন বল, দরদ ছাড়া সুখ নাই? যশোদা যেদিন তাকে ভাত খাওয়ার সুযোগ দিতে ছল করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং দরদের দাম কষিতে তাকে শিখাইয়াছে যশোদাই। আর মতি যেন কি বলিয়াছে সুধীরকে? পুরুষের ভালবাসা না পাওয়ায় মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছে যশোদার! যশোদার কাছে দরদ চিনিয়া রূপলাবণ্যের অভাবে পুরুষের ভালবাসা না পাইয়া যশোদা মনে মনে কাঁদিতেছে জানিয়া, সুধীরের পক্ষে একথা মনে করা আশ্চর্য কি যে তার মতো জোয়ান বয়সী মানুষের ভালবাসা পাইয়া যশোদা একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

স্বস্তি বোধ করে যশোদা, মুখে একটু হাসিও তার দেখা দেয়। আহা, সুধীর তবে সত্যই দরদ দেখাইতেছিল! হাতির মতো যে যশোদাকে কেউ চায় না, তাকে সঙ্গে করিয়া পলাইতে চাহিয়া সেই একটা মস্ত ত্যাগ স্বীকার করিতেছিল। তার আসল লোভ যে শ্রীমতী যশোদার উপর, সেই রোজগার করিয়া যশোদাকে খাওয়াইবে, এই কথাটায় যশোদার বিশ্বাস জন্মানোর জন্য তাই অমন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল সুধীর।

রাত্রে রান্না করিতে করিতে যশোদা ভাবে, না, তার কুলিমজুরেরাই ভাল। এদের যদি আপন না করিবে, আপন হইবে কারা? সত্যপ্রিয়র মতো যারা বড়লোক, অথবা জ্যোতির্ময়ের মতো যারা ভদ্রলোক? বড়-লোক, ভদ্রলোক আর ছোটলোক, বিগড়াইয়া অবশ্য গিয়াছে সকলেই, তবু অভাবে যারা বিগড়াইয়া গিয়াছে তারা এখনও মানুষ আছে খানিক খানিক। আর এ অবস্থায় জীবন কাটাইয়া খানিক খানিক মানুষ থাকাও কি সহজ গৌরবের কথা! সুধীরের মতো একজন করিয়া প্রত্যেক দিন তার সঙ্গে বেয়াদবি করুক, তবুও যশোদা চিরকাল এদেরই ভাল-বাসিবে।

সারাটা দিন বাহিরে কাটাইয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় সুধীর চুপি চুপি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছিল। যশোদা হাঁকিয়া বলিল, 'ও মতি, সুধীরকে ডাকো, ভাত খেয়ে যাক।'

সুধীরকে রান্নাঘরে খাইতে বসাইয়া যশোদা বলিল, 'এবারটি ধরলাম

না তোমার কথা, আর কিন্তু ওসব বোলো না আমায় কোনোদিন।'
সুধীর মুখ নিচু করিয়া খাইতে থাকে, যশোদা পিঁড়িটা আরেকটু সরাইয়া আনিয়া মুখোমুখি বসিয়া বলে, 'কাজে যাও নি আজ?'
'না।'
'কাল থেকে যেও।'
রান্নাঘরটি যশোদার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কেবল তিনটি উনানের ধোঁয়ায় দেয়াল কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধোঁয়ার সঙ্গে লড়াই করিয়া যশোদা পারে না। দোষটা অবশ্য আসলে ধোঁয়ার নয়, মানুষের পেটের। দু'বেলা ভাত সিদ্ধ করিতে না হইলে তিনটি উনানে দু'বেলা আঁচ দেওয়ারও দরকার হইত না, দেয়ালে এত কালিও জমিত না।
'ঘর-সংসার করার সাধ হয়ে থাকলে বিয়ে-থা করো একটা? বল তো আমিই না হয় বিয়েটা দিয়ে দিই তোমার একটা মেয়ে ঠিক করে?'
সুধীর মাথা নাড়িয়া চুপচাপ খাইয়া যায়।
যশোদা বলে, 'বেশ তো সাধ না হয়ে থাকে আমার কথা রাখবার জন্যেই বিয়ে করো। তুমি তো বলছিলে আমার জন্য প্রাণ দিতে রাজী আছ। প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বিয়ে করাটা কি কঠিন নাকি?'
সুধীর চুপচাপ খাইয়া যায়।
'চাঁপাকে যদি তোমার পছন্দ হয়—'
সুধীর মাথা নাড়ে। যশোদা বলে, 'অ! আমি ভাবলাম কি, হয়তো বা চাঁপাকে পছন্দ হয়েছে তোমার।'
এবার সুধীর মুখ তুলিয়া বলিল, 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা কেন দিচ্ছ চাঁদের মা?'
সেদিন এই পর্যন্ত। দিন তিনেক চুপচাপ থাকিয়া যশোদা আবার অন্য-ভাবে কথাটা পাড়িল। 'চাঁপা বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, এমন মায়া হয় মেয়েটাকে দেখলে! তুমি যদি বিয়ে করো ওকে, বড্ড খুশি হব আমি।'
'চাঁপাকে? চাঁপার কি মায়ামমতা কিছু আছে চাঁদের মা? ওর চেয়ে কালো ঢের ভাল।'
তারপর যশোদা ঘটকালি করিয়া কালোর সঙ্গে সুধীরের বিবাহ ঠিক

করিয়া ফেলিল। বলিল, 'খরচার টাকাটা কিন্তু ফেরত দিতে হবে বাবু। দু'টাকা চার টাকা করে দিয়ো, কিন্তু যদ্দিনে হোক শোধ করে দিতেই হবে। তুমি আমার এমন কিছু সাতপুরুষের কুটুম নও যে, তোমার ঘর-সংসার পাততে গিয়ে আমি ফতুর হব।'

একদিনে দু'টি বিবাহ হইয়া গেল, সুধীরের সঙ্গে কালোর আর জগতের সঙ্গে চাঁপার। ক'দিন পরে সত্যপ্রিয়র ছোটমেয়ের বিবাহ, এখন হইতে গেটে সানাই বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। যশোদার বাড়িতে দু'টি বিবাহে সানাই বাজিল শুধু এক সন্ধ্যা, উৎসব হইল একটু অভদ্র রকমের, তবে এমন জমজমাট উৎসব হইল বলিবার নয়। রাত বারোটার পর মতির তো জ্ঞানই রহিল না। যশোদাকে একাধারে কন্যাকর্তা ও বরকর্তার নারীসংস্করণ হইয়া সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হইল বটে, আমোদ-আহ্লাদ সেও করিল না কম। সকলের সঙ্গে এক হইয়া সে মিশিয়া গেল। নেশাটা জমিয়া আসিলে মতি একবার তার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, হাত ছাড়াইয়া যশোদাকে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সবাই ভাবিয়াছিল, সে বুঝি রাগ করিয়াছে। ওমা, খানিক পরে এক বাটি দুধ আর একটি চামচ আনিয়া সকলের সামনে জোর করিয়া মতিকে শিশুর মতো কোলে শোয়াইয়া যশোদা তাকে তিন চামচ দুধ খাওয়াইয়া ছাড়িল!

৫

যশোদা বড় ব্যস্ত, একেবারে সময় পায় না। দুটি বিবাহের হাঙ্গামা চুকিতে না চুকিতে সত্যপ্রিয় মিলে জোরালো ধর্মঘটের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সর্বদা যশোদার কাছে লোকজন আসে যায়, তার সঙ্গে পরামর্শ করে, শ্রমিকদলের সভায় গিয়া তাকে বক্তৃতা করতে বলে। যশোদার ধরনটা একটু বিচিত্র। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যায় অথবা যারা পরামর্শ করিতে আসে তাদের কথা কাটা-কাটি মন দিয়া শোনে। তারপর একেবারে মত প্রকাশ করে; এখন

করলেও চলে অবিশ্যি, কিন্তু কিছুকাল পরে করলেই ভাল হত।

বক্তৃতা করা সম্বন্ধে হাত জোড় করিয়া বলে, 'ওটি মাপ করতে হবে। আমি মুখ্যুস্থখ্যু মানুষ, অত ভণিতে করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলা আমার কম্মো নয়। দু'দশজন এলে, কথাবার্তা কইলাম, সে আলাদা। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, বক্তিমে করব কি গো!'

অপরাজিতার সম্বন্ধে জ্যোতির্ময়কে সতর্ক করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, নানা হাঙ্গামায় যাওয়া হয় নাই। মাঝে অপরাজিতা আর একদিন তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, সেদিন তার অবস্থা দেখিয়া সত্য সত্যই বড় ভাবনা হইয়াছে। একদিন যশোদা জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

বড় ব্যস্ত জ্যোতির্ময়। সত্যপ্রিয়র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে প্রীতি-উপহারের পদ্য লিখিতেছে। একটি দু'টি নয়, অনেকগুলি। মা-বাবা, মাসী-পিসী, খুড়া-জেঠা, দাদা-দিদি, বৌদি, ভগ্নীপতি ইত্যাদি নানা সম্পর্কের উপযোগী আশীর্বাদে গুরুগম্ভীর অথবা হাসি-তামাশায় হাল্কা পদ্য লিখিতে হইবে। প্রত্যেক পদ্যের শেষে ভগবানের কাছে প্রার্থনা থাকিবে যে, নব-দম্পতি যেন সুখী হয়। একটু ক্লিষ্ট দেখাইতেছে জ্যোতির্ময়কে, অসুখী মনে হইতেছে। প্রীতি-উপহারের পদ্য লিখিবার পরিশ্রমে নয়, সেই নেকলেসটার জন্য। নেকলেসটা যেন পাইয়া বসিয়াছে জ্যোতির্ময়কে, ক্রমাগত পীড়ন করিতেছে। ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারে না। সত্যপ্রিয় তাকে এমনভাবে ঠকাইবে কেন? এমন কোনো কথা ছিল না যে, কর্মচারীর বৌকে তার হাজার টাকা দামের গহনা দিতেই হইবে, না দিলে লোকে নিন্দা করিবে, তাই বাধ্য হইয়া কোনোরকমে তাকে সেদিন মানরক্ষা করিতে হইয়াছে! সত্যপ্রিয় অবশ্য বলিয়া দেয় নাই যে, হাজার টাকা দামের নেকলেস দেওয়া হইল, কিন্তু সেদিন নেকলেসটির ঝলমলে রূপ দেখিয়া সেই ধারণাই তো সকলের মনে জাগিয়াছিল। লোকের মনে এ-রকম মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি সত্যপ্রিয়র না থাকিবে, এমন জিনিস সে কেন দিবে প্রথম কয়েকদিন যা চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, তারপর কয়েক মাসের মধ্যে চাকচিক্য হারাইয়া এমন সস্তা দেখাইতে থাকে? সত্যপ্রিয় ভাল একখানা কাপড় দিতে পারিত, ছোটখাট সোনার

কছু দিতে পারিত, কিছু না দিয়াও পারিত। একেবারে কিছু না দিলে জ্যোতির্ময় একটু ক্ষুণ্ণ হইত সত্য, কিন্তু সে ক্ষোভ এমন উগ্র হইত না, এমন স্থায়ীও হইত না।

সত্যপ্রিয়র দোষক্ষালনের জন্য কতভাবেই যে ব্যাপারটা জ্যোতির্ময় বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভাবিয়াছে, হয়তো সত্যপ্রিয় জানিত না, নিজে তো দোকানে গিয়া সে জিনিসটি কেনে নাই। এত সব খুঁটি-নাটি বিষয়ে নজর দিবার তার সময় কোথায়? একেবারে অপরাজিতার হাতে দিবার সময় এক মিনিটের জন্য ছাড়া হয়তো জিনিসটা সত্যপ্রিয় ধরেও নাই, চোখেও দেখে নাই। যে জিনিসটা কিনিয়া আনিয়াছে, শেষ মুহূর্তে যে সত্যপ্রিয়র হাতে তুলিয়া দিয়াছে, সেই হয়তো ঠকাইয়াছে সত্যপ্রিয়কে। ঠকাইয়াছে, কারণ দু'দিন পরে ফাঁকি ধরা পড়িলেও কেউ তো আর সত্যপ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে না, আপনি আমার বৌকে কত দামের উপহার দিয়েছিলেন?

প্রীতি-উপহারের পত্ত লিখিতে বসিয়া এইসব কথাই জ্যোতির্ময় ভাবিতে-ছিল, যশোদাকে দেখিয়া খুশি হইয়া বলিল, 'এসো চাঁদের মা। সব সময় আস না কেন বল তো?'

'সব সময় আসব কেন?'

'তা ঠিক। সত্যি বলছি চাঁদের মা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে এমন ভাল লাগে, এমন সহজভাবে তুমি কথা বলতে পার। কোনো বিষয়ে তোমার ন্যাকামি নেই। মানুষের মন রেখে কথা বলতে বলতে প্রাণ বেরিয়ে গেল চাঁদের মা।'

'না বললেই পারেন?'

সেটা যে সম্ভব নয়, যশোদাও খানিক খানিক বোঝে। অন্যভাবে কথা বলিতে জানিলে তো বলিবে, মানুষ মন রাখিয়া কথা না বলিলে বোবা হইয়া থাকিতে হয়।

অপরাজিতার কথাটা যশোদা জ্যোতির্ময়ের মন রাখিয়া মোলায়েম করিয়াই বলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জ্যোতির্ময় যেন শুনিয়াও শোনে না, কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে মনে হয় না। তখন যশোদা

ভদ্রতা ভুলিয়া যায়, এমন সব কথাই শোনায় যে মনে মনে জ্যোতির্ময় রাগিয়া যায়, ভাবে যে কড়া সুরে বলিয়া দিবে কিনা, তার স্ত্রীর ভাবনা যশোদাকে ভাবিতে হইবে না. কিন্তু ভদ্রলোক বলিয়া কিছুই সে বলিতে পারে না, চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে ভয়, বিস্ময় ও দুর্ভাবনা জানাইতে বরং এই ধরনের মন্তব্যই করে : 'সত্যি বলছি ? এসব তো জানতাম না আমি ! ইস্, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে তো !'

'বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন না ?'

'বাপের বাড়ি ? তাই তো, বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেই তো হয় ! কথাটা তো একেবারেই খেয়াল হয় নি আমার !' বলিতে বলিতে জ্যোতির্ময় অন্যমনস্ক হইয়া যাওয়ার উপক্রম করে, অন্যমনস্ক হইয়া যাওয়ার উপক্রম করিতে করিতে বলে, 'তাই দেব। চক্কোত্তিমশায়ের মেয়ের বিয়েটা চুকে গেলেই পাঠিয়ে দেব।'

যশোদা উঠিয়া আসিবে, হঠাৎ জ্যোতির্ময় জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা চাঁদের মা, তোমাকেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। চক্কোত্তিমশায়কে তো তুমি চেনো, তোমার কি মনে হয় সামান্য কটা টাকার জন্য উনি ছোটলোকোমি করতে পারেন ?'

যশোদা সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'তা পারেন।'

'পারেন ?'—জ্যোতির্ময় যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সত্যপ্রিয়র মেয়ের বিবাহের তিনদিন আগে সত্যপ্রিয় মিলে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়া গেল। কেবল ধর্মঘট নয়, একটু মারামারিও হইয়া গেল। এবারও মারামারির সূত্রপাত হইল মতির জন্য। বড় রহস্যময় মারামারি। পরদিন ধর্মঘট হইবে, কাজ করিতে হইবে না ভাবিয়া আগের দিন রাত্রে মতি মিলের প্রায় এক মাইল দূরে তার একটি চেনা স্ত্রীলোকের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে মদ খাইতে গিয়াছিল। একাই গিয়াছিল, কালোকে বিবাহ করিবার পর সুধীর আর মতির সঙ্গে হল্লা করিতে বাহির হয় না। কার যেন একটু রাগ ছিল মতির উপরে, এতদিন গোঁয়ার সুধীরটা সঙ্গে থাকায় মতিকে কিছু বলিতে পারে নাই, সেদিন রাত্রে একা পাইয়া মারিয়া সে মতিকে একেবারে জখম করিয়া দিল। পরদিন সত্যপ্রিয় মিলে গুজব

রটিয়া গেল যে, মতি খুন হইয়াছে। মিলের সামনে কয়েকশ' শ্রমিক জমায়েত হইয়াছিল। শ'তিনেক শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয় নাই, মিলের গেট বন্ধ করিয়া কাশীবাবু তাদের দিয়া কিছু কিছু কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ভিতরের মজুরদের অন্য পথে বাহির হইবার চমৎকার ব্যবস্থা কাশীবাবু করিয়াছিল, কিন্তু তারা দল বাঁধিয়া সদরের গেট দিয়াই বাহির হইয়া আসিল ; কতলোকে কতরকম উস্কানিই যে দিতেছিল !

বাহিরের দলের একজন হাঁকিয়া বলিল,'তোরা মতিকে মারলি কেন রে?' বলিয়াই সেও যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল !

ভিতরের দলের একজন হাঁকিয়া বলিল, 'তোরাও অমনিভাবে মরবি!' বলিয়া সেও যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল !

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল মারামারি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং পুলিস আথালি-পিথালি সকলকে পিটাইতেছে। কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে গেল, মিল অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যশোদা যখন হাসপাতালে কয়েকজন আহত শ্রমিকের কাতরানি শুনিতেছে, সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে খবর রটিয়া গেল যে ধর্মঘট উস্কানোর জন্য যশোদার উপর এমন অকথ্য অত্যাচার করা হইয়াছে যে তাহাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে। মতি খুন হয় নাই এ খবরটাও পাওয়া গেল।

পরদিন একজন মজুরও সত্যপ্রিয় মিলে কাজ করিতে গেল না। মতির মতো যশোদার সম্পর্কে গুজবটাও যে সত্য নয় এটা অবশ্য ক্রমে ক্রমে সকলেই জানিতে পারিল, কিন্তু তখন আর সেজন্য কিছু আসিয়া যায় না, কাল মারামারিটা হইয়া যাওয়ার ফলে সত্যপ্রিয় মিলের মজুরদের মধ্যে মনের মিল হইয়া গিয়াছে।

মারামারির ফলে মনের মিল ? মজুরদের মধ্যে ওরকম হয়, ওরা ছোটলোক কিনা। দু'একজন লোক দলের মধ্যে চিড় খাওয়াইয়া দেয়, একজনের মনে হয়তো একটু অভিমান আছে, ধর্মঘটের দাবি উঠাইতে তার পরামর্শটা গ্রাহ্য করা হয় নাই। সে কয়েকজনকে শুনাইয়া বলিল, 'কর্মো নেই ধর্মো ঘটে।' কয়েকজনের মনে হইল, তাই তো বটে, কি

দরকার হাঙ্গামায় ? কয়েকজনের মনে হইল, একজন যেন বড় বেশী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ধর্মঘটের জন্য, ওর মতলবটা কি ? হিংসা, ভয়, সন্দেহ, দুর্বলতা, অবিশ্বাস, ভুল ধারণা আর আত্মমর্যাদার অভাব তো চিরদিন পুরামাত্রাতেই আছে, তার উপরে একটু কু-পরামর্শ জুটিলে আর দেখিতে হয় না। যে ধর্মঘট করে না সে ভাবে, যারা ধর্মঘট করিয়াছে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ? একটু হাতাহাতি মারামারি করিতে পাইলে এই চরম প্রশ্নের মীমাংসাটা তাদের হইয়া যায়, হঠাৎ যেন তাদের তুচ্ছ জীবনে এ ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। কু-পরামর্শদাতারা সময় মতো সাবধান না হইলে এইজন্য মারামারির পর মজুরদের মনের মিল হইয়া যায়।

মারামারিতে সুধীর একটু জখম হইয়াছিল। পরদিন সকালে ঘর হইতে তাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গেল। জগৎকেও তারা খুঁজিতেছিল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

চাঁপা নির্বিকার চিত্তে বলিল, 'আমি কি জানি তার খবর ? রাতে ঘরে ছিল না।'

যশোদা রান্না করিতেছে, ঝড়ের মতো কালো ছুটিয়া আসিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ও দিদি, পুলিসে ধরে নিল যে ?'

যশোদা বলিল, 'নিক্ না। জোয়ান মদ্দ মানুষটাকে পুলিস কি গিলে খাবে ? হাঙ্গামা মিটলেই ছেড়ে দেবে দু'দিন পরে।'

কালো তা বুঝিতে চায় না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপে আর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে। মেয়েমানুষ সমস্ত গণ্ডগোলের গোড়া, এই মতবাদ খাড়া করিয়া যশোদা যে এ বাড়িতে স্ত্রীলোক থাকিতে দেয় না, এ বাড়িতে ঢুকিয়া কালো যেন যশোদার সেই মতবাদটাই প্রমাণ করিয়া দিতে থাকে। যশোদা শেষে রাগ করিয়া বলিল, 'কেবল কি পীরিত করতে জেনেছিস, বাছা সংসারে ? একটু এদিক ওদিক হলে যদি চোখে আঁধার দেখবি, পীরিতের মানুষটাকে আঁচলে বেঁধে রাখিস্ না কেন ?'

এই বলিয়া রাগে আগুন হইয়া যশোদা হন্‌হন্ করিয়া হাজির হইল

একেবারে গলির মোড়ে, যেখানে কাশীবাবু একটু আড়ালে গা ঢাকা দিয়াছিল।

'সুধীরকে ধরানো হচ্ছে কি জন্যে ? ওরা মারামারি করেছে নিজেদের মধ্যে, আপনার তাতে কি ? এমনিতে পুলিস তো মেরে লোপাট করে দিলে, আপনি আবার বেছে বেছে এক একজনার পিছনে লাগছেন কেন ?'

সঙ্গে পুলিস ছিল, কাশীবাবু নির্ভয়ে একগাল হাসিয়া বলিল, 'সুধীর তোমার পীরিতের লোক নাকি যশোদা ? তাতো জানতাম না ! জড়িয়ে ধরার সময় বেড় পায় ?'

'বটে রে মুখপোড়া, রসিকতা হচ্ছে ?'—হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টানে কাশী-বাবুকে কাছে টানিয়া আনিয়া ঘাড় ধরিয়া মাথাটা নিচু করিয়া যশোদা ভদ্রলোকের মুখখানা জোরে জোরে রাস্তায় ঘষিয়া দিল। কাশীবাবু যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল, মুখের অর্ধেক চামড়া তার উঠিয়া গিয়াছে, দরদর করিয়া রক্ত চোঁয়াইয়া পড়িতেছে।

সুতরাং সুধীরের সঙ্গে যশোদাও হাজতে গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে সত্য-প্রিয় স্বয়ং তাকে ছাড়াইয়া লইয়া আসিল। যশোদার সামনেই মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কাশীবাবুর কাছে হাত জোড় করিয়া বলিল, 'আপনাকে মিনতি করছি কাশীবাবু, আমায় না জানিয়ে দয়া করে কিছু আপনি করতে যাবেন না। দু'দিন একটু ব্যস্ত আছি, দাঙ্গা বাধিয়ে, পুলিস ডেকে এক কাণ্ড করে আপনি বসে আছেন। আমার মিলের লোককে পুলিস ধরে নিয়ে গেল, আপনি ভাবছেন এতে আমার সম্মান খুব বাড়ল ? কে ডাকতে বলেছিল আপনাকে পুলিস ? আমার দেশের মানুষ ওরা, দু'টি অন্নের জন্য খাটতে এসেছে, খিটিমিটি বাধে নিজেদের মধ্যে তা মিটিয়ে নেব, ওদের না পোষায় ওরা কাজ করবে না, আমার না পোষায় আমি কারখানা তুলে দেব—পুলিস ডাকব কোন লজ্জায় ?'

যশোদা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কাশীবাবুর রাস্তায় ঘষা মুখটা বোধ হয় বড় জ্বালা করিতেছিল, মাথার ঠিক ছিল না, সত্যপ্রিয়র তীব্র অনু-যোগে থতমত খাইয়া সে বলিয়া বসিল, 'আজ্ঞে আপনি নিজেই তো—'

সত্যপ্রিয় গর্জন করিয়া উঠিল, 'যান, যান, বাড়ি যান আপনি। আপনার মতো অপদার্থ লোক রেখেই আমার সর্বনাশ হবে একদিন।'

কাশীবাবু বিছানায় শুইয়া স্ত্রীর সেবা গ্রহণের জন্য বাড়ি গেল। সত্যপ্রিয় বলিল, 'যশোদা, তিন মাস আমি মিলের কোনো ব্যবস্থা বদলাতেও পারব না, নতুন ব্যবস্থা চালাতেও পারব না। আমি যদি বলি তিন মাস পরে আমি নিজে খোঁজখবর নিয়ে ওদের সমস্ত নালিশ আর দাবির ব্যবস্থা করব, হাঙ্গামাটা তুমি মিটিয়ে দিতে পারবে?'

যশোদা ভাবিয়া বলিল, 'আপনি যদি বলেন—'

'আমি বলছি।'

যশোদা চেষ্টা করিয়া দেখিতে রাজী হইয়া চলিয়া আসিল বটে, মনটা তার খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। এই সময় ধর্মঘট চালাইয়া যা কিছু আদায় করিতে পারা যায়, আদায় করিয়া লইলেই ভাল হইত। এসব মতলববাজ লোককে বিশ্বাস আছে? তিন মাসে কত কি করিয়া বসিবে ঠিক আছে কিছু! কিন্তু টাকা সম্বন্ধে যত মতলববাজ লোকই হোক, —ব্যবসাদার মানুষেরা ওরকম একটু হয়,—দেশ সম্বন্ধে একটু মমতা বোধ হয় আছে সত্যপ্রিয়র। পুলিস সম্বন্ধে যে কথাগুলি সত্যপ্রিয় বলিল, তার মধ্যে একটু আন্তরিকতা আছে বলিয়া মনে হইল না?

বাড়ি ফিরিয়া কালোর খোঁজ করিতে গিয়া যশোদা দেখিল, না খাইয়া ঘরে কপাট দিয়া সে পড়িয়া আছে। যশোদা ডাকিতে সে দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আলো একটু কম, আলো কম বলিয়াই বোধ হয় কি যে একটা আশ্চর্য কমনীয় রূপ চোখে পড়িল কালোর দুঃখক্লিষ্ট মুখে! ন্যাকামি দেখিয়া রাগ করার বদলে যশোদা যেন একটু আশ্চর্যই হইয়া গেল—সময় সময় এমন দেখায় কেন মানুষের মুখ? মুখখানা কচি বলিয়া? না সত্যই ভিতরের কিছু মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে? এরকম আকুল হওয়ার মধ্যে সুখ আছে নাকি কিছু, একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ, যশোদা যার স্বাদ জানে না?

যশোদার দেহে সুধীরের বাহুর বেড় না পাওয়ার রসিকতাটা যশোদা ভুলিয়াও ভুলিতে পারিতেছিল না, প্রেমিকের বাহু বন্ধনের জন্য যশোদার

কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নাই, তবু ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতেছিল, কথাটা তো মিথ্যা নয় কাশীবাবুর, দেহটা তার একটু বড়সড় বৈ কি। যেমন ধর এই কালো, এই ছিপছিপে পাতলা মেয়েটাকে সুধীর যেমনভাবে বুকে তুলিয়া লইতে পারে—ঠিক তেমনিভাবে যশোদাকেও বুকে তুলিয়া লইতে একজন বোধ হয় পারে—ধনঞ্জয়। কাশীবাবুকে ডাকিয়া আনিয়া ধনঞ্জয়ের চেহারাটি একবার দেখাইয়া দিবে নাকি, একবার বলিয়া দিবে নাকি যে, আপনার মতো বামনাবতার সবাই নয়। মশায়, হাঁ দেখুন চেয়ে? হাতে হাতে অবশ্য প্রমাণ করিয়া দেওয়া চলিবে না যে যশোদাকে বেড় দিবার পক্ষে ধনঞ্জয়ের বাহু দুটি যথেষ্টই লম্বা—

কিন্তু ধনঞ্জয়ের পা কাটা গিয়াছে। আর কি এখন মানুষকে ডাকিয়া গর্বের সঙ্গে তাকে দেখানো চলে?

অপরাধটা যেন কালোর এমনিভাবে হঠাৎ বেচারা কালোর উপরে রাগ করিয়া সে বলিল, 'না খেয়ে পড়ে আছিস যে ছুঁড়ি? একটা দিনের জন্য তোকে ছেড়ে যেতে পারে না সে মানুষটা?'

কালো সাগ্রহে বলিল, 'একটা দিন দিদি? কাল আসবে?'

'আজকেই হয়তো আসবে। যা, নেয়ে খাবি যা।'

সত্যপ্রিয়র বাগানবাড়িতে সত্যপ্রিয়র একটি মেয়ের বিবাহ, কিন্তু মনে হয় সমস্ত শহরতলিতে যেন রাশি রাশি মেয়ের বিবাহ হইতেছে। যশোদার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সত্যপ্রিয়র মোটরে আসিয়া যশোদার গলির সামনে মোটর দাঁড় করাইয়া জ্যোতির্ময় আর অনাথ দু'জনে তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিল।

গাড়ি নিয়া নিমন্ত্রণ করিতে যাওয়ার কথায় জ্যোতির্ময় বলিয়াছিল, 'আজ্ঞে, গাড়ির দরকার নেই, বাড়ি ফেরার পথে আমি বলে যাব।' শুনিয়া হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত রকমের উদাস ভাব সত্যপ্রিয়র মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিবার নয়। জ্যোতির্ময় তাড়াতাড়ি ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলিয়াছিল, 'আজ্ঞে, গাড়ি নিয়েই যাই তবে, তাড়াতাড়ি হবে।'

সত্যপ্রিয় বলিয়াছিল, 'না না, তাড়াহুড়ো করবেন না। বাড়িতে ঢুকেই

বললেন, তোমার নেমন্তন্ন, আর বলেই চলে এলেন, এতে অপমান করা হয় মানুষের। বসে কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় করে বিশেষভাবে অনুরোধ করে আসবেন, বিয়েতে যেন আসে।'

বিবাহের দিন সন্ধ্যার সময় সত্যপ্রিয়র গাড়িতেই জ্যোতির্ময় বাড়ির সকলকে এবং যশোদা ও নন্দকে বিবাহ-বাড়িতে নিয়া গেল। ধর্মঘট মিটাইয়া দিয়া যশোদা যেন সত্যপ্রিয়কে কিনিয়া ফেলিয়াছে, কিভাবে তাকে সম্মান দেখাইবে সত্যপ্রিয় ভাবিয়া পাইতেছে না।

যশোদা কিন্তু সংশয়ভাবে নন্দকে বলিয়াছে, 'উঁহু, কি যেন মতলব আছে লোকটার। নইলে এমন বাড়াবাড়ি করত না।'

নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথায় অপরাজিতা এবারও বলিয়াছিল, 'আমি যাব?' তারপর রওনা হওয়ার সময়ও সে আপত্তি করিয়াছে, বলিয়াছে, 'ছাখো, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, ভিড়ের মধ্যে নাই বা গেলাম আমি?'

'একবারটি চলো লক্ষ্মী। গিয়ে না হয় পাশে চুপটি করে বসে থেকো।'

সকলকে অন্দরের মুখে ছাড়িয়া দিয়া জ্যোতির্ময় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড হোগলার মণ্ডপ তোলা হইয়াছে, থামগুলি রঙীন কাগজ আর দেবদারুপাতায় ঢাকা, বাহিরের গাছগুলিকে লাল নীল আলোয় সাজানো হইয়াছে। অনেকগুলি জোরালো আলোয় চারিদিক ঝলমল করিতেছে। পান সিগারেট আর শরবত বিতরণ করা হইতেছে হরদম, মাঝে মাঝে গোলাপজলের পিচকারিও মারা হইতেছে। চারিদিকে লোক গিজগিজ করিতেছে, নানা অবস্থার নানা বয়সের লোক,—বাঙালীই বেশী, অ-বাঙালীও আছে। সকলেই বেশভূষা করিয়াছে প্রাণপণে, কিন্তু গরীবদের দেখিলেই চেনা যায়। কেবল পোষাক ভেদ করা দারিদ্র্য নয়, অনভ্যস্ত উৎসবের আবেষ্টনীতে সকলের দৈনন্দিন অভ্যস্ত জীবনের পরিচয় বিচিত্র ইঙ্গিতে প্রকাশ হইয়া যাইতেছে। সঙ্কোচ, ভয়, দীনতা, দুঃখ, রোগ, শোক, বিষণ্ণতা। তার নিজের? চার পাঁচজন চেনা মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, মুখ তার শুকনো কেন, তার কি অসুখ করিয়াছে? এতো বড় ভয়ানক কথা যে, একটা নেকলেস তাকে এমন অবস্থায় আনিয়া দিতে পারে যে, তাকে দেখিলে লোকের মনে হয় সে

অসুস্থ।

ক্রমাগত গাড়ি আসিয়া নিমন্ত্রিতদের নামাইয়া দিয়া যাইতেছিল। জমিদার, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার। তিনজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর পরে দু'জন মন্ত্রীর আবির্ভাব ঘটিল,—একজন অন্য প্রদেশের। তারপর কয়েকজন বোম্বাইওয়ালা, পাঞ্জাবী ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীর পিছনে আসিল দু'জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। দু'জনেই ইংরেজ। বোধ হয় এদের অভ্যর্থনা করার জন্যই একজন বাঙালী উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী এতক্ষণ সত্যপ্রিয়র কাছে দাঁড়াইয়া মোটা একটা সিগার টানিতেছিল। এদের একজনের সঙ্গে জ্যোতির্ময় চাকরির প্রথম দিকে একবার দেখা করিতে গিয়াছিল। নিজে যায় নাই, সত্যপ্রিয় সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চা পান আর ঘণ্টাখানেক নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। ঠিক যে আলোচনা হইয়াছিল তা নয়, নানা বিষয়ে জ্যোতির্ময়ের মতামত জানিবার জন্য যেন কতকটা জেরাই করা হইয়া-ছিল জ্যোতির্ময়কে, তবে সে কাজটা ভদ্রলোক করিয়াছিল বড়ই অমায়িকভাবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আগাগোড়া সত্যপ্রিয় বিশেষ কথা শুনিয়াছিল—যেটা সত্যপ্রিয়র একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাই হোক, কোনো বিষয়ে নিজের কোনো মতামত জ্যোতির্ময়ের ছিল কিনা সন্দেহ, ততদিনে সত্যপ্রিয়র মতামতগুলিও সে মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং সত্যপ্রিয়র সামনে বসিয়া ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে তার বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। সত্যপ্রিয়ও মোটামুটি খুশি হইয়াছিল, কেবল ফিরিবার সময় দু'একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল, 'আমার কথাগুলি এখনো সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেন নি। যাই হোক, আপনার নিষ্ঠা আছে, ধীরে ধীরে বুঝবেন। আমার কত বছরের চিন্তার ফল, ওকি আর দু'চারদিনে বোঝা যায়।'

তারপর জ্যোতির্ময় আর ইংরেজ ভদ্রলোকটির সংস্পর্শে আসে নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয়র যত লেখা ও বক্তৃতা ছাপা হয়, সত্যপ্রিয় নিজে যে সেগুলিতে নানা রকম মন্তব্য যোগ করিয়া এর কাছে পাঠাইয়া দেয়,

কিছুদিন পরে জ্যোতির্ময় তা জানিতে পারিয়াছে।

সেই সঙ্গে একটা বিষয়ে জ্যোতির্ময়ের একটা অস্পষ্ট ধারণাও জন্মিয়াছে। গবর্নমেন্টের বড় বড় কন্ট্রাক্ট বাগানোর ব্যাপারে সত্যপ্রিয় যে অসাধারণ ও প্রায় অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, অনেকের কাছেই তা দুর্বোধ্য রহস্যে ঢাকা। কিন্তু জ্যোতির্ময়ের মনে হয়, এই ইংরেজ ভদ্রলোকটির অনুগ্রহেই বোধ হয় সত্যপ্রিয়র এই বিশেষ সৌভাগ্য।

স্পষ্ট ধারণা করিবার উপায় নাই। সত্যপ্রিয়কে ব্যক্তিগতভাবে এতখানি অনুগ্রহ করিবার মতো উচ্চপদে তো ভদ্রলোক প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্যক্তিগত অনুগ্রহের ব্যাপারও এটা নয়। জোর গলায় যে ঘোষণা করিতেছে যে, আমি দেশকে ভালবাসি, ভারতবর্ষের সকল সমস্যার সমাধান আমি আবিষ্কার করিয়াছি দেশের অপরিণামদর্শী অন্ধ নেতাদের প্রদর্শিত ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিয়া আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তেত্রিশ বৎসরে ভারত স্বাধীন হইবে, ভারতের ঘরে ঘরে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিবে—মাঝে মাঝে সে ইংরেজ-বিদ্বেষ আর সোজাসুজি গবর্নমেন্টের সঙ্গে বিরোধ ত্যাগ করিতে বলে বলিয়াই কি তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো উদারতা গবর্নমেন্টের হয়?

অথবা হয়?

কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না জ্যোতির্ময়। মনে হয়, কোথায় যেন একটা ধাঁধাঁ আছে। দেশপূজ্য নেতা, স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, স্বাধীনতার আন্দোলন সমস্ত কিছুরই বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্যপ্রিয় যেমন করে, গবর্নমেন্টের নিন্দাও তো করে? অবশ্য স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারকদের সমালোচনার সময় ভাষাটা যেমন তীব্র হয়, এদের প্ররোচনায় দেশের যে সর্বনাশ হইতেছে তার বর্ণনা যেমন রোমাঞ্চকর হয় গবর্নমেন্টের নিন্দাটা তেমন জমে না। শিক্ষার অব্যবস্থা, নদী-নালার সংস্কারের অভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রচারে সহায়তা, ভ্রান্তিপূর্ণ অর্থ-নৈতিক নীতি অনুসরণ, এই ধরনের কয়েকটি বিষয়ে গবর্নমেন্টের ভুল দেখাইয়া সসম্ভ্রমে গবর্নমেন্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াই সত্যপ্রিয় ক্ষান্ত হয়। তবু, এসব তো বিরুদ্ধ সমালোচনা? সত্যপ্রিয় যে সত্য সত্যই দেশকে ভালবাসে, যত খাপ-

ছাড়া বা উদ্ভট সে ভালবাসা হোক, তার লেখা ও বক্তৃতায় তার যথেষ্ট পরিচয় থাকে।

দেশের দুরবস্থার যে বর্ণনা লেখায় ও বক্তৃতায় সত্যপ্রিয় দেয়, দেশকে ভাল না বাসিলে কেউ তা পারে? নেতারা যা চায় সত্যপ্রিয়ও তাই চায়,—কেবল তার উপায়টা একটু পৃথক, একটু অভিনব। কদিন আগেও সত্যপ্রিয়র একটি পুস্তক জ্যোতির্ময় প্রকাশ করিয়াছে, তাতে সত্যপ্রিয় স্পষ্টই বলিয়াছে, সর্বাগ্রে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা চাই, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর চেষ্টা করা কর্তব্য: বলিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলে ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে সেটা ব্যাখ্যা করিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি সম্ভবত কেষ্টবাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। তা হোক, সেটা বড় কথা নয়, সংস্কৃত শ্লোকের অপার সমুদ্রে ভাড়াটে ডুবুরী নামাইয়া রত্ন উদ্ধার করিলে দোষ হয় না, সেগুলি কাজে লাগাইতে পারাই আসল কথা। ব্যাখ্যার পর সত্যপ্রিয় নির্দেশ করিয়াছে, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করিবার উপায়। এই উপায় নির্দেশ করাই প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য, প্রবন্ধটির নামই ছিল, 'তেত্রিশ বৎসরে ভারতের স্বাধীনতা লাভের উপায়।' ধর্ম যখন লোপ পায়, সমাজব্যবস্থা বিকৃত হয়, দেশবাসীর দারিদ্র্য, অন্নাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অকালমৃত্যু, বীভৎস রূপ ধারণ করে, দেশহিতৈষীর তখন সর্বপ্রথম কর্তব্য কি? এ সমস্তের মূল কারণ অনুসন্ধান। কারণ না জানিলে প্রতিকার হইবে কিরূপে? শাস্ত্রগ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ, দেশ-বিদেশের হাজার বৎসরের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া সত্যপ্রিয় দেখাইয়াছে, একটিমাত্র কারণে দেশের সর্বাঙ্গীন দুরবস্থা ঘটে—রাজশক্তির সহিত উদ্দেশ্যহীন বিরোধ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় ঈশ্বর কয়েকটি মূলনীতি স্থির করিয়া দিয়াছেন, কেবল সূর্যের সহিত পৃথিবীর সম্পর্ক বিচার করিয়াই সে নীতির মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব, ঐ সকল মূল নীতির একটি হইল—রাজশক্তির সহিত অকারণ কলহ করিলে দেশবাসীর ধর্ম, সমাজ, সুখ-সম্পদ, স্বাস্থ্য-শান্তি নষ্ট হইবেই হইবে, কিছুই তাহা ঠেকাইতে পারিবে না। এই নিয়মের দ্বারাই বিশ্বনিয়ন্তা শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। এইখানে সত্যপ্রিয় শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের

মতবাদ ও ভারতীয় ঋষিগণের মতবাদ আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানের মতবাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করিয়াছে ; যদিও সত্যকথা বলিতে কি, আলোচনাটা জ্যোতির্ময় একবিন্দুও বুঝিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের যে অধঃপতন হইয়াছে, ভারতবাসীর সে শোচনীয় দুরবস্থা দেখা দিয়াছে এবং দিন দিন অধঃপতন ও দুরবস্থা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ভারতবাসীর রাজশক্তির সহিত বিবাদ। কিন্তু তাই যদি হয়, ভারতবর্ষ কি তবে স্বাধীনতা পাইবে না ? স্বাধীনতা পাইতে গেলেই তো রাজশক্তির সহিত ভারতবাসীর বিবাদ বাধিবে—কারণ রাজশক্তি বৈদেশিক ? না, তা নয়। সত্যপ্রিয় স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে, স্বাধীনতা ভারতবাসী অনায়াসে পাইতে পারে, তেত্রিশ বৎসরে পাইতে পারে, যদি ঠিক পথ অনুসরণ করা হয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজশক্তির সহিত ভারতে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, কখনও একরূপে কখনও অন্যরূপে, কখনও প্রবলভাবে, কখনও ক্ষীণভাবে—ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অধঃপতন ঘটিতে ঘটিতে ভারত বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং মূর্খেরও এখন বোঝা উচিত যে ভারতবাসীর সর্বপ্রথম কর্তব্য রাজশক্তির সহিত সর্বপ্রকার বিরোধ পরিত্যাগ করা। কার্যে, চিন্তায় ও বাক্যে এমন কিছুই প্রশ্রয় পাইবে না যাহা রাজশক্তির পছন্দসই নহে। এমন কি, কেহ যদি ভ্রান্তিবশত রাজশক্তির বিরোধিতা করিয়া দেশের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হয়, রাজশক্তি তাকে উপেক্ষা করিলেও দেশবাসীর নিজেদেরই কর্তব্য হইবে তাকে সংযত করা। একদিনে ইহা হইবে না সত্যপ্রিয় তাহা জানে, সত্যপ্রিয়র পন্থা অনুসরণ করিলে ইহাতে বিশ বৎসর সময় লাগিবে। যে মুহূর্তে ভারতবাসী রাজশক্তির সহিত বিরোধ পরিত্যাগের চেষ্টা আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্ত হইতে ধর্ম ও সমাজের অধোগতি রদ হইয়া দেশবাসীর অন্নকষ্ট, সুখশান্তির অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এ সমস্তের প্রতিকারও আরম্ভ হইবে—বিশ বৎসর পরে দেখা যাইবে, একমাত্র পরাধীনতা ছাড়া ভারতবর্ষের কোনো অভাব নাই। ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সমাজ-বিধান চরম উন্নতি

লাভ করায় তখন রাজশক্তিরও পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিবে, কারণ, প্রকৃতির নিয়মে ধর্ম ও সমাজ বিধানের অনুরূপ রাজশক্তিই দেশে প্রচলিত থাকিতে পারে ; এইখানে ঋষিগণের বাক্য হইতে সত্যপ্রিয় দেখাইয়াছে, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আধারহীন শক্তি হয় না, আধার পরিবর্তিত হইলেই শক্তির বাহ্যিক রূপান্তর ঘটিবে, অবশ্য মূল শক্তি চিরদিনই অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয়, ইত্যাদি। তের বৎসর ভারতবাসী যদি ধর্ম আর সমাজ-বিধানের উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারে ভারতের বৈদেশিক রাজশক্তি ভারতীয় রাজশক্তিতে পরিণত হইবে। সুতরাং তেত্রিশ বৎসরে ভারতবর্ষ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সর্বপ্রকার স্বাধীনতা লাভ করিবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া, স্বাধীনতার আন্দোলন তুলিয়া নেতৃবর্গ দেশের ধ্বংসের পথটাই পরিষ্কার করিয়া দিতেছে—স্বাধীনতাকে হাজার বৎসর ভবিষ্যতে ঠেলিয়া দিতেছে।

সত্য কথা বলিতে গেলে, সত্যপ্রিয়র প্রবন্ধটি জ্যোতির্ময়ের কাছে কতকটা প্রলাপের মতো মনে হইয়াছে, তবু কি যেন আছে প্রবন্ধটিতে যা মনের নীতি-ধর্মগত অন্ধবিশ্বাসে জন্ম-মৃত্যু-সীমাহীনতা নক্ষত্রলোক-আশ্রয়ী দুর্বোধ্য ও রহস্যময় অনুভূতির জগতে, কেমন যেন একটা অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। আশার কথা বলা হইয়াছে, তবু অকারণ হতাশায় মন ভরিয়া যায়, কার্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তবু মনে হয় হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাই ভাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বলিতে বসিয়া প্রাচীন ভারতের স্বর্গের সঙ্গে বর্তমান ভারতের নরকের তুলনা করিয়া, ধর্ম, ঈশ্বর আর দর্শনের কথা বলিয়া, সত্যপ্রিয় যেন একেবারে মনের ভিত্তি ধরিয়া নাড়া দেয়—আসল বক্তব্য সত্যপ্রিয় কি যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিয়াছে সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া তার কথা মানিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। মাঝে মাঝে, বহির্জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে হঠাৎ যখন জ্যোতির্ময়ের কোনো কারণে একটু সংস্পর্শ ঘটিয়া যায়, তখন দু'একবার তার মনে হইয়াছে, সত্যপ্রিয়র বলিবার যেন কিছুই নাই, সে শুধু ধর্ম, ঈশ্বর, শাস্ত্র, দেশ ও সমাজের দোহাই দিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতার প্রচলিত আন্দোলন বন্ধ করিতে বলিতেছে। এই একটি কথাই বলিবার আছে

সত্যপ্রিয়র এবং এই একটি কথাই সে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে জ্যোতির্ময় বিবাহের আসরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। একজন বড়বাজারের বড় ব্যবসায়ী সামনে পড়িল। ভুঁড়ি নাই, বাংলা বলিতে পারে। সত্যপ্রিয়র সঙ্গে অনেকদিনের ঘনিষ্ঠতা, কারণ, সত্যপ্রিয় তিনবার তিনটি মুখের গ্রাসে লাখ তিনেক টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।

'জোতীরমোয়বাবু যে! কেমোন আছেন! ভাল ত!'—একদৃষ্টে খানিক তফাতে সত্যপ্রিয়র দিকে চাহিয়া থাকে। সাদা ও কালো রাজকর্মচারী ক'জনকে সত্যপ্রিয় বিবাহের আসর দেখাইতেছিল এবং সম্ভবত হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির অবনতি ও তাহার কুফল ব্যাখ্যা করিতেছিল।—'দেখিয়েছেন জোতীরমোয়বাবু! মেয়ের সাদি দিতে দিতে কেমোন নিজের কাম বাগিয়ে নিয়েতেছেন। কি চীজ আছেন আপনার সত্যবাবু! কি বলিয়েতেছেন জনিসন সায়েবকে জানেন? হামি জানি! বলিয়েতেছেন—সায়েব, ইয়ংম্যান স্বদেশী করবে আর তোমরা তাদের জেলে ভেজবে, তোমরা তাদের জেলে ভেজবে আর ইয়ংম্যান স্বদেশী করবে,—হামারা বাত শুনিয়ে, জেলে কখুনো দিও না, একঠো নরম-গরম মেয়ের সাথে জবরদস্ত্ সাদি দিয়ে দাও, স্বদেশী না করে ইয়ংম্যান তখন সে তিশ রূপেয়ার কেরানী বনে যাবে।'

জ্যোতির্ময় হাসিয়া বলিল, 'তাই নাকি! সত্যপ্রিয়বাবু ও কথা বলছেন আপনি কি করে জানলেন মোহনলালজী?'

'হামি না জানিয়েলে কে জানবে? হামি আর উনি দু'জন তো টেণ্ডার দিয়েলাম—সায়েব হামাকে পুছলো, মোহনলালজী, দেশকো যত আদমি ইংরেজ রাজকো ভাগাতে চায় তাদের কি করা যায় বলুন তো? হামি বললাম, জেলমে পুরে দিন। বাস্, হামি টেণ্ডার না পেলাম।'

জ্যোতির্ময় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওঁকে জিজ্ঞাসা করায় উনি কি বললেন?'

'হামারা সামনে কি পুছিয়েছে? ওই অনুমান করে লিন্ না! আপনি

সত্যবাবুকে না জানেন? সত্যবাবুর জবান না শুনেন?—হাসিয়ে হাসিয়ে উনি কোতোবার বলিয়েছেন, সাধুকে দারু পিলাবে তো মন্দিরমে ঘটা করে পূজা দিয়ে চরণামৃত বোলকে পিলায়ে দেও। দশ রোজ পিলায়ে দিলে সাধু মাতাল হয়ে যাবে, চোরকে সাধু বানাবে তো আসলি সাধু বনে' থাকলে চুরির কত সুবিস্তা সমঝিয়ে দিয়ে দশ রোজ ধরে সাধু বানাও—চোর আর চুরি না করবে। সত্যবাবু সায়েবকো এসা কুছু বলিয়ে থাকবেন!'

হয়তো তাই হবে। যে সামান্য একটা নেকলেসের ব্যাপারে ছ্যাঁচড়ামি না করিয়া পারে না—

তারপর এক সময় কোনো রকমে লুচি পোলাও কিছু পেটে পুরিয়া মণ্ডপের থামে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে জ্যোতির্ময় নানা রঙের শাড়ি-পরা এক-দল ছোট ছোট চঞ্চল মেয়ের মহোল্লাসে প্রীতি-উপহারের সংগৃহীত কাগজ ভাগাভাগি করা দেখিতেছে, সত্যপ্রিয়র বড় ছেলে মহীতোষ আসিয়া তাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

'কি হয়েছে মহী?'

'বৌদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

অপরাজিতা? অপরাজিতার আবার কি অসুখ হইল? অন্দরে মেয়েদের ভিড়, একটা ঘরে বাসর বসিয়াছে, বারান্দা ও দু'তিনটি ঘরে খাওয়া চলিতেছে, শাড়ির বর্ণ-বৈচিত্র্যে চোখ ঝলসিয়া যায়। কিছু না জানিয়াও জ্যোতির্ময় বুঝিতে পারিল এদের একজনও অপরাজিতা নয়। বাড়ির প্রায় পিছনে কোণের দিকের ছোট একটি ঘরের সামনে স্বয়ং সত্যপ্রিয় দাঁড়াইয়া ছিল। আর একটু তফাতে তিন চারজন মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া সুবর্ণ নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। জ্যোতির্ময়কে দেখিবামাত্র এতক্ষণের চাপা রাগ ও বিরক্তির বশে সত্যপ্রিয় বলিয়া ফেলিল, 'আপনার মাথায় গোবর ভরা জ্যোতির্ময়বাবু! বৌমাকে এ অবস্থায় কি বলে নিয়ে এলেন?'

মাথায় যে জ্যোতির্ময়ের সত্যসত্যই গোবর ভরা তার প্রায় আরও একটা প্রমাণ দিয়া সে বলিল, 'আপনি যে আনতে বললেন?'

সত্যপ্রিয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিছু

বলিল না। মহীতোষকে একখানা গাড়ি একেবারে বাড়ির পিছনে আনিয়া লাগাইতে বলিয়া দিল। গাড়ি যেন বড় হয়, একজনকে যেন শোয়ানো চলে গাড়িতে।

মহীতোষ বলিল, 'অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য ফোন করে দিলে হয় না?'

সত্যপ্রিয় যেন শুনিতে পাইল না এমনিভাবে সরিয়া গিয়া বারান্দায় রেলিঙে ঝুঁকিয়া একটু চাহিয়া রহিল, তারপর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া রাগ করিয়া বলিল, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে মহী?'

'এই যে, যাই।'—চোখের পলকে মহীতোষ অদৃশ্য হইয়া গেল।

জ্যোতির্ময় স্থবর্ণের কাছে সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে রে স্থবর্ণ?'

স্থবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'বৌদি হঠাৎ মুচ্ছো গিয়ে গোঙাতে লাগল, আর—'

এবার সত্যপ্রিয় ডাকিয়া বলিল, 'ভয় পাবেন না জ্যোতির্ময়বাবু। দু'জন ডাক্তার পরীক্ষা করছেন, দেখি তাঁরা কি বলেন। যশোদাও ভেতরে আছে।'

মিনিট পনের পরে দরজা খুলিয়া ডাক্তার দু'জন বাহির হইয়া আসিল, যশোদাও সঙ্গে আসিল। দু'জন ডাক্তারকে জ্যোতির্ময় চেনে, দু'জনেই নাম করা চিকিৎসক, একজন শহরের, একজন শহরতলির। এমন কত ডাক্তার আজ সত্যপ্রিয়র কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছে।

ডাক্তার দু'জন মুখ খুলিবার আগেই সত্যপ্রিয় বলিল, 'একটু সুস্থ হয়েছেন তো এখন? যাক্ বাঁচা গেল। বিয়েবাড়িতে একটা বিপদ-আপদ ঘটলে বাড়ির কর্তার বুকের মধ্যে কেমন করে, আপনারা কি বুঝবেন! সামান্য একটু কিছু ঘটল তো সব কাজ পণ্ড হতে বসল। যাই হোক ভগবানের দয়ায় সুস্থ যখন হয়েছেন, গাড়ি করে এবার ওঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দি, কি বলেন? বাড়ি কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথ। ইনি মেয়েটির স্বামী।'

ডাক্তার দু'জনের মধ্যে যার বয়স কম সে একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। জ্যোতির্ময়ের দিকে এক নজর চাহিয়া সে হঠাৎ বলিল, 'আমি বল-

ছিলাম কি—'

পরম ধৈর্যের ভঙ্গিতে তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শান্ত-কণ্ঠে বলিল, 'বলুন ? বলুন আপনি কি বলছেন ?'

ডাক্তার ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'বাড়ি কাছে হলে আর ভাল একখানা গাড়ি পেলে নেওয়া চলে বৈ কি।'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তা ছাড়া আপনি যখন সঙ্গে যাচ্ছেন, তখন আর ভয়ের কি থাকতে পারে ?'

সুতরাং আর কারও কিছু বলিবার রহিল না, কেবল যশোদা একবার বলিল, 'আজ রাতে ঠাঁইনাড়া করা কি ভাল হবে ডাক্তারবাবু ?'

ডাক্তার কি জবাব দিল ভালমতো বোঝা গেল না। সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া গাড়ি পর্যন্ত নেওয়ার জন্য স্ট্রেচারের মতো একটা কিছুর ব্যবস্থার কথা ডাক্তার উল্লেখ করিলে যশোদা বলিল, 'থাক্, থাক্, এঁদের আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। আমিই নিয়ে যাচ্ছি ওকে কোলে করে, তাতে ঝাঁকুনিও কম লাগবে।'

শিশুর মতো অপরাজিতার শরীরটা দু'হাতে অবলীলাক্রমে বুকের কাছে তুলিয়া নিয়া যশোদা নিচে নামিয়া গেল। তাকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াই নিজে সে গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ডাক্তার ভিতরে আসিল, জ্যোতির্ময় আর সুবর্ণ সামনে বসিল।

যশোদা ডাক্তারকে বলিল, 'এইভাবেই রাখলাম, আবার নামাতে হবে তো। বার বার তোলা-নামার চেয়ে একভাবে থাকাই ভাল। কি বলেন ?'

ডাক্তার সংক্ষেপে বলিল, 'হ্যাঁ।'

দক্ষিণের গেট দিয়া গাড়ি রাস্তায় পড়িতেই যশোদা কারও সঙ্গে পরামর্শও করিল না, কারও অনুমতি চাহিল না, চালককে সোজা হাসপাতালে যাইতে হুকুম দিয়া দিল। জ্যোতির্ময় চমকাইয়া উঠিল, সুবর্ণ অস্ফুট শব্দ করিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল, ডাক্তার চুপ করিয়া রহিল।

যশোদার গা বোধ হয় বড় বেশীরকম জ্বালা করিতেছিল, ডাক্তারের লজ্জিত নীরবতাও তাকে থামাইয়া রাখিতে পারিল না, একটু পরে আবার বলিল, 'হাসপাতালে না গিয়ে কি করি বলুন ? আপনাদের মতো

ডাক্তারের ভরসায় বাড়ি নিয়ে যেতে সাহস হল না।'

ডাক্তার এবারও কিছু বলিল না।

এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের একটা ঘরে অপরাজিতার মরণ রদ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে, বাহিরে একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়া থাকে জ্যোতির্ময়, যশোদা আর সুবর্ণ। প্রিয়জনকে হাসপাতালে দিবার একটা অযৌক্তিক অসুবিধা আছে, নিজেদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই জানা থাকিলেও নিজেদের কিছু করা হইল না ভাবিয়া বড় কষ্ট হয়। একজন মরিতেছে আর এমন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা! এ যেন এক ধরনের অপরাধ।

রাত তিনটার সময় ডাক্তার জানাইল, এখন তারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাইতে পারে। না, ঠিক নিশ্চিন্ত মনে নয়, আর ভয় নাই এমন কথা ডাক্তার বলিতে পারে না, তবে এখনকার মতো বিপদটা কাটিয়া গিয়াছে। অপরাজিতা যদি নেহাত মরেই তবে তার মরিতে অন্তত দু'একটা দিন সময় লাগিবে। এমন রূঢ়ভাবে যে ডাক্তার খবরটা জানাইল তা নয়, তার কথার মোটামুটি অর্থ-টা এই।

যশোদার সঙ্গে সুবর্ণকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া জ্যোতির্ময় একাই হাসপাতালে বসিয়া রহিল। অপরাজিতাকে সে কি খুব ভালবাসে? অপরাজিতা মরিয়া গেলে খুব কষ্ট হইবে তার? উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া আর রাত্রি জাগরণের অবসাদের জন্য বোধ হয় মনটা ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

হাসপাতাল হইতে সে যখন বাহির হইল, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাস্তার আলো নেভে নাই, কিন্তু চারিদিকে দিনের আলোর আবির্ভাবের আবছা সঙ্কেত টের পাওয়া যায়। ট্রাম ও বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু জ্যোতির্ময় হাঁটিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত রাত জাগিয়া থাকার পর শহর ও শহরতলির জাগরণ আরম্ভ হইবার সময়টা এই পথ দিয়া হাঁটিতে ভাল লাগিতেছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়ার কি ভিড়টাই এই পথে আরম্ভ হইবে। শহরতলি হইতে শহরের দিকেই মানুষ চলিতে আরম্ভ করিবে বেশী, বিকালের দিকে যেন স্রোতটা ফিরিয়া আসিবে শহর হইতে শহরতলির দিকে।

পথটা এলোমেলোভাবে বহুদূর বিস্তৃত সারি-সারি রেললাইন ডিঙাইয়া গিয়াছে। ব্রিজের উপর রেলিঙে ভর দিয়া জ্যোতির্ময় একটু দাঁড়াইল। ওয়াগন বাছাই করিবার জন্য ইস্পাতের রেখার দুর্বোধ্য আর জটিল রেখাচিত্র দিয়াই শহর ও শহরতলিকে যেন ভাগ করা হইয়াছে। উঁচু থামের উপর হইতে এদিকে ওদিকে জোরালো আলো ফেলিয়া কোনো কোনো লাইনের কিছু কিছু অংশ আলোকিত করা হইয়াছে, বাকিটা আবছা আলো-অন্ধকারে ঢাকা। ব্রিজের দু'পাশে বহুদূর পর্যন্ত অসংখ্য ওয়াগন বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কয়েকটা ওয়াগন ইঞ্জিনের ঠেলা খাইয়া আপনা-আপনি একদিকে চলিয়াছে, লিভার ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে এক লাইন হইতে আরেক লাইনে। দু'দিকে কাছে ও দূরে থামের মাথায় বসানো সিগন্যালের অনেকগুলি লাল-নীল আলো, মানুষের হাতের সঞ্চরণশীল আলোর নড়িয়া নড়িয়া দূরের মানুষকে দুর্বোধ্য ইঙ্গিত করা, কতবার জ্যোতির্ময় এই ব্রিজের উপর দিয়া দিনে ও রাত্রে যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু কোনোদিন খেয়ালও করে নাই ব্রিজের দু'পাশে নগরের এমন একটা রূপ বিছানো রহিয়াছে। অপরাজিতাকে সে যে বিবাহ করিয়াছে, এত কাল এক বিছানায় রাত কাটাইয়াছে, অপরাজিতার মধ্যে নিজের এক প্রতিনিধিকে আনিয়া দিয়াছে, তাও কি এতকাল সে খেয়াল করিয়াছিল?

অপরাজিতা যদি মরিয়া যায়!

কি হইবে অপরাজিতা মরিয়া গেলে? ব্রিজের দু'দিকে রেললাইনগুলি এমনিভাবেই পাতা থাকিবে, ইঞ্জিনের হুস্ হুস্ আর ওয়াগনে ওয়াগনে ঠোকাঠুকির এমনি শব্দ উঠিবে, থামের মাথার জোরালো আলো, সিগন্যালের লাল-নীল আলো, লণ্ঠন নাড়িয়া মানুষের সঙ্কেত কিছুই বদলাইবে না।

বাড়ি ফেরার পথে যশোদার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। যশোদা উনানে আঁচ দিয়াছে, আঁচ প্রায় ধরিয়া আসিল।

'কাল চাকরিতে রিজাইন দেব চাঁদের মা।'

'বেশ তো, রিজাইন দেওয়া তো পালাবে না? বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়বেন

যান।'

অপরাজিতা বাঁচিবে না আশঙ্কা করিয়াই সত্যপ্রিয় একটু ব্যস্ত হইয়া তাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল। কেবল অমঙ্গলের ভয় নয়, তার চেয়ে বেশী ভয় ছিল গোলমালের। এত টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহের আয়োজন করিয়াছে, তার মধ্যে এমন একটা উৎপাত কি মানুষের ভাল লাগে ? সে রাত্রে অপরাজিতার প্রাণটা বাহির হইবে না জানা থাকিলে হয়তো তাকে সরাইয়া দিবার জন্য অতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িত না।

পরদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় নিজেই জ্যোতির্ময়ের বাড়ি খবর জানিতে আসিল। এ বড় সহজ সম্মান ও দরদের পরিচয় নয়। জ্যোতির্ময়ের বৈঠকখানায় অল্প দামী কাঠের চেয়ারে বসিবার আগে প্রথম কথা বলিল এই : 'ইস, আপনার চোখ-মুখ যে বসে গেছে জ্যোতির্ময়-বাবু!'

জ্যোতির্ময় বলিল, 'আজ্ঞে না, ও কিছু নয়।'

অপরাজিতার খবর ? তার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, শেষ পর্যন্ত কি হইবে বলা যায় না, সে হাসপাতালেই আছে এবং সম্ভবত কিছুদিন থাকিতে হইবে।

'আপনি কিছুদিন ছুটি নিন্ জ্যোতির্ময়বাবু।'

ছুটি সম্পর্কে জ্যোতির্ময়ের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এসব বিষয়ে সত্যপ্রিয়র ব্যবস্থা বড় জটিল। ছুটি চাহিলেই দেয়, সময় সময় দরকার মনে করিলে, যেমন আজ জ্যোতির্ময়ের বেলা মনে করিয়াছে, চাহিলেও নিজে হইতে যাচিয়া ছুটি দিতে চায়। কিন্তু ছুটি যে নেয় শেষ পর্যন্ত তার হয় বিপদ। কাজ আর কাজের দায়িত্ব সত্যপ্রিয় ভাগ করিয়া দিয়াছে, যার যা করার কথা তাকে তা করিতেই হইবে, কাজ না করার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই, কোনো কৈফিয়ত নাই। সে নিজে হইতে ছুটি নিতে বলিয়াছিল, ছুটিতে থাকার সময় মানুষ কাজ করিতে পারে না, এ যুক্তিটা খুব জোরালো সন্দেহ নাই, কিন্তু জোরালো যুক্তিটা শুনাইবার সুযোগ তো সত্যপ্রিয় কোনোমতেই সৃষ্টি করিবে না! কাজ কেন হয় নাই সে কৈফিয়ত আজ পর্যন্ত সত্যপ্রিয় কারও কাছে স্পষ্ট ভাষায় দাবি

করিয়াছে কি না সন্দেহ, কিন্তু রাগ যে সে করিয়াছে, এ ভাবে যে চলিবে না, কাজের ক্ষতির সঙ্গে যে চাকরির ক্ষতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এই সব কি কৌশলে যেন বরাবর ভাষার চেয়েও স্পষ্ট করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়া আসিয়াছে!

জ্যোতির্ময় তাই আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আপনার নতুন প্রোগ্রামটা চালু করা হচ্ছে, এ সময়—'

সত্যপ্রিয় আবেগভরা কণ্ঠে বলিল, 'না, না, ওসব প্রোগ্রাম-ট্রোগ্রামের কথা নিয়ে আপনি আর এখন মাথা ঘামাবেন না জ্যোতির্ময়বাবু।'

এ সব কথার অর্থও জ্যোতির্ময় জানে। সত্যপ্রিয় সকলকেই এমনিভাবে দরদ জানায়, সকলের প্রতিই এমনি উদারতার পরিচয় দেয়। কিন্তু সত্য সত্যই যদি কোনো মূর্খ এই দরদ আর উদারতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বসে, দু'দিন পরে সে আর কোনোদিকে কূল দেখিতে পায় না। এ বিষয়ে সত্যপ্রিয়র একটা থিয়োরী আছে। কর্মচারীদের সে এই সব কথা বলে, বন্ধু ও আত্মীয় হিসাবে, কর্মচারী ও উপরওয়ালার সম্পর্কটা তো তাতে বাতিল হইয়া যায় না, মাসান্তে কর্মচারী মাহিনা তো গ্রহণ করে, সুতরাং কাজ সম্পর্কে আত্মীয় বন্ধু হিসাবে সে যা বলে, কাজ সম্পর্কে সে কথাগুলি প্রয়োগ করা কি কর্মচারীদের উচিত? তার মতো অবস্থার আর একজন মানুষও কি আছে সামান্য মাহিনার কর্মচারীর সঙ্গে যে এমন সহজভাবে মেলামেশা করে, বিপদে-আপদে সহানুভূতি জানায়, পরামর্শ দেয়? এই মেলামেশার অনুগ্রহটুকু বাড়তি পাওনা মনে করিয়া তাদের কৃতার্থ থাকা উচিত। প্রথম প্রথম যারা বোকামি করিয়া এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারে না, তাদের সে ক্ষমাও করে, ভবিষ্যতে সাবধান হইবার সুযোগও দেয়। কিন্তু যে পুরা টাকা মাহিনা দেয় সে প্রতিদানে পুরা কাজ চাহিবে, দরদ আর ভালবাসা দেখানোর জন্য মাহিনা দিয়া মানুষ লোক রাখে না,—এই সরল সত্যটা যার মাথায় কোনোরকমেই ঢোকানো যায় না, অগত্যাই সত্যপ্রিয় তাকে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে চরিয়া খাইবার জন্য মুক্তি দেয়।

অবশ্য, এই রকম দরদ সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করে বলিয়াই সকলে

হাসি মুখে দশ ঘন্টার জায়গায় পনের ঘণ্টা কাজ করে, তিনজনের কাজ একজনে করে। কিন্তু সত্যপ্রিয় তো করিতে বলে নাই ? যার যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করুক না, সত্যপ্রিয়র কি আসিয়া যায়, তার কাজ হইলেই হইল।

জ্যোতির্ময় তাই আবার আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে ছুটির দরকার হলেই আপনাকে বলব। এখন তো হাসপাতালেই রইল, দু'-বেলা গিয়ে শুধু দেখে আসা।'

'শ'খানেক টাকা বরঞ্চ আপনি রাখুন, চিকিৎসার জন্য যদি দরকার হয়।'

এ আরেক বিপদ। যার যা প্রাপ্য তার বেশী একটি পয়সা কোনোদিন কেউ সত্যপ্রিয়র কাছে পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না। সে যে দান করে হিসাব করিলে দেখা যায়, দানের রীতি, নীতি, প্রথা, নিয়ম, সামাজিক ও অন্যবিধ বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি হিসাবে সেটাও গ্রহীতার প্রাপ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্মচারীদের হাতে টাকা গুঁজিয়া জোর করিয়া সাহায্য করিতেও দু'একবার সত্যপ্রিয়কে দেখা গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে টাকা সত্যপ্রিয়র ফিরিয়া আসে, কোথাও আসে কাজে, কোথাও আসে বাধ্যবাধকতার প্রয়োজনীয় সম্পর্কটা বজায় থাকাতে, কোথাও আসে প্রতিহিংসায়।

সত্যপ্রিয় চলিয়া গেলে জ্যোতির্ময় স্নান করিতে গেল। খাইয়া আপিসে যাইবে। যাওয়ার পথে হাসপাতালে খবর নিয়া যাইবে।

সুবর্ণ বলিল, 'আজকেও আপিস যাবে দাদা ?'

'একবার না গেলে চলবে কেন ? সকাল সকাল ফিরে আসব।'

'কি দরকার ? রাত্রিটাও আপিসে থেকো,—সুবর্ণের মুখ বিবর্ণ, চোখ ফুলিয়া গিয়াছে। বলিতে বলিতে আবেগে বিবর্ণ মুখে রক্তের সঞ্চার হয়, মাথা ঝাঁকি দিয়া সে আবার বলে, 'বৌদি যেন মরে—মরে, মরে, মরে। ম'রে যেন তোমার হাত থেকে রেহাই পায়।'

সুধীরা চীৎকার করে বলে, 'সুবর্ণ!'

আর জ্যোতির্ময় করে কি, ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দেয় বিবাহযোগ্যা বোনের গালে, গায়ে যত জোর আছে, তত জোরের সঙ্গে। পাঁচটি

আঙুল নয়, স্বর্ণের টুকটুকে গালে, তিনটি আঙুলের ছাপ সঙ্গে সঙ্গে এমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে যে, ভয় হয় কোনোদিন বুঝি এ দাগ আর মুছিয়া যাইবে না।

আপিস যাওয়ার সময় জ্যোতির্ময় একটু ঘুরিয়া যায়, যশোদার বাড়ির গলিটার সামনে দিয়া যাইতে আজ কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল

দুপুরবেলা স্বর্ণ সুধীরাকে বলিল, 'আর তো এ বাড়ি আমার থাকা হয় না দিদি।'

সুধীরা বলিল, 'চুপ কর। বকিসনে মেলা।'

স্বর্ণ তখন গেল যশোদার কাছে।

'আর তো আমার ও বাড়িতে থাকা হয় না যশোদাদিদি।'

গালের দাগ দেখিয়া যশোদার বড় মায়া হইয়াছিল, কথা শুনিয়া মনটা বিগড়াইয়া গেল। 'মারবে না? সারারাত জেগে ভয়ে ভাবনায় পাগল হয়ে আছে মানুষটা, তাকে তুমি অমন করে বলতে গেলে কেন?'

কোথাও কি সহানুভূতি নাই? এমন কি কেউ নাই জগতে যে যুক্তি-তর্ক বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়া কোন্ অবস্থায় কে তাকে কি জন্য মারিয়াছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া, শুধু গালে চড় খাইয়া গালটা তার ফুলিয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যাকুল হয়? জগতে দরদী নাই ভাবিয়া স্বর্ণের যখন কান্না আসিতেছে, দেখা হইল নন্দর সঙ্গে। স্বর্ণের গাল দেখিয়া নন্দ যে ঠিক ব্যাকুল হইল, তা বলা যায় না, বোধ হয় বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া গেল। স্বর্ণের কাছে তাই যথেষ্ট। নন্দকেই তো সে খুঁজিতেছিল। আর কে আছে তার নন্দ ছাড়া?

'এসো তো আমার সঙ্গে।'

এখানে এই সরু গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া কি কথা বলা যায়, যে নোংরা চারিদিকে, যে দুর্গন্ধ চারিদিকে, দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলিতে গেলে হয় গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে, নয় দু'পাশের দেয়ালে গা ঠেকিয়া যায়। তা'-ছাড়া যশোদার ভয় আছে, দেখিলেই দু'জনকে সে তফাত করিয়া দিবে। বেণী দুলাইয়া স্বর্ণ হন্ হন্ করিয়া চলিতে থাকে, পায়ের স্যাণ্ডেলে শব্দ হয় চট্ চট্। পাড়ার রাস্তায় এমনভাবে স্বর্ণের সঙ্গে চলিতে গিয়া নন্দর

মুহূর্তে মুহূর্তে রোমাঞ্চ হয় আর মুহূর্তে মুহূর্তে হাত-পা যেন আড়ষ্ট হইয়া আসে। চেনা পথের দু'পাশে চেনা ঘরবাড়ি দোকানপাট সব যেন হাজার হাজার চেনা মানুষে ভরিয়া গিয়াছে, সকলে চাহিয়া দেখিতেছে সুবর্ণের চলন আর নন্দর অনুসরণ।

'একটু আস্তে হাঁট না ?'

সুবর্ণ থমকিয়া দাঁড়ায়। ঠিক তিনু, বিশু আর বেন্দার কামারশালার সামনে। লোহার পাত গরম হইতেছে, তিনু প্রাণপণে হাপরের দড়ি টানিতেছে, বিশু হাতুড়ি উদ্যত করিয়া আছে, বেন্দা লোহার পাতটি ঘুরাইয়া ফিরিইয়া আগুনে গুঁজিয়া গুঁজিয়া ধরিতেছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করে, নন্দ কি তবে সুবর্ণের সঙ্গে যাইতে চায় না ? তবে না হয় থাক্ নন্দ, সুবর্ণ একাই যাইবে ! যেদিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাইবে ! নন্দ ভাবিয়াছিল, সুবর্ণ বুঝি ব্যাকুল হইয়া হাসপাতালে ছুটিয়া যাইতেছে তার বৌদিকে দেখিবার জন্য ; কিন্তু হাসপাতালের পথ তো যেদিকে দু'চোখ যায় চলিয়া যাওয়ার পথ নয়। সুবর্ণের মুখে কড়া রোদ পড়িয়াছে, অভিমানে গাঢ় ছায়া স্পষ্ট করিয়া নন্দকে দেখানোর জন্যই সুবর্ণ যেন মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছে সূর্যের দিকে। রাধার অভিমানের জ্বালায় নন্দ নিজে কত জ্বলিয়াছে, তবু সুবর্ণের অভিমান সে চিনিতে পারে না। এতক্ষণ পরে হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া সে বলে, 'তোমার অসুখ করেছে, সুবর্ণ ?'

চেনা মানুষের কথা আর তো নন্দর মনে থাকে না, সেইখান হইতে গলা ফাটাইয়া অনেক দূরের একটা রিকশাকে ডাকিয়া আনে। রিকশায় উঠিয়া বসিয়াই সুবর্ণ অবশ্য নন্দর গায়ে গা এলাইয়া মূর্ছা যায়। কিন্তু নন্দ রিকশাওয়ালাকে বাড়ির দিকে ফিরিয়া যাইতে বলা মাত্র সচেতন হইয়া বলে, 'না না, বাড়ি নয়, ট্রাম রাস্তার দিকে যেতে বলো।'

বাড়ি আর সুবর্ণ ফিরিবে না। নন্দ যদি ফিরিতে চায়, ফিরিয়া যাক। আর যদি সুবর্ণের সঙ্গে যায় নন্দ, অনেক দূরের কোনো এক অজানা শহরে চলিয়া যায় সুবর্ণের সঙ্গে, আর নদীর ধারে ছোট একটি ঘর ভাড়া করিয়া দু'জনে বাস করে, আর নন্দ যদি সারাদিন কীর্তন করে, আর নন্দর কীর্তন শুনিতে শুনিতে সুবর্ণ যদি রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ

করে—

নন্দর পকেটে আনা পাঁচেক পয়সা ছিল, তবে স্নুবর্ণের হাতে ছিল সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল। শহরের দিকে না গিয়া শহরকে পিছনে ফেলিয়া শহরতলি ডিঙাইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলে কি ঘটিত বলা কঠিন। এদিকের শহরতলি হইতে শহরে যাওয়ার পথে যদি হাসপাতালটা না পড়িত এবং হাসপাতালে যদি অপরাজিতা না থাকিত, আর অপরাজিতার কাছে একবার শেষ বিদায় নেওয়ার সাধটা যদি স্নুবর্ণের না জাগিত, তাহা হইলেও কি ঘটিত বলা কঠিন। হয়তো কয়েকদিন পরে দু'জনে ফিরিয়া আসিত, হয়তো তাদের ফিরাইয়া আনা হইত এবং বিশ্রী একটা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া যাইত। কিন্তু অপরাজিতার খবর লইতে গিয়া জানা গেল, ঘণ্টাখানেক আগে সেও নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে, ফিরিয়া সে আর আসিবে না, ফিরাইয়া তাকে আনা যাইবে না। কেবল শরীরটাকে চিতায় তুলিয়া পুড়াইবার হাঙ্গামাটুকু করিতে হইবে।

স্নুতরাং নন্দ ও স্নুবর্ণের নিরুদ্দেশ যাত্রা আপনা হইতে বাতিল হইয়া গেল। জ্যোতির্ময় আপিস যায় নাই, আপিস যাওয়ার পথে খবর নেওয়ার জন্য হাসপাতালে ঢুকিয়া হাসপাতালেই আটক হইয়া গিয়াছে। হাসপাতালের নূতন ও পুরাতন দালানের মাঝখানে চারিদিকে চওড়া কাঁকর বিছানো পথের জন্য প্রায় সবুজ দ্বীপের মতো দেখিতে ছোট একটু গোলাকার ঘাসে ঢাকা জমি আছে। সবুজ রঙকরা গোটা তিনেক লোহার বেঞ্চিও সেখানে পাতা আছে, রোগীর খবর যারা জানিতে আসে, ইচ্ছা করিলে দরকার মতো ওখানে ফাঁকায় বসিয়া বেশী বেশী বাতাস টানিয়া বুকের ধড়্‌ফড়ানি শান্ত করিতে পারে। এখন রোদের বড় তেজ, জ্যোতির্ময় একাই একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসিয়াছিল। গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্নুবর্ণ তাকে জড়াইয়া ধরিল। স্নুবর্ণ মরিতে বলিয়াছিল বলিয়াই কি অপরাজিতা মরিয়া গিয়াছে ?

জ্যোতির্ময় ধীরে ধীরে তাকে ছাড়াইয়া পাশে বসাইয়া দেয়। বলে, 'এরকম করে না, ছিঃ! উতলা হতে নেই, মরতে বললে কি মানুষ মরে রে পাগলী ? আর তুই তো শুধু মুখে বলেছিলি মনে মনে তো চাইছিলি

তোর বৌদি বাঁচুক। কত মা পর্যন্ত কতবার রাগ করে ছেলেমেয়েকে মরতে বলে, মরতে বললেই যদি কেউ মরত—'

মনে হয়, জ্যোতির্ময় যেন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ থামিয়া গিয়া অনুতপ্ত-কণ্ঠে সে বলিল, 'ইস, গালটা যে তোর ফুলে গিয়েছে স্বর্ণ! খুব লেগেছিল না? সেই শাড়িটা তোকে কিনে দেব স্বর্ণ।'

কয়েকদিন আগে স্কুলে যাওয়ার জন্য নতুন ফ্যাশানের একটা শাড়ি চাহিয়া স্বর্ণ জ্যোতির্ময়ের ধমক খাইয়াছিল, এদিকে খরচ চলে না, নিত্য নূতন ফ্যাশানের শাড়ি! সেদিন স্বর্ণ ভাবিয়াছিল যে, হুঁ, বৌদিকে তো খুব কিনে দিতে পার, আমায় দেবার বেলাই তোমার খরচ চলে না। গালে চড় মারার ক্ষতিপূরণস্বরূপ জ্যোতির্ময় সেই শাড়িখানা কিনিয়া দিবে শুনিয়া হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গেল, অপরাজিতার রাশি রাশি শাড়ি সমস্তই এবার সে পাইবে। মনে পড়ায় স্বর্ণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অপরাজিতার শোকে নন্দর কাঁদিবার কথা নয়, মুখখানা ম্লান ও গম্ভীর করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইত, স্বর্ণকে আকুল হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া সেও চোখ মুছিতে লাগিল।

তখন দেখা গেল, জ্যোতির্ময়ের চোখ দিয়াও জল পড়িতেছে। কান্না বোধ হয় ছোঁয়াচে।

৬

পাড়ায় চার-পাঁচটি নূতন বাড়ি তৈরি হইতেছে। শহরতলির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে কয়েক বছর আগে, দিন দিন পরিবর্তন যেন দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে। শহরের লোক শহর ছাড়িয়া শহরতলিতে বাস করিতে আসিতেছে। একি একটা নূতন ফ্যাশন? ভবানীপুর কালীঘাটের মতো যেখানে ধনঞ্জয়ের মতে এককালে দিন-দুপুরে শিয়াল ডাকিত, এই শহরতলিকেও শহর ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিবে? দশ-বার বছর আগে এ অঞ্চল কি ছিল, এখন কি দাঁড়াইয়াছে, ভাবিলেও যশোদা অবাক হইয়া যায়। কাছাকাছি যে প্রকাণ্ড একটা শহর আছে, তখন তাই-বা

কে ভাবিতে পারিত ? ছড়ানো বাড়ি-ঘর, মেটে পথ, ডোবা-পুকুর, বাঁশ-ঝাড় এসব কিছুরই অভাব তখন ছিল না। সত্যপ্রিয়র বাগানবাড়িটা ছিল প্রায় জঙ্গল, বাগানবাড়ির দক্ষিণদিকে কয়েক ঘর গরীব মুসলমানের একটি বস্তি ছিল বছর তিনেক আগে তারা যে কোথায় উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর জানা যায় না। বোধ হয়, শহরতলির উত্তর দিকে যে নূতন মুসলমান পল্লীটি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। এ পাড়ায় আগেকার সেই ভাঙা ঘরের বাসিন্দা শ্রমিক শ্রেণীর গরীব মুসলমানদের বদলে এলোমেলোভাবে কয়েকটি পাকা বাড়িতে কয়েক ঘর ভদ্র মুসলমান পরিবার আসিয়াছে, এরা সকলেই চাকুরিজীবী। পরিষ্কার বেশভূষা করিয়া পরিশ্রমের অভাবে বেঢপ শরীর লইয়া নয়-দশটার সময় প্রত্যেক দিন এদের ট্রামের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হইয়া ছুটিতে দেখিলে সেই অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান পরিবার কয়েকটির জন্য যশোদার কষ্ট হয়।

তবে শহরতলির ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে যশোদার কোনো নালিশ নাই,—যদি তার মনের মতো শহরে পরিণত হয়। এ বিষয়ে বড় আশ্চর্য ও নিখুঁত কল্পনা আছে যশোদার, তার এই পাড়াকে কেন্দ্র করিয়া এই শহরতলিকে সে বড় শহরটির সঙ্গে সংলগ্ন একটি সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন, সুশ্রী নগররূপে কল্পনা করিতে পারে। সে নগরে পল্লীর সবুজ রূপের বাহুল্য নাই, নগরবাসীর জীবন পল্লীবাসীর জীবনের মতো সহজ-সরলও নয়। পল্লীর সঙ্গে যশোদার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু পল্লীর রূপ তার চোখে পড়ে না, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পচা জলের ডোবা-পুকুর, নোংরা পথঘাট, জীর্ণ ঘরবাড়ি-ক্ষেত-খামারের মন-ভুলানো, চোখ-জুড়ানো শ্রী তার মানস-নয়নে পর্যন্ত অতি বিশ্রী ঠেকে এবং ঘষা পড়ার অভাবে পল্লীবাসীর বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা বলিয়াই শহরবাসীর চেয়ে তাদের সরলতা কেন বেশী হইবে যশোদা বুঝিতে পারে না, সঙ্কীর্ণ জগতে একঘেয়ে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে বলিয়া জীবনটাই বা তাদের শহরবাসীর চেয়ে সহজ হইবে কেন তাও যশোদা বুঝিতে পারে না,—পল্লীবাসীরাও তো কম গরীব নয়? যশোদার কল্পনার নগর তাই শহররূপী

গ্রাম নয়, শহরই বটে। নগরের পথে ট্রাম চলে, পথের দু'পাশে পাঁচ-সাততলা বাড়ি থাকে, দোকানথাকে, সিনেমা থাকে, পার্ক থাকে, গলি থাকে, হাজার হাজার মানুষ থাকে, অনেক কিছুই থাকে শহরের। কেবল সেই সঙ্গে সঙ্গে থাকে সামঞ্জস্য, বড় বাড়ির আড়ালে ছোট বাড়ির ফাঁপর লাগে না, গলি-ঘুঁজির গোলকধাঁধা থাকে না, নাকেও লাগে, গায়েও ন্যাপটাইয়া যায় এমন ভ্যাপ্সা দুর্গন্ধ কোনো গলিতে কোনো বাড়িতে পাওয়া যায় না, আর—

আর, সত্যপ্রিয় অবশ্য মোটরে চড়িয়াই বেড়ায় যশোদার নগরে, কিন্তু যশোদা যে কুলীমজুরদের সঙ্গে ঘর করে, তারা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিতে পায়, দরকার মতো স্ত্রী পায়, জীবনটা উপভোগ করার মতো অবসর পায়,—আর? আর কি পায়? পেট ভরিয়া খাইতে পায়, পরিষ্কার জামাকাপড় পরিতে পায়, দরকার মতো স্ত্রী পায়, জীবনটা উপোভোগ করার মতো অবসর পায়,—আর? মনে মনেও তার আদরের হতভাগাগুলোকে পাওয়াইয়া দেওয়ার ব্যাপারে যশোদা তেমন পটু নয়! কত কিছু কাম্য আছে মানুষের, কত কিছু পাইতে পারে মানুষ, কত কিছু পাইয়াছে মানুষ, কিন্তু এদের দেওয়ার সময় যশোদা যেন সে সমস্তের হদিস পায় না, এদের যেন ধন-মান স্বাস্থ্য সুখ তেজ শক্তি জ্ঞান বুদ্ধি রূপ যশ এ সমস্তের সত্যই দাবি থাকিতে নাই। কিন্তু এদের পেটের জ্বালা, রোগ শোক দুঃখ গ্লানি অভাব অভিযোগ মনোবিকার এ সমস্ত ম্যাজিকের মতো দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা যশোদার কল্পনায় আশ্চর্য রকম আছে। এদের দুর্দশা দেখিতে দেখিতে কল্পনা-বোধ হয় তার হইয়া গিয়াছে ভোঁতা, তাই অসম্ভব স্বপ্ন দেখিতে পারে না, ভিখারীকে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ করিতে যে কেউ তাকে বারণ করে নাই এটা ভুলিয়া গিয়া শুধু বলিতে পারে, আহা, খোঁড়া পা নিয়ে তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, তোমার কষ্ট কমুক, তোমার দুঃখ দূর হোক।

খোঁড়া ধনঞ্জয়ের কাঠের পা আসিয়াছে। পাড়ায় চাঁদা তুলিয়া আর নিজে কয়েকটা টাকা দিয়া যশোদাই তাকে কৃত্রিম পা'টি কিনিয়া দিয়াছে। যশোদার শত্রু আর ছেলেবেলার সখী কুমুদিনী চার আনা চাঁদা দিয়া

বলিয়াছে, 'আর কেন ভাই, এবার মায়া কাটিয়ে বিদেয় দে। লোকে যে নিন্দে করছে ভাই?'

'কেন নিন্দে করছে? কিসের নিন্দে?'

'কচি খুকিটি কিনা, বোঝ না কেন নিন্দে করছে, কিসের নিন্দে!'

যশোদার ন্যাকামিতে ক্ষুব্ধ হইয়া মুখ নাড়া দিলেও কুমুদিনী বুঝাইয়া বলে। বলে যে, মানুষটা যতদিন দু'পায়ে খাড়া ছিল, চেহারা যেমন হোক দশজনের একজন হইয়া বাড়িতে বাস করিত, লোকে হাসিতামাশা করিলেও তেমন কিছু বলিত না—হয়তো ভাবিতও না। কিন্তু এখন পা কাটা যাওয়ার পরেও যশোদা যদি তাকে ঘরে রাখিয়া পোষে, সকলকে অবহেলা করিয়া কেবল তাকে নিয়াই দিনরাত মাতিয়া থাকে, কাঠের পা কিনিয়া দিবার জন্য সকলের কাছে চাঁদা পর্যন্ত আদায় করিতে শুরু করে—

যশোদা ফোঁস করিয়া ওঠে, 'কেন, সেবারে গগনার পা কাটা গেলে ঘরে রেখে পুষি নি তাকে? কাঠের পা কিনে দিই নি চাঁদা তুলে?'

কুমুদিনী বিজ্ঞের মতো বলে, 'সে হল আলাদা কথা।' তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলে, 'যাক্‌গে ভাই যা খুশী করগে ভাই তুই, কলঙ্কে আর ডর কি তোর, বোঝার ওপর শাকের আঁটি বৈ ত নয়। ছেলেবেলা সই পাতিয়েছি, তাইতে বলা, নয় তো আমার কি এলো গেলো।'

সামনাসামনি এমনভাবে কথা কুমুদিনী সচরাচর বলে না। চার আনা চাঁদা দিতে হওয়ায় গায়ে এত জ্বালা ধরিয়াছে না কি তার? কে জানে, হয়তো ধনঞ্জয় আর তাকে নিয়া সত্য সত্যই খুব একচোট আলোচনা, গবেষণা আর নিন্দা চলিতেছে।

তারপর যশোদার কানে আসে, এ কাজে সুধীরের উৎসাহই নাকি সকলের চেয়ে বেশী, সত্য মিথ্যা কত কথাই যে সে রটাইয়া বেড়াইতেছে! এখনও সুধীরের ক্ষোভ থাকিবার কোনো কারণ যশোদা ভাবিয়া পায় না। কালোকে নিয়ে সে বরং এমন মশগুল হইয়া পড়িয়াছে যে দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অল্লের জন্য যশোদার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য অদৃষ্টকে তার ধন্যবাদ দেওয়াই বেশী স্বাভাবিক। সুধীরের যে পরি-

বর্তন ঘটিয়াছে,—গ্রীষ্মের তৃষ্ণাতুর পশুর একেবারে শ্রাবণের ধারা-জলে লুটোপুটি করার মতো—দেখিলে হাসিও পায় করুণাও হয়। ছায়ার মতো যে যশোদার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যশোদার চলাফেরা লক্ষ্য করিত, মুখ দেখিলে মনে হইত এই বুঝি সর্বনাশ ঘটিল, বহু-দিনের উপবাসী বাঘের মতো এই বুঝি সে ঝাঁপাইয়া পড়ে হুঙ্কার দিয়া যশোদার ঘাড়ে—সেই সুধীর এখন যশোদার ধারে কাছে ভিড়িতে চায় না, কেবলি এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে, সামনে পড়িলে এদিক ওদিক তাকায় আর কখনো কখনো বোকার মতো একটু হাসে আরও বেশী বোকার মতো জিজ্ঞাসা করে, কি খবর চাঁদের মা ? চালচলন বদলাইয়া গিয়াছে সুধীরের, মেজাজ নরম হইয়াছে, শুকনো বাকলের মতো রুক্ষ কঠিন মুখের চামড়ার ভিতর হইতে একটা কোমল আস্তরণের হদিসও যেন পাওয়া যাইতেছে না ? একটি কালো সোনার কাঠির ছোঁয়াচে মানুষটার মধ্যে যেন পলকে পলকে পরিবর্তনের ভেল্‌কি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

'নিন্দে করে নাকি বেড়াচ্ছ তুমি আমার ?'

সুধীর জবাব দিবার আগেই কালো তাড়াতাড়ি বলে, 'না দিদি না, মিথ্যে লাগিয়েছে তোমার কাছে মানুষে।'

যশোদা চোখ পাকাইয়া বলে, 'তুই চুপ কর ছুঁড়ি, তোকে বলি নি আমি। কেঁউ কেঁউ করতিস দু'দিন আগে কুকুর বাচ্চার মতো, বড় মুখ ফুটেছে, না ?'

সুধীর ক্ষুব্ধ হইয়া বলে, 'গাল দিও না চাঁদের মা।'

কতবার কত কারণে রাগ করিয়াছে যশোদা, এমন কালো মেঘের ছায়া কে কবে তার মুখে ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়াছে ?—'গাল দেব না ?—গাল দিতে বারণ করলে ? কথা কইলে যদি না সয়, যাও না চলে এখান থেকে ? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে থাকতে ? পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে যাও দু'জনে।'

বলিয়া যশোদা নিজেই গট্‌গট্ করিয়া বাহির হইয়া যায়, পরক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলে, 'আজ পর্যন্ত একটি পয়সা

দিলে না, এম্‌নি করে তো দেনা শোধ হবে না সুধীর। আজকে ভাড়া চুকিয়ে দিও, ও-মাসের আর পাঁচটি টাকা দিও দেনার জন্যে। আচ্ছা, পাঁচটাকা না পার, তিনটে টাকাই দিও।'

তারপর যশোদার রাগটা কমিবার সময় দিয়া রাত্রে কালোকে সুধীর তার কাছে কাঁদাকাটা করিতে পাঠাইয়া দেয়। সুধীর নয়, অনেকেই তার নিন্দা করিতেছে এ খবরটা আবিষ্কার করিয়া যশোদার রাগটা কমিয়া আসায় কালোকে সে বলিয়া দেয় যে, আচ্ছা যা, মাইনে পেলে দিতে বলিস।

এতদিন ধনঞ্জয়কে যশোদা ঘরে ভাত দিয়া আসিয়াছে, আজ বাহিরে আসিয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া খাইবার ডাক পড়িল।

'উঠতে পারি না যে চাঁদের মা?'

'খুব পারবে। চেষ্টাই করে ছাখো পার কি না।'

'বড় লাগে চাঁদের মা।'

'পেরথম পেরথম লাগবে না? তাই বলে শুয়ে বসে দিন কাটালে চলবে নাকি, অভ্যাস করতে হবে না চলা ফেরার?'

'উঠলে যে মাথা ঘোরায় চাঁদের মা?'

'পেরথম পেরথম মাথা একটু ঘোরায়।'

আজ যশোদার প্রথম খেয়াল হয় ধনঞ্জয় সত্য সত্যই বড় বেশী আহ্লাদে হইয়া পড়িয়াছে. আছুরে ছেলের মতো তার ঘেনঘেনানির অন্ত নাই। নিজের ছুরদৃষ্টের কথা ছাড়া মুখে তার কথা শোনা যায় না, পা কাটা যাওয়ায় যন্ত্রণায় সে যত না কাতরাইয়াছিল এখন পায়ের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর নিজের পোড়া কপালের নিন্দা করিয়া সে যেন তার চেয়ে বেশী কাতরায়। তার কথা বলার ভঙ্গিতে যেন ভিক্ষুকের সকরুণ আবেদন-নিবেদনের ধ্বনি শোনা যায়। এত যে আরামে যশোদা তাকে রাখিয়াছে, এত সেবা-যত্ন করিতেছে প্রাণপাত করিয়া, কাছে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার একঘেয়ে নালিশ শুনিয়াছে আর আশা ও ভরসার কথা শুনাইয়াছে, কিছুতেই ধনঞ্জয়ের তৃপ্তি হয় নাই, সহানুভূতির উগ্র পিপাসা কমে নাই। নিজের ছুঃখের কথা বলিতে বলিতে

সে অহোরাত্রি কাঁদিতে চায়, সেই সঙ্গে কাঁদাইতে চায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। যশোদার কাছে তার যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এ কথাটিও সে যেন ধীরে ধীরে ভুলিয়া গিয়াছে, যশোদার কাছে এ সব যেন তার পাওনা ছিল। পা কাটিয়া পঙ্গু হওয়ার জন্য তার এই দাবি জন্মিয়াছে।

ধনঞ্জয় মুখ ভার করিয়া পায়ে কাঠের পা'টি আঁটিতে যায়, যশোদা বলে 'শুয়ে থেকে থেকে মাথাও কি খারাপ হয়ে গেছে তোমার ? এখান থেকে ওখানে গিয়ে খেতে বসবে, ওটা আঁটছ যে ?'

ধনঞ্জয় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে, 'আর পারি না চাঁদের মা, সত্যি বলছি আর পারি না আমি। আমি কেন মরলাম না চাঁদের মা ?'

'হয়েছে, এসো এবার।'—নির্বিকারভাবে এই কথা বলিয়া যশোদা আরো বেশী নির্বিকারভাবে চলিয়া যায়। আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না মানুষটাকে, এবার হইতে একটু শক্ত হইতে হইবে।

পরদিন সকালে কাশীবাবু আসিয়া হাজির।—'কেমন আছ চাঁদের মা ?' রাস্তায় ঘষিয়া মুখের যেখানে যেখানে চামড়া তুলিয়া দিয়াছিল যশোদা, সেই জায়গাগুলি এখনও সাদাটে হইয়া আছে। মুখখানা কিন্তু হাসি হাসি। পরমাত্মীয় যেন দেখা করিতে আসিয়াছে।

'বসুন। আপনি ভাল তো ?'

অনেকক্ষণ বসিয়া কাশীবাবু আজে বাজে গল্প করে, শ্রমিকদের কথা বলে, মিল পরিচালনার কথা বলে—সব অর্থহীন ভাসা ভাসা কথা। এ বাড়ির বাসিন্দা তারই মিলের শ্রমিকরা যশোদার বাড়িতে রোয়াকে বসিয়া যশোদার সঙ্গে তাদের ম্যানেজারবাবুকে আলাপ করিতে দেখিয়া একটু অবাক হইয়া যায়,—ভাবে যে এতদিনে বুঝি সত্য সত্যই তাদের দাবিগুলি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইবে, কাশীবাবু ওই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্যই আসিয়াছে। কাশীবাবু কিন্তু সে আলোচনার ধার দিয়াও যায় না, যশোদা নিজে কথাটা তুলিলে আশ্বাস দিয়া শুধু বলে যে, সত্যপ্রিয় নিজে খোঁজখবর নিতেছেন, প্রায়ই মিলে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যান যথাসময়ে তিনিই সব ব্যবস্থা করিবেন।

ভাসা ভাসাভাবে একটা খবর যশোদার কানে আসিয়াছিল, সত্যপ্রিয় নাকি গবর্নমেন্টের বড় একটা কণ্ট্রাক্ট পাইয়াছে অথবা শীঘ্রই পাইবে, মিল বড় করা হইবে, উৎপাদন দু'গুণ তিনগুণ বাড়াইয়া ফেলা হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কাশীবাবু একটু থতমত খাইয়া গেল।—'কই না, আমি তো কিছু জানি না ? কত গুজব বাজারে রটে।'

একেবারে বিদায় নেওয়ার আগে যশোদার বাড়িতে আসিবার আসল কারণটি কাশীবাবু ব্যক্ত করে। সত্যপ্রিয় তাকে পাঠাইয়া দিয়াছে—অনুতপ্ত ও লজ্জিত সত্যপ্রিয়। সত্যপ্রিয় মিলে একটি চাকরি খালি আছে, ভাল চাকরি, ষাট টাকা বেতন। নন্দকে এই চাকরিতে ভর্তি করিয়া নেওয়ার জন্য কাশীবাবুর উপর হুকুম আসিয়াছে।

—'কি চোখেই যে চক্কোত্তিমশাই তোমায় দেখেছেন চাঁদের মা। কপাল তোমার ভাল।'

যশোদা উদাসভাবে বলিল, 'কি জানি কপাল ভাল কি মন্দ!'

সত্যপ্রিয়র এ উদারতায় যশোদা একটুও মুগ্ধ হইয়া যায় না। মনটা বরং তার খারাপ হইয়া যায়। ধীরে সুস্থে নন্দকে আগের চাকরিটির মতো সাধারণ একটি চাকরি দিলে কোনো কথা ছিল না, পঁচিশ টাকার বদলে না হয় বেতনটা এবার ত্রিশ টাকাই হইত। কিন্তু অনুগ্রহের এ-রকম বাড়াবাড়ির একটিমাত্র অর্থ হয়—শ্রমিকদের দাবি মেটানো সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় যে কথা দিয়াছিল, সেটা পালন করিবার ইচ্ছা তার নাই। তাই ভাইকে মোটা মাহিনার চাকরি দিয়া যশোদাকে সে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। শ্রমিকদের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পালনের সময় পার হইয়া গেলেও যশোদা যাতে গোলমাল না করিয়া চুপ করিয়া থাকে। যশোদার কথায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট বন্ধ করিয়াছিল, যশোদা চুপ করিয়া থাকিলে তারাও চুপ করিয়া থাকিবে।

এখন সমস্যা হইল, নন্দকে সে চাকরি করিতে যাইতে দিবে কি না। দু'তিন মাসের বেশী চাকরি নন্দর থাকিবে না, ধর্মঘটের উপক্রম হইলেই আবার তার চাকরিটি খসিয়া যাইবে এবং নন্দর চাকরির খাতিরে ধর্মঘট যশোদা বন্ধ রাখিবে না, স্থগিতও করিবে না, সত্যপ্রিয় যদি কথা

না রাখে এবার ধর্মঘট ঘটাইয়া যশোদা এস্পার ওস্পার একটা কিছু করিয়া তবে ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু সত্য সত্যই কি সত্যপ্রিয় মতলব আঁটিয়াছে যশোদাকে হাত করিয়া শ্রমিকদের একেবারে ফাঁকি দিবে? নন্দকে চাকরি করিতে না পাঠাইয়া সত্যপ্রিয়কে চটাইয়া দেওয়া কি সঙ্গত হইবে?

রাত্রে নন্দকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'চাকরি করবি নন্দ? নাই বা করলি!'

নন্দ জোর দিয়া বলে, 'না, চাকরি করব। চাকরি ছাড়া আমার চলবে না।'

'কেন চলবে না? দু'তিন মাসের পর আবার তো খেদিয়ে দেবে তোকে—কি এমন রাজা হবি তুই দু'তিন মাস চাকরি করে!'

নন্দ আবার জোর দিয়া বলে, 'খেদিয়ে দেবে কেন? এবার আর খেদিয়ে দেবে না।'

শুনিয়া সন্দিগ্ধভাবে যশোদা জিজ্ঞাসা করে, 'কি করে জানলি তুই?'

'চক্কোত্তিমশাই নিজে বলেছে।'

শুনিয়া আরও বেশী সন্দিগ্ধ হইয়া, যশোদা জিজ্ঞাসা করে, 'তুই বুঝি চাকরির জন্যে চক্কোত্তিমশায়ের কাছে গেছলি নন্দ?'

নন্দ সাড়া দেয় না। রাগে দুঃখে অভিমানে যশোদাও অনেকক্ষণ গুম খাইয়া থাকে। অন্ধকার ঘরের দুই প্রান্তের দু'টি চৌকিতে ভাই-বোনের অস্বাভাবিক নীরবতা অন্ধকারকে যেন কুৎসিত করিয়া দেয়, সরু গলিটার মধ্যেই কেবল যে ভাপ্‌সা গন্ধ চিরস্থায়ী হইয়া আছে, ঘরের মধ্যেও যেন হঠাৎ সেই গন্ধের হদিস মেলে—অন্তত তাই মনে হয় যশোদার।

'আমায় একবার বল্‌তেও পারলি না নন্দ? তুই কি কচি খোকা যে, তোকে আমি আটকে রাখতাম?'

'চাকরি ছাড়া আমার চলবে না দিদি।'

একটা রহস্যময় ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে দু'জনের মধ্যে। যশোদা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানা যাইবে না, এত-কাল পরে নন্দর জীবনে এমন একটা গোপন কিছুর আমদানি হইয়াছে নন্দর যা নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পদ, দিদিকে সে ভাগ দিতে পারিবে না।

তাকে ডিঙাইয়া সত্যপ্রিয়র কাছে চাকরি ভিক্ষা করিতে যাওয়া শুধু চাকরির লোভে নয়—এতক্ষণে নন্দ তাহা হইলে কাঁদ কাঁদ হইয়া কথা বলিত, এমন তেজের সঙ্গে ঘোষণা করিতে পারিত না যে চাকরি ছাড়া তার চলিবে না, তাই সে চাকরি সংগ্রহ করিয়াছে, যশোদাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে নাই।

তবু যশোদা জেরা করে। তবু সে জানিতে চায়, চাকরির এত দরকার তার কেন হইল। নন্দ যে কৈফিয়ৎ দেয় তাতে যশোদা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়। তার ভাই নন্দ, তার নিজের হাতে মানুষ করা রুগ্ন আর ভাবপ্রবণ অপদার্থ নন্দ, সে কিনা আজ তাকে শোনায় যে, বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইলে তো চলিবে না, জীবনে একটু উন্নতির চেষ্টা তো করিতে হইবে তাকে ? বুড়া মানুষের মতো এই সব কথা বলিয়া আসল কথাটা গোপন করিয়া রাখে তার কাছে !

বিষাদের স্বাদ যশোদা প্রায় জানেই না, বিষাদ যদি কখনও ঘনাইয়া আসে তার বাহন হয় চাঁদের জন্য শোক। তাও খুব বেশী প্রশ্রয় পায় না যশোদার কাছে, পুত্রশোকে কাতর হওয়ার অবসরই বা তার কই ? আজ চাঁদের কথা মনে পড়ে না, তবু গাঢ় বিষাদে তার যেন ঝিম ধরিয়া যায়, ঘুমের বদলে দু'চোখ ভরিয়া আসে, চোখের পাতা খানিকক্ষণ খুলিয়া রাখা আর খানিকক্ষণ বন্ধ করার উত্তেজিত অবসাদ। আর হ্যাঁ, আজ নিজেকে তার অসহায় মনে হয়, মনে হয় জীবনটা তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে,—এত কাল কেন বাঁচিয়াছিল যশোদা, ভবিষ্যতে কেন বাঁচিবে ?

সকালে নিজেকে একটু অসুস্থ মনে হয়। তবে রাত্রের অনুভূতিগুলি রাত্রেই বিদায় হইয়া গিয়াছে। বিষাদও নাই, নিজেকে অসহায় মনে করাও নাই, জীবনের ব্যর্থতা বা সার্থকতা নিয়া মাথা ঘামানোও নাই। নন্দকে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিয়া আসিবার জন্য সোজা-সুজি সে গিয়া সত্যপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করে।

সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, 'ষাট টাকা মাইনের চাকরি করবার যুগ্যি ছেলে তো আমার ভাই নয় চক্কোত্তিমশায়, ওকে যে নিচ্ছেন, ও কি

পারবে ?'

সত্যপ্রিয় মৃদু হাসিয়া বলে, 'তুমি একেবারে চম্‌কে গেছ দেখছি। ভাবছ, কি জানি কি মতলব আছে লোকটার, যেচে এমন একটা চাকরি দেয় কেন ভাইকে। ভাবছ তো ? মতলব একটা আছে বৈ কি। মিলে নন্দর চাকরি নামমাত্র, আসলে ও চাকরি করবে আমার। বড় সুন্দর কীর্তন করে তোমার ভাই, সেদিন শুনে সবাই প্রশংসা করেছে। মাঝে মাঝে আমার এখানে কীর্তন করবে, এইজন্য ওকে চাকরি দিয়েছি। নিজের পকেট থেকে মাইনে গুণতে হত, তার বদলে মিল থেকে যাতে মাইনেটা পায় আর আমারও কীর্তন শোনা হয়, সেই রকম একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

যশোদা আশ্চর্য হইয়া বলে, 'কিন্তু মিলও তো আপনার ?'

সত্যপ্রিয় তেমনিভাবে মৃদু মৃদু হাসে, 'মিল আমার বটে, কিন্তু মিলের টাকা আলাদা, আমার টাকা আলাদা! কপালের কথা বলো কেন, এতগুলি ব্যবসা আমার, কোনো একটা ব্যবসা থেকে পাঁচটি টাকা নিজের জন্য চাইতে পারি না!'—যশোদার মুখ দেখিয়া আবার বলে, 'ওসব বড় গোলমেলে ব্যাপারের কথা, ওসব তুমি বুঝবে না। কোনো ব্যবসার শেয়ার-হোল্ডার আছে, কোনো ব্যবসার স্লিপিং পার্টনার আছে, কোনো ব্যবসার আমি শুধু ম্যানেজিং এজেন্ট—তাছাড়া, আসল ব্যাপারটি কি জান, লাভ হলে লাভটি নেব, লোকসান হলে আমার গায়ে লাগবে না, এই হল ব্যবসার মূল কথা। কত প্যাঁচ কষতে হয়, কত নিয়ম করতে হয় তার ঠিকানা আছে! নিজে নিয়ম করে নিজে তো ভাঙতে পারি না ? আমিই সব, আমারি সব—তবু আমি কেউ নই, আমার কিছুই নয়। বছর বছর ব্যাঙ্কের টাকা যে আমার কি করে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, নিজেই ভাল বুঝতে পারি না। এইখানে বোসো তুমি, একটা কাগজে সই করে দিচ্ছি, এক ঘণ্টার মধ্যে লাখ টাকা এসে হাজির হবে তোমার সামনে।'........

বলিতে বলিতে সত্যপ্রিয় রীতিমতো উৎসাহিত হইয়া ওঠে, বোঝা যায় টাকার কথা বলিতে তার মজা লাগিতেছে। জীবনে একটি কাজ সে

করিয়াছে জীবন দিয়া, এও একটা সাধনা বৈ কি। কিন্তু এ সাধনার ফাঁকি যশোদা জানে, একটা সীমায় ঠেকিবার পর এ সাধনা একঘেয়ে হইয়া যায়, সেইখানে সাধনার সমাপ্তি, তারপর কেবল জের টানিয়া চলা। সত্যপ্রিয় এখন তাই করিতেছে। ব্যাঙ্কে টাকা জমানো আর খোলামকুচি জমানোর মধ্যে আর বিশেষ কোনো পার্থক্য এখন নাই। যত বড় পেটুক হোক, কত আর খাইতে পারে মানুষ ?—এইভাবে কথাটা যশোদা বিচার করে। বড়লোকের দান সম্বন্ধেও তার তাই বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা নাই। কোটিপতিরা লাখ টাকার হাসপাতাল স্থাপন না করিলেই বরং সে একটু আশ্চর্য হয়, যেমন আশ্চর্য হয় ময়রার দোকানের পেটুক মালিক যদি অমাবস্যার নিশিপালন না করে।

যশোদাকে অভিভূত হইতে না দেখিয়া সত্যপ্রিয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়। নন্দকে চাকরি দিবার কারণটা জানিয়া যশোদা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরিয়া যায়।

পরদিন কাশীবাবু আবার আসে, আবার বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যাওয়ার সময় নন্দকে একেবারে সঙ্গে নিয়া যায়। এবার নন্দ একেবারে চাকরির দলিল নিয়া বাড়ি ফেরে, একমাসের নোটিস না দিয়া কার ক্ষমতা আছে নন্দকে এবার বরখাস্ত করে ? করিলে, একটি মাসের বেতন মাগ্‌না দিতে হইবে, চালাকি নয় নন্দর সঙ্গে !

'কি করতে হবে তোকে ?'

'কিছু না দিদি, কাশীবাবুর ঘরে একটা চেয়ারে বসে থাকব আর কাশী-বাবু যা বলবেন করব। আজকে শুধু সঙ্গে করে মিলটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কাল থেকে কাজ আরম্ভ।'

পরদিন নন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সারাদিনে সে ঘণ্টাখানেক খাতা লিখিয়াছে, দু'বার কাশীবাবুর হুকুমে মিলটা ঘুরিয়া আসিয়াছে, আর একবার গিয়া একটি লোককে কাশীবাবুর কাছে ডাকিয়া আনি-য়াছে। বাপ-মা তুলিয়া গালাগালি দিয়া কাশীবাবু লোকটিকে দিয়াছে তাড়াইয়া।

যশোদা বলিল, 'এ আবার কেমন ধারা চাকরি রে বাবা !'

রাত্রে বিতাড়িত লোকটি যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। তার নাম ভুবন, ধর্মঘটে সে একজন পাণ্ডা ছিল। আসিয়াই সে বলিল, 'বেশ দিদি, বেশ! ভাইকে দিয়ে শেষকালে আমারি ঘাড় ভাঙলে?'

'কি বলছ তুমি ভুবন?'

'যেন জান না কিছু, ন্যাকা ঠাকরুণ! আমিও এর শোধ তুলব, সর্বনাশ যদি না করি তোমার আমি—'গট্‌গট্ করিয়া ভুবন চলিয়া গেল। যশোদা ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। ভাবিল, নন্দকে দিয়া কাশীবাবু ডাকাইয়া আনায় বলিয়া সে বুঝি রাগ করিয়াছে। ব্যাপারটা কিন্তু তার মনের মধ্যে খচখচ করিতে লাগিল। নন্দকে দিয়া কাশীবাবু ডাকাইয়া আনে কেন ভুবনকে? ভুবনকে ডাকিবার লোকের কি তার অভাব ঘটিয়াছিল?

এদিকে সত্যপ্রিয় মিলে চাকরি যাওয়ার যেন মরসুম পড়িয়া গেল। একদিন যায়, দু'দিন যায়, নন্দ আসিয়া খবর দেয়, সেদিনও সে ভুবনের মতো একজনকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, কাশীবাবু গালাগালি দিয়া তাকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

'ব্যাপার কি মতি?'

মতি ভয়ে ভয়ে বলিল, 'তাতো জানি না চাঁদের মা।'

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিতে সেও গম্ভীর মুখে বলিল, 'জানি না।'

যশোদা বলিল, 'তোমাদের কি হয়েছে বল তো? আমাকে যেন সবাই কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলছ ক'দিন থেকে?'

'তোমার এখন কর্তাবাবু, কাশীবাবু, এনাদের সঙ্গে ভাব, আমরা কি তোমার সঙ্গে মিশতে সাহস পাই!'

যশোদা লম্বা করিয়া টানিয়া বলিল, 'ব—টে! বড় যে লম্বা-চওড়া কথা শিখেছ দেখছি!'

সুধীর রাগিয়া বলিল, 'যাও যাও, কি আর ক্ষেতি করবে তুমি, না হয় কাজ থেকে তাড়াবে। গতর থাকলে ঢের কাজ পাব।'

'কাজ থেকে তাড়াব মানে?'

মানে সুধীর বলিল না, গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কালোর মুখখানাও

অন্ধকার, একদিন যে কালো সুধীরকে তাড়াতাড়ি হাজত হইতে ফিরাইয়া আনার জন্য যশোদার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিল। একরকম যশোদাই তো সুধীরকে সত্য সত্যই শেষ পর্যন্ত হাজত হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল।

যারচেষ্টায় এখনও হাজতে পচার বদলে পরদিনই সুধীর আসিয়া কালোর মুখে হাসি ফুটাইয়াছিল, আজ তার দিকে কেমনভাবে চাহিয়া আছে ছাখো মেয়েটা, যেন যশোদার মতো শত্রু তার আর নাই! আপসোস করিয়া কি হইবে, মেয়েমানুষ এমনি অকৃতজ্ঞই বটে।

কিন্তু কেবল কালো তো নয়? জগৎ আর মতিরই বা কি হইল?

দু'দিন পরে কাজ গেল জগতের, তার পরদিন মতির।

পায়ে পায়ে কাছে আসিয়া কালো বলিল, 'কাজ থেকে শেষ পর্যন্ত তাড়ালে দিদি? ধন্যি তুমি।'

'কি বলছিস তোরা কালো? ডাক তো জগৎকে আর সুধীরকে।' কিন্তু তারা কেউ আসিল না।

পরদিন মতি বলিল, 'তুমিই কাজ খসালে, এবার থেকে তুমিই তবে খেতে দিও চাঁদের মা!'

যশোদা বলিল, 'এসো তো মতি আমার সঙ্গে।'

মতিকে সঙ্গে করিয়া সে গেল জগতের ঘরে। জগৎ রাগিয়া আগুন হইয়া আছে। কেবল রাগ নয়, কি অবজ্ঞা সেই সঙ্গে—কথাই বলিবে না যশোদার সঙ্গে! অনেক বলিয়া অনেক বুঝাইয়া ব্যাপারটা যশোদা বুঝিতে পারিল। খুবই সহজ একটা চাল দিয়া যশোদাকে সত্যপ্রিয় কুপোকাত করিয়াছে। প্রথমে রটিয়াছে এই যে যশোদা ভিড়িয়াছে উপরওয়ালাদের সঙ্গে, যশোদা বিশ্বাসঘাতিনী। প্রমাণ? আগে একবার ধর্মঘট থামাইয়াছিল কে সকলের ক্ষতি করিয়া? গতবার ধর্মঘট থামাইয়াছে কে সকলের ক্ষতি করিয়া? সত্যপ্রিয়র সঙ্গে, কাশীবাবুর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা কিসের যশোদার, দু'বেলা সত্যপ্রিয়র মোটর চাপিয়া কেন সে সত্যপ্রিয়র বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখিতে যায়? নন্দর মতো একটা ছোঁড়া যে মিলে অমন চাকরি পাইল, এটা কিসের পুরস্কার?

এক একটা ছুতা দিয়া একে একে ধর্মঘটের সাত আটজন পাণ্ডাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল এটা কার পরামর্শ?

'আমার পরামর্শ নাকি জগৎ, এঁ্যা? আমি পরামর্শ দিয়েছি তোমাদের তাড়াবার?'

'কাশীবাবু নিজে বলেছেন।'

শুনিয়া খানিকক্ষণ যশোদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'পেটে পেটে এই মতলব ছিল ব্যাটার, তাই তিন মাস ধম্মোঘট বন্ধ রাখতে বলেছিল! সবাইকে ডাক দিকি একবার জগৎ, পিলেটা চমকে দিই হাড়-হাবাতে সত্যপ্রিয় আর কাশীবাবুর।'

কিন্তু কেউ আসিল না! আর কে বিশ্বাস করবে যশোদাকে? কি লাভ হইয়াছে যশোদাকে বিশ্বাস করিয়া? বরং লোকসান হইয়াছে পুরা-মাত্রায়। যশোদা যদি খারাপ মানুষ নাও হয়, ধরা যাক তার কোনোই দোষ নাই, কি দরকার তাকে টানাটানি করিয়া? সাবধান থাকাই ভাল। শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দু'টি হইতেও যশোদা সম্পর্কে সাব-ধান থাকিবার জন্য সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যশোদা কে যে তার কথায় সকলে ধর্মঘট করিবে আর ধর্মঘট থামাইবে?

যশোদা নন্দকে বলিল, 'কাল থেকে কাজে যাস্ না নন্দ।'

শুনিয়া নন্দ মুষড়িয়া গেল। বড় আরামের চাকরি, ইতিমধ্যে সে পনের টাকা আগাম মাহিনা চাহিবামাত্র পাইয়া গিয়াছে!

দিশেহারা নন্দ পরামর্শ করিতে গেল স্বর্ণের সঙ্গে। স্বর্ণ আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'না না, কখ্খনো চাকরি ছেড়ো না তুমি। আমাদের কি উপায় হবে?'

চাকরি না ছাড়িলেও যে তাদের কি উপায় হওয়া সম্ভব নন্দ ভাবিয়া পায় না। তবে স্বর্ণই একদিন এক মিনিটের নোটিসে তাকে বগলদাবা করিয়াও উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, স্বর্ণই আজ মত বদ-লাইয়া তাড়াতাড়ি জীবনে তার উন্নতি করাইয়া প্রচলিত প্রথায় তাকে বরণ করিতে চায়, সুতরাং নন্দর কিছু বলিবার থাকিলেও বলিবার উপায় নাই। বলিতে ইচ্ছাও হয় না। অন্য কথা অবশ্য বলিতে ইচ্ছা

হয় অনেক, আসরে শত শত মানুষের মধ্যে একা নন্দ একাকিনী সুবর্ণকে যে সব কথা হাসিয়া কাঁদিয়া বলে তার চেয়েও মৌলিক, তার চেয়েও রোমাঞ্চকর রাশি রাশি কথা। মনে হয়, সুবর্ণেরও যেন ওই রকম অনেক কিছু বক্তব্য আছে। তাই, নন্দও একরকম কিছুই বলে না— জীবনমরণের সমস্যা নিয়া পরামর্শটা পর্যন্ত তাদের এমন সংক্ষিপ্ত হয়, বলিবার নয়। শুনিলে অন্য লোকের মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, কিশোর-কিশোরীর মাসিকপত্রে যে সব ধাঁধা থাকে দু'জনে বুঝি তারই উত্তর বাহির করিতেছে, একজন আরেক জনকে শুনাইতেছে এক একটি সঙ্কেত সূত্র।

সুবর্ণ হয়তো বলে, একশো যদি হ'ত—

নন্দ সায় দেয়। আচমকা তিনটি মোটে শব্দ সুবর্ণ উচ্চারণ করিয়াছে, কিন্তু দু'জনের কাছেই তার অর্থ পরিষ্কার। নন্দর যদি একশ' টাকা বেতন হইত আর নন্দ যদি জ্যোতির্ময়ের মতো একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করিত আর মেলামেশা করিত ভদ্রলোকের সঙ্গে অর্থাৎ সোজা কথায় নন্দ যদি জ্যোতির্ময়ের স্তরে ঠেলিয়া তুলিতে পারিত নিজেকে, তবে আর তাদের কোনো ভাবনা ছিল না।

একটুক্ষণ চোখে চোখে চাহিয়া থাকিয়া সুবর্ণ হয়তো আবার বলে, দাদার চাকরি গেলেও—

এবারও নন্দ সায় দেয়। জ্যোতির্ময়ের যদি চাকরি যায় এবং আর সে চাকরি না পায় এবং ভয়ানক গরীব হইয়া যশোদার বাড়ির মতোই একটা বাড়িতে কায়-ক্লেশে দিন কাটাইতে বাধ্য হয় অর্থাৎ সোজা কথায়, জ্যোতির্ময় যদি নন্দর স্তরে নামিয়া আসে, তাহা হইলেও তাদের কোনো ভাবনা ছিল না।

আবার একটু চোখে চোখে চাহিয়া সুবর্ণ হয়তো আবার আরও নিচু গলায় ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলে, বৌদির কথা তুলে খুব খোঁচাচ্ছি, কিন্তু—

অপরাজিতার কথা তুলিয়া সুবর্ণ জ্যোতির্ময়কে খুব খোঁচাইতেছে, সে যাতে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গরীব হইয়া যায়। কিন্তু অপরাজিতার স্মৃতির অস্ত্রেও সুবর্ণ তার মর্মভেদ করিতে পারিতেছে না, সমস্ত খোঁচানো ব্যর্থ

হইয়া যাইতেছে।

দু'জনে প্রায় একসঙ্গে নিশ্বাস ফেলে। নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দ হয়তো বলে, যদি না হয়?

সুবর্ণ হয়তো জবাব দেয়, তাহ'লে তাই করব।

অর্থাৎ কিছু না হয়, তাহা হইলে অগত্যাই দু'জনে তারা হাত ধরাধরি করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে। এমনিভাবে কথার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আর মুখের ভাব আর দৃষ্টি বিনিময় দিয়া অনায়াসে তারা পরস্পরের মনের কথা বুঝিতে পারে কি সৃষ্টিছাড়া মনের মিলটাই যে তাদের হইয়াছে! এই রকম আদান-প্রদানের নামই বোধ হয় ভালবাসার ভাষা, কে বলিবে!

যশোদার বারণ না মানিয়া নন্দ চাকরি করিতে যায় আর যশোদা সকলকে জিজ্ঞাসা করে, 'নন্দকে যদি আমি খেদিয়ে দিই, তবে তো তোমরা আমায় বিশ্বাস করবে?'

কিন্তু বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, যশোদাকে তারা এড়াইয়া চলিতে চায়, যশোদার সঙ্গে মাখামাখি করিয়া বিপন্ন হইবে কে? বলাই নামে একজন শ্রমিক যেদিন বরখাস্ত হয়াছিল, তার পরদিন সকালে উঠিয়াই ছেঁড়া কাপড়-জামা শতরঞ্জি কম্বল গুটাইয়া বিদায় হইয়া গেল যশোদার বাড়ি হইতে, শোনা গেল তাকে আবার কাজে নেওয়া হইয়াছে। তারপর সাতদিনের মধ্যে যশোদার বাড়ি খালি হইয়া গেল। যশোদার পাওনা গণ্ডা মিটাইয়া দিয়াই গেল সকলে, কাশী-বাবু সকলকে দরকার মতো আগাম টাকা দিয়াছে। যশোদাকে টাকা না দিয়া যাইতে পারিলে অবশ্য সকলে তাহাই করিত, কিন্তু যশোদাকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন।

প্রথমে যশোদা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কি করছ তোমরা বুঝতে পারছ? সাধ করে ফাঁদে পা দিচ্ছ? যতদ্দিন না মিলের দেনা শোধ হবে টুঁ শব্দটি করতে পারবে না তোমরা, যা বলবে যা করবে মুখটি বুজে মেনে নিতে হবে তোমাদের—বুঝতে পারছ?

বুঝিতে পারিতেছে সকলেই, কিন্তু উপায় কি?

কেবল সত্যপ্রিয় মিলের নয়, অন্য মিলের যারা যশোদার বাড়িতে ছিল তারাও পলাইয়া গেল। উপর হইতে তাদের উপরেও চাপ পড়িয়াছে। এ বাড়িতে রহিল কেবল মতি আর ধনঞ্জয়, ও বাড়িতে সুধীর আর নদেরচাঁদ। সুধীরকেও চলিয়া যাওয়ার জন্য কালো ক্রমাগত খোঁচাইতেছিল, কিন্তু সে কাজ করে রেলের ইয়ার্ডে, যশোদার দেনা শোধ করিয়া যশোদাকে ত্যাগ করার জন্য কে তাকে আগাম টাকা দিবে? নদেরচাঁদের কাজ ছিল না, মিলে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা তার নাই।

তিনটি উনানে যশোদার আঁচ পড়ে না। একটি উনান ধরানোর সময় তার মনে হয়, এতবড় উনান ধরাইয়া কি হইবে, মিছামিছি কয়লার অপচয়। ছোট একটি উনান তৈয়ারী করিতে হইবে। অন্য সময় প্রয়োজন হওয়া মাত্র ছোট উনান যশোদার প্রস্তুত হইয়া যাইত, এ রকম সামান্য কাজ ফেলিয়া রাখা যশোদার স্বভাব নয়, কিন্তু এবার ছোট উনানটি যশোদার মনের মধ্যে জ্বলিতে থাকিল। রান্নাঘরে বড় বড় উনান তিনটির কাছে কাদামাটি দিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি বা উৎসাহ যেন তার নাই।

শহরতলি

দ্বিতীয় পর্ব

১

শহরতলির রূপান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়া দিন-দিন দ্রুততর হইয়া উঠে। অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়, তবু আশ্চর্য মনে হয়। মাটির বাসন যেন দেখিতে দেখিতে কৃত্রিম ধাতুতে দাঁড়াইয়া যাইতেছে আর চাকচিক্য বাড়িতেছে প্রতিদিন। কত এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা নূতন পিচের আবরণে গা ঢাকিয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, কত আঁকা বাঁকা সরু গলি চওড়া ও সিধা হইয়া যাইতেছে, কত অনামী পথের গায়ে আঁটা হইয়া যাইতেছে জম্‌কালো নাম।

চারিদিকে বাড়ি উঠিতেছে অসংখ্য। ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো সেকেলে ধরনের সাদাসিধে একতলা দোতলা অনেক বাড়ি অদৃশ্য হইয়া সেখানে দেখা দিতেছে আধুনিক ফ্যাসানের বাড়ি—শুধু গঠনের মধ্যেই কত কায়দা। এ অঞ্চলে ছোট বড় সব বাড়িরই প্রায় আকার ছিল চারকোনা বাক্সের মতো, এখন বাড়িগুলি হইয়াছে ইট-কাঠ-চুন-সুরকি-সিমেন্ট-লোহার জ্যামিতি। অস্বাভাবিক রূপলাবণ্যের অপ্রত্যাশিত আঘাতে বাড়িগুলি যেন দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। শিল্পী ভাস্কর কি মিস্ত্রীর কাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাই তাল সামলানো যাইতেছে না?

দোকানপাটের সংখ্যাও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, পুরানো দোকানের চেহারাও বদলাইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট কত পুরানো দোকান যে উঠিয়া গেল!—ছোট অপরিচ্ছন্ন ঘরে এলোমেলোভাবে জিনিস সাজাইয়া এতদিন যাদের কাছে মাল বিক্রি করা চলিত তাদের অনেকেই তো নাই, নূতন যারা আসিয়াছে তারা ছবির মতো সাজানো দোকান চায়।

বড় রাস্তায় রাস্তায় আলোর সংখ্যা জোর বাড়িয়াছে বটে এখন দু'দিকের দোকানের আলোতেই রাস্তাটি এমন ঝলমল করে যে, রাস্তার আলো রাত বারোটা পর্যন্ত নিভাইয়া রাখিলেও চলে।

বাজারের সংস্কার হইয়াছে। এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে কেউ আর মাছ তরকারী বেচিতে বসে না, সন্ধ্যার পর বাজারের অর্ধেকটা এখন আর আব্‌ছা অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় না। হু'বেলা ধোয়া-মোছার ব্যবস্থা করিয়াও অবশ্য বাজারের নোংরামি আর দুর্গন্ধ এখনও দূর করা যায় নাই, কোনোদিন যাইবেও না, তবু কুলির দেহ ভদ্রলোকের দেহে পরিণত হওয়ার মতো, বাজারে পরিবর্তন যে হইয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই।

দলে দলে যেসব নরনারী আসিয়া এ অঞ্চলের নূতন ধরনের বাড়িগুলিতে নীড় বাঁধিতেছে, শহরতলির পরিবর্তিত আবেষ্টনীর সঙ্গে তাদের চাল-চলন বেশভূষা বেশ খাপ খায়। অনেকে বাস করিতে আসিয়াছে নিজের বাড়িতে, অনেকে আসিয়াছে ভাড়াটে হইয়া। জমির দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে যে বড়লোক ছাড়া বাড়ি করিয়া এ অঞ্চলে বাস করা আর সম্ভব নয়। প্রথমদিকে যারা জমি কিনিয়া বাড়ি করিয়াছিল, অথবা তৈরি বাড়ি কিনিয়াছিল, তারা প্রায় অধিকাংশই না-বড়লোক ধরনের ধনী, বাড়ি করিতেই হয়তো অনেকের জীবনের সঞ্চয় ফুরাইয়া গিয়াছে। তবু এরাই প্রথমে এই শহরতলিকে ফ্যাশনেবল শহুরে রূপ দিয়াছে, এ অঞ্চলে বাস করার মর্যাদা ও সুবিধা বাড়াইতেছে, আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর আসিয়াছে বড় বড় চাকুরে, ব্যবসায়ী, জমিদার—দশগুণ কম দামে পাঁচ কাঠা জমি কিনিতে একদিন যাকে চোখে অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল তার ছোট বাড়িখানার পাশে উঠিয়াছে বাগানঘেরা প্রাসাদ।

অনেক বস্তির চিহ্নও লোপ পাইয়াছে, কেবল যেগুলি বড় রাস্তার অনেক তফাতে ভদ্রপাড়ার পিছনে পড়িয়াছে সেগুলি টিঁকিয়া আছে,—কোনোটা সম্পূর্ণ, কোনোটা আংশিক। যশোদার বাড়ির তিনদিকে নতুন বাড়ি উঠিয়াছে, কেবল কুমুদিনীর বাড়ি যেদিকে সেদিকটা আগে যেমন ছিল তেমনি আছে। রূপান্তরের ঢেউ যশোদার দুটি মুখোমুখি বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে।

যশোদা বাড়ি হু'টি বিক্রি করিলে সঙ্গে সঙ্গে এদিকের আট দশখানা বাড়ি পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইত। বিক্রি করিবার জন্য এসব বাড়ি

আর ফাঁকা জমির মালিকেরা সকলেই উৎসুক হইয়া আছে, এ অঞ্চলে জমির দাম যে এত চড়িতে পারে পাঁচ সাত বছর আগে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। সব বেচিয়া দিয়া শহরের আরও তফাতে সস্তায় জমি কিনিয়া আবার তারা বাড়ি-ঘর তৈরি করিয়া নিবে, একটা মোটা টাকা হাতে থাকিয়া যাইবে। এখন তাদের ভয় শুধু এই, হঠাৎ জমির দাম না কমিয়া যায়।

কিন্তু যশোদার জন্য কেউ তারা বাড়ি বিক্রি করিতে পারিতেছে না। যে কোম্পানী সমস্ত পাড়াটা চড়া দামে কিনিতে চায়, মাঝখানে যশোদার বাড়ি দু'টি বাদ পড়িলে তারা বেশী দাম দিবে না। সকলেই যদি বেচিতে রাজী হয়, এক কাঠা জমিও বাদ না পড়ে, তবেই যশোদার বাড়ির এ-পাশের জমির দরটা তাদেরও দেওয়া চলিতে পারে—নয়তো অত দামে ছাড়া-ছাড়া জমি কিনিয়া কোম্পানীর কি লাভ হইবে ?

এইসব বাড়ির মালিকেরা একত্র হইয়া অনেক পরামর্শ করিয়াছে, যশোদাকে বুঝাইয়াছে, অনুরোধ করিয়াছে, ভয়ও দেখাইয়াছে। কুমুদিনী যে তাকে কত খোঁচাইয়াছে বলিবার নয়। কুমুদিনীর বাড়িটি ছোট, কিন্তু জায়গা অনেক। বাড়ির পিছনে তার একটি ছোটখাট বাগান আছে, পেয়ারা, লেবু, ডালিম গাছে বাগানটি ঠাসা। অনেকগুলি টাকা হাতে পাওয়ার শখটা কুমুদিনীর চিরদিনই বড় প্রবল। টাকা হাতে পাওয়ার শখটা অবশ্য কারও কম থাকে না, কিন্তু একসঙ্গে মোটা টাকা পাওয়ার জন্য কুমুদিনীর মনটাই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী ছটফট করিতেছে।

তারপর মনের অশান্তি আর সকলের পীড়াপীড়িতে অস্থির হইয়া উঠিয়া বাড়ি বেচিতে যশোদা যদি বা রাজী হইয়াছিল, শেষমুহূর্তে হঠাৎ আবার তার মন বদলাইয়া গেল।

সামান্য একটা উপলক্ষ্যে।

বাড়ি বেচিতে রাজী হওয়া মাত্র যশোদা বলিল, 'তবে আর এবাড়িতে আমি একটা দিনও থাকবো না। আমি চললাম।'

কুমুদিনী, রাজেন আর ধনঞ্জয় তিনজনেই ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'চললে ? কোথায় চললে তুমি বলা নেই কওয়া নেই ?'

যশোদা হাসিল। যশোদার সেই শান্ত কৌতুকভরা হাসি দেখিয়া সকলে স্বস্তি বোধ করিল। না, রাগে দুঃখে বিরক্তিতে মাথা যশোদার বিগড়াইয়া যায় নাই।

'দু'দিন একটু ঘুরে আসবো।'

রাজেন বলিল, 'কোথায় যাবে?'

যশোদা বলিল, 'চুলোয়। কুঁড়ে পাও, গোয়াল পাও একটা ঠিক করে রেখো দিকি আমার জন্যে—পরশু এসেই জিনিসপত্তর নিয়ে উঠে যাব।'

কুমুদিনী মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, 'হুঁ, জিনিসপত্তর! জিনিসপত্তর বেঁধেছেঁদে রাখতে হবে তো আমাকে?'

'তোকে তো আমি বলি নি সই!'

কারও কাছে মনের কথা ফাঁস না করিয়া যশোদা বাড়ি ছাড়িয়া শহরের এক সস্তা হোটেলে গিয়া উঠিল। কিছুদিন হইতে যশোদা ভাবিতেছিল, রীতিমতো একটা হোটেল খুলিয়া নিজের চারিদিকে আবার কতকগুলি মানুষ জড়ো করিয়া অনাত্মীয় মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া দিয়া দিন কাটাইবে। কিন্তু দু'টি দিন সেই আদর্শ ও পবিত্র হোটেলে কাটাইয়াই সে বুঝিতে পারিল, এই সব কলমপেষা কুলিরা কারো সঙ্গে সুখ-দুঃখের উপভোগ ভাগাভাগি করে না, যেটুকু করে সে-টুকু শুধু মৌখিক ভদ্র আলাপে চল্‌তি শব্দের আদান প্রদান। সহানুভূতি কাকে বলে কেউ জানে না, চায় না এবং পায়ও না।

ক্ষুণ্ণ-মনে যশোদা তাই ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, কুমুদিনী সত্যই তার সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। শহরের অন্যপ্রান্তে একটি বাড়িও রাজেন ঠিক করিয়াছে, সকলে মিলিয়া এখন সেখানে গিয়া উঠিবে তারপর যা ব্যবস্থা হয় করা হইবে। যশোদা চলিয়া যাইবে আর তারা এখানে পড়িয়া থাকিবে, কুমুদিনীর তা সহ্য করা অসম্ভব। শত্রু যদি চোখের আড়ালেই চলিয়া গেল, দিন তার কাটিবে কি করিয়া?

যশোদা রাজেনকে বলিল, 'তোমাদের যাবার তাড়াতাড়ি কিসের ?'

রাজেনের হইয়া কুমুদিনী জবাব দিল, 'তোমারি বা তাড়াতাড়িটা কি শুনি ?'

যশোদা মুখ ভার করিয়া বলিল, 'আমার কথা আলাদা। একা মানুষ আমি, দু'দিন আগে যাই পরে যাই, কারো কিছু এসে যাবে না! তোমরা কেন মিছিমিছি দু'চার মাস আগে থেকে ঘর ছাড়া হবে ?'

কুমুদিনী মুচকিয়া একটু হাসিল।—'আমরাও তো একা মানুষ চাঁদের মা নাই ? —দু'টি একা মানুষ।'

রাজেন ও কুমুদিনী চলিয়া গেলে বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হইয়া যশোদা বাড়ির উনুনগুলি ভাঙিয়া দিতে গেল।

যশোদার লাথিতে তার রান্নাঘরের প্রকাণ্ড উনুন তিনটি ভাঙিয়া গেল। বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার সময় নাকি উনুন ভাঙিয়া দিয়া যাইতে হয়। মেয়েলি শাস্ত্রের এসব বিধান যশোদা যে বিশেষ মানিয়া চলে তা নয়, তা ছাড়া লাথি দিয়া উনুন ভাঙিতে হইবে এমন কোনো নির্দেশ এ শাস্ত্রে নাই। তবে, মন ভাঙিয়া গেলে মানুষের পক্ষে উনুন ভাঙিবার জন্য এ-রকম খাপছাড়া উপায় অবলম্বন করা অশ্চর্য নয়।

উনুন ভাঙিল, একটি পা-ও জখম হইল যশোদার। লোহার একটা শিক ডান পায়ের পাতায় এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধিয়া গেল। মন-ভাঙা আবেগে লাথিগুলি যশোদা একটু জোরে জোরেই মারিয়াছিল।

মেঝেতে বসিয়া নিজেই সে টান দিয়া শিক খুলিয়া ফেলিল। তখন আরম্ভ হইল রক্তপাত। কত রক্তই যে ছিল যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটাতে, দেখিতে দেখিতে রক্তে মেঝে ভাসিয়া গেল।

বগল-লাঠিতে ভর দিয়া এক পায়ে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ধনঞ্জয় যশোদার কীর্তি দেখিতেছিল, তার দিকে চাহিয়া যশোদা বলিল, 'দেখলে ?'

রক্ত দেখিয়া ধনঞ্জয় প্রথমটা থতমত খাইয়া যায়।

পা কাটা যাওয়ার পর কিছুদিন সে সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, রাগারাগি চেঁচামেচি করিয়া বাড়ি সরগরম করিয়া তুলিত, কত যে ছেলেমানুষী আর পাগলামি তার আসিয়াছিল হিসাব হয় না। তারপর

ধীরে ধীরে সে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সব সময়েই প্রায় বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, অথচ কোনো বিষয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে তাও মনে হয় না। ডাকিলে চমকাইয়া ওঠে না, ডাক সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া ওঠে, সাড়া দিতে একটু সময় লাগে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া যেন আজকাল তার একটু শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়। কেমন একটু বোকা হাবার মতো হইয়া পড়িয়াছে মানুষটা।

যশোদার পা জখম হইয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে এটা খেয়াল করিয়া উঠিতে তার সময় লাগে, কিন্তু তারপর চোখের পলকে ঝিমানো মানুষটা যেন সজীব হইয়া উঠে অতিমাত্রায়। বগলের লাঠি ফেলিয়া দিয়া ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে কাছে আগাইয়া যায়, গায়ের নূতন আলোয়ানটি দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ব্যাকুলভাবে বলে, 'ডাক্তার ডেকে আনি?'

আলোয়ানটি কাড়িয়া নিয়া যশোদা বলে, 'ডাক্তার না হাতি ডাকবে। জল আনো এক ঘটি আর খানিকটা ন্যাকড়া।'

ধনঞ্জয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে, একপায়ে দুয়ারের কাছে গিয়া বগললাঠি তুলিয়া নিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করে। যশোদা ডাকিয়া বলে, 'হুটোপুটি ক'রো না বাবু, ধীরে সুস্থে আনো।'

'রক্ত পড়ছে যে গো!'

'কই রক্ত পড়ছে? টিপে ধরে আছি দেখছো না?'

ধনঞ্জয় জল আর ন্যাকড়া আনিতে যায়, পায়ের পাতার ফুটা টিপিয়া ধরিয়া রাখিয়া যশোদা চাহিয়া থাকে উনানের ভগ্নস্তূপের দিকে। একদিন দু'বেলা এই উনুনে বিশ পঁচিশ জনের রান্না করিত যশোদা, কুলি মজুরের মোটা ভাত, যশোদা যাদের আপন করিতে গিয়াছিল। আজ তারা সকলেই তাকে ত্যাগ করিয়াছে, বাড়িতে তার মানুষ নাই। পরের বাড়ির একটা মেয়েকে চুরি করিয়া ভাইটা পর্যন্ত তার কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে।

এদিকে ধনঞ্জয় চেঁচামেচি আরম্ভ করে, 'ও চাঁদের মা', ন্যাকড়া যে পাচ্ছি না?'

'ছোট টিনের তোরঙ্গে ছেঁড়া কাপড় আছে একটা, সেইটা নিয়ে এসো।'

নির্দেশ দিয়া যশোদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। টিনের তোরঙ্গটি যে চাবি বন্ধ আছে, ধনঞ্জয় খুলিতে পারিবে না, একথা তার মনে আছে। তবু সে আর সাড়াশব্দ দেয় না, পায়ের ক্ষত হইতে আঙুলের ছিপি খুলিয়া রক্তপাতের পথটাও মুক্ত করিয়া দেয়। এ একটা সাময়িক মানসিক বিলাস ভাঙা মনের। নিজেকে আঘাত করিতেও সময় বিশেষে মানুষের বড় ভাল লাগে, নিজের লাল রক্তের অপচয়ও ভাল লাগে।

কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া ধনঞ্জয়ও চুপ করিয়া যায়, খানিক পরে জলের ঘটি আর ছেঁড়া কাপড় হাতে করিয়া আসিয়া যশোদার কাণ্ড দেখিয়া আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

'টিপে ধর, টিপে ধর, শীগগির টিপে ধর।'

যশোদা করুণভাবে একটু হাসিয়া বলে, 'কি ক'রে খুললে বাস্কো ?'

'টেনে খুলেছি।'

'তার মানে বাস্কোর তালাটি ভেঙেছো আমার। ধন্য তুমি।'

পায়ে একটা লোহার শিক বিঁধিয়া যাওয়া বাধা হিসাবে গণ্য করিবার মতো গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়। বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার আর সব ব্যবস্থাই যখন হইয়া গিয়াছে, বাড়িটা বিক্রয় করিতে পর্যন্ত বাকি আছে, কেবল হাতে টাকাটা পাইয়া দলিল রেজেষ্ট্রি করা, ভারি ভারি জিনিসপত্র প্রায় সমস্তই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে শহরের অপর প্রান্তের আর এক শহরতলির ভাড়াটে বাড়িতে, রওনা হওয়ার আয়োজন শেষ, শুধু বাকী আছে গাড়ি ডাকিয়া বাকী জিনিসপত্র নিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসার, তখন পায়ে শিক বেঁধাকে উপলক্ষ করিয়া বাঁকিয়া বসার কোনো অর্থ হয় না। যে সব কারণে যশোদা এ বাড়ি ছাড়িয়া এদিকের শহরতলি ছাড়িয়া জন্মের মতো চলিয়া যাইতেছিল, পা একটু জখম হওয়ায় তার একটিও বাতিল হইয়া যায় নাই। তবু শেষ মুহূর্তে যশোদা ওই ছুতায় যাওয়াটাই বাতিল করিয়া দিল।

ধনঞ্জয় বলিল, 'এ পা নিয়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে চাঁদের মা !'

যশোদা চুপ করিয়া রহিল। তার এই গাম্ভীর্য ধনঞ্জয়ের কাছে চিরদিন

বড় অস্বস্তিকর। একটু ভয়ে ভয়ে সে বলিল, 'খুব ব্যথা করছে তো?'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'কিসের ব্যথা? আমার আবার ব্যথা-বেদনা কিসের শুনি?'

ধনঞ্জয় আরও দমিয়া গেল!—'পায়ের কথা বলছি গো। তোমার ওই পায়ের কথা যাতে শিক বিঁধেছে। কম লেগেছে তোমার পায়ে!'

'না লাগে নি, একটুও লাগে নি। আমার আবার লাগালাগি কি? মুখ-পোড়া ভগবান আমায় লোহা দিয়ে গড়েছে জান না?'

ধনঞ্জয় বলিল, 'গাড়ি ডাকি তবে?'

যশোদা বলিল, 'থাক।'

'আজ যাবে না?'

না।'

ধনঞ্জয় খুশী হইয়া বলিল, 'আমিও তো তাই বলছি। তাড়াহুড়োর কি আছে? পায়ের ব্যথাটা কমুক, দু'দিন পরে গেলেও চলবে।'

বলিতে বলিতে ধনঞ্জয়ের মুখে ম্যাজিকের মেঘের মতো বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল।—'তোমার পা দুদিন পরে সেরে যাবে, আমার পা কিন্তু কোনোদিন ঠিক হবে না চাঁদের মা।'

অনেকদিন যশোদা ধনঞ্জয়ের মুখে তার কাটা পায়ের জন্য নালিশ শোনে নাই, বিষাদের ছাপটা যদিও চোখে পড়িয়াছে সব সময়েই। হাঁটুর নিচেই ডান পা'টি ধনঞ্জয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে, ঘা শুকাইয়া খানিকটা মসৃণ হইয়াছে, বাকীটা হইয়া আছে এবড়ো-খেবড়ো। দেখিলে যশোদার এখনো বেদনা আর বিতৃষ্ণা মেশানো একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, কতকটা প্রিয়জনের মৃতদেহ দেখিয়া বিব্রত হওয়ার মতো।

'আমারও ডান পা'টা জখম হয়েছে, দেখেছ?'

এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই, এবার খেয়াল করিয়া এই অত্যাশ্চর্য যোগা-যোগে ধনঞ্জয়ের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

'হয়তো আমার পা'টাও তোমার মতো কেটে বাদ দিতে হবে।'

'না না, তা কি হয়, কি যে বল তুমি চাঁদের মা!'

'হতে পারে তো? পা'টা যদি পেকে ফুলে ওঠে, তারপর পচে গলে যায়,

তারপর ডাক্তার করাত দিয়ে কেটে তোমার পায়ের মতো ক'রে দেয়, বেশ হয় তা হ'লে, না ?'

কথা শুনিলে আর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় যশোদার মনে বুঝি ঘোরতর বিকার আসিয়াছে। পায়ের পাতায় তার যেভাবে আঘাত লাগিয়াছে তাতে পা'টি পাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে অবশ্য পারে এবং শেষ পর্যন্ত কাটিয়া পায়ের খানিকটা বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হওয়াও আশ্চর্য নয়, সামান্য আঁচড় লাগিয়াও সময় সময় ওরকম হয়। কিন্তু সেটা যে বেশ হয়, ধনঞ্জয়ের সঙ্গে তারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা সামঞ্জস্য ঘটিবে শুধু এই জন্যই, এরকম ছেলেমানুষী কথা যশোদার মুখে মানায় না। কথাটা সে বলে রীতিমতো আবেগের সঙ্গে, যেটা তার পক্ষে আরও বেশী অস্বাভাবিক, সেইজন্য মনে হয় সে যেন তামাশা করিতেছে।

ধনঞ্জয় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকে।

'আমার সঙ্গে তামাশা করছ চাঁদের মা ?'

শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও গম্ভীর হইয়া যশোদা বলে, 'না, তামাশা করি নি। মনটা ভাল নেই কিনা, তাই কি বলতে কি বলেছি। বাড়ি-ভরা লোক ছিল আমার, তুমি ছাড়া আজ কেউ নেই, কি অদেষ্ট বলতো আমার ?'

চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে যশোদার, আর বিহ্বলের মতো তাই দেখিতে থাকে ধনঞ্জয়। যশোদার মুখ সে গম্ভীর হইতে দেখিয়াছে, সহানুভূতিতে কোমল হইতেও দেখিয়াছে, কিন্তু সে মুখে বিষণ্ণতা কি কোনোদিন নজরে পড়িয়াছিল তার ? যশোদা যে কাঁদিতে পারে, আর দশজন সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো দুঃখে জল আসিতে পারে তারও চোখে, কেবল ধনঞ্জয় নয়, যশোদাকে যারা চেনে তাদের প্রায় সকলের পক্ষেই এটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

শূন্য বাড়িতে শূন্য ঘরে খালি তক্তপোশের দুই প্রান্তে দু'জনে বসিয়া ছিল। তক্তপোশের বিছানাপত্র গুটাইয়া বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘরের জিনিসপত্র যশোদা পা জখম হওয়ার আগেই রোয়াকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে। ধনঞ্জয় সরিয়া সরিয়া যশোদার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল,

কোঁচার খুঁট দিয়া যশোদার চোখ মুছাইয়া দিল। যশোদার চোখ দিয়া জল পড়া যেমন আশ্চর্য ব্যাপার, ধনঞ্জয়ের কাণ্ডটা তার চেয়ে কম নয়। অন্য সময় এত সাহস ধনঞ্জয়ের হইত না।

মানুষটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার বদলে যশোদা তার হাত নামাইয়া ধরিয়া রাখিল, বলিল, 'হয়েছে। কচি খুকি না কি আমি, আদর ক'রে কান্না থামাচ্ছ?'

ধনঞ্জয়ের জন্যই এবার যশোদার মন আরও খারাপ হইয়া যায়। বড় আত্মগ্লানি সে বোধ করে। নিজের উপর রাগ ধরিয়া যায়। ধনঞ্জয় ছেলেমানুষ—বয়সে না হোক মনের দিক দিয়া সত্যই বড় ছেলেমানুষ। অতি তুচ্ছ একটু সাধারণ অন্তরঙ্গতাই যে মানুষটাকে খুশিতে গদ্‌গদ করিয়া দেয়, হাতে খেলনা পাওয়া শিশুর মতো, অনেক বার সে তার প্রমাণ পাইয়াছে। কতবার সে ভাবিয়া রাখিয়াছে, লোকটার সঙ্গে কথায় ব্যবহারে একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। কোনোমতেই তো কথাটা সে মনে রাখিতে পারে না! সকলে তাকে ত্যাগ করিয়াছে শুধু ধনঞ্জয় ত্যাগ করে নাই, এই ভাবটাই শুধু মনে থাকিয়া যায়। তাকে ত্যাগ করার কারণ যে ধনঞ্জয়ের নাই, উপায়ও নাই এটা যেন খেয়ালও থাকে না!

বেলা অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনো যশোদার উঠানে ভাল করিয়া রোদ আসে নাই। পূবে একটি নূতন তিনতলা বাড়ি উঠিয়াছে, যশোদার বাড়িটি পড়িয়া গিয়াছে আড়ালে। নূতন রাস্তাটির সোহাগে চারিদিকের বাড়ি যেন মাথা তুলিতেছে বর্ষাকালের আগাছার মতো। কতটুকু সময়ের মধ্যেই প্রকাণ্ড এক একটা বাড়ি যে সম্পূর্ণ হইতেছে! কোনো কাজেই মানুষের যেন আজকাল আর সময় লাগে না—শহরের মানুষের। নূতন যুগের নূতন মন্ত্রে ম্যাজিকের মতো কাজ হইয়া যায়।

ঘরের মধ্যে যশোদার শীত করিতেছিল আর তাকে পীড়ন করিতেছিল ঘরের রিক্ত নগ্নতা। মেঝেতে ছড়ানো পড়িয়া আছে জঞ্জাল, একটুকরা ছেঁড়া কাগজ যশোদা ঘরে জমিতে দিত না, যা কিছু অকেজো, যা

কিছু পরিত্যাজ্য সব যশোদা চিরদিন নির্বিকার চিত্তে ফেলিয়া দিয়াছে,—যদি কাজে লাগে ভাবিয়া ঘরের জঞ্জাল সঞ্চয় করার মতো ভীরু সে কোনো দন ছিল না। তবু, দুঃসাহসীর মনের গোপন ভীরুতার মতো এত জঞ্জাল যে ঘরের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া ছিল!

শূন্য দেয়ালে শুধু নানা রকম দাগ আর একটি পুরানো বাংলা দেয়াল-পঞ্জী,—জীবনবীমা কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। দেয়াল-পঞ্জীর ছবিটিতে একজোড়া নারী ও পুরুষ ও তাদের গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ের দেহে স্বাস্থ্য আর মুখে আনন্দের হাসি যেন ধরিতেছে না। প্রথমে ছবিটা দেখিলেই যশোদার রাগ হইত, মনে হইত রেষারেষি করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া দিয়াই মানুষ আজকাল মিথ্যাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিতেছে, সর্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে।

অনেক বিষয়ের মতো এবিষয়েও যশোদার একটি নিজস্ব মতামত আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর বিশ্লেষণ অবশ্য যশোদার মতামতের পিছনে নাই, পাণ্ডিত্যের ফেনা সঞ্চয় করিবার সুযোগও তার ঘটে নাই, মুখে ফেনা তুলিয়া জাবরও সে কাটে না, কাজে লাগায় শুধু নিজের উপলব্ধি ও সাধারণ বুদ্ধিকে। প্রচারের আশ্রয়ে মিথ্যা যে পুষ্ট হয় একথা বুঝিতে যশোদার গভীরভাবে ভাবিবার দরকার হয় নাই। তারপর ধীরে ধীরে চোখে সহিয়া আসিলে ছবিটির বিজ্ঞাপনের ছাপ যশোদার কাছে মুছিয়া গিয়াছে, জীবনবীমা কোম্পানীর দেয়ালপঞ্জীর ছবি তার কাছে হইয়া দাঁড়াইয়াছে অজানা শিল্পীর আঁকা একটি অবাস্তব মধুর কল্পনা।

'আগে ঘরদোর ভাল করে, সাফ করিয়ে তারপর জিনিসপত্র ঘরে ঢোকাব, কেমন?'

ধনঞ্জয় সায় দিয়া বলিল, 'সেই ভাল। কাকে দিয়ে সাফ করাবে, তুমি তো পারবে না?'

'কেন পারব না? কি হয়েছে আমার?'

'না না, তুমি আজ আর উঠো না চাঁদের মা। বিছানাটা এনে পেতে দি, শুয়ে থাকো।'

শুইয়া থাকার প্রস্তাবে যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইল একপায়ে ভর দিয়া।

একটু হাসিয়া বলিল, 'এখানে শীত করছে, রোদে বসি গে' চল বাইরে।

উঠানের একপাশে একটু রোদ আসিয়াছিল, সেইখানে একটা ভাঙা তক্তায় বসিয়াই যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, নন্দর তো জেল হবে?'

এতবড় গুরুতর বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করায় খুশি হইয়া ধনঞ্জয় বলিল, 'মেয়েটির বাড়ির লোক যদি গোলমাল করে—'

দিন চারেক আগে সুবর্ণ আর নন্দ উধাও হইয়া গিয়াছে, সুবর্ণের বাড়ির লোকরা কি করিয়াছে যশোদা কিছুই জানে না। জ্যোতির্ময় একবার আসিয়া জিজ্ঞাসাও করে নাই, তার বোনটিকে সঙ্গে করিয়া যশোদার ভাই কোথায় গিয়াছে, এ খবরটা কি সে রাখে? হয়তো জ্যোতির্ময় পুলিসে খবর দিয়াছে, হয়তো চারিদিকে খোঁজ করাইতেছে, দু'জনের সন্ধান পাইলে নন্দকে জেলে পাঠাইয়া ছাড়িবে। সুবর্ণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে সেই জানে। হয়তো দূরে কোনো আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দিবে, হয়তো কোনো বোর্ডিং-এ রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবে, হয়তো মেয়ের এই কীর্তিকথা গোপন করিয়া চুপি চুপি কারও সঙ্গে বিবাহ দিবে—তারপর যা হবার হোক।

এসব কথাই যশোদা আজ ক'দিন ধরিয়া ভাবিতেছে। নিজেকে যে অনেকবার বলিয়াছে যে, নন্দ জেলে যাক, চুলোয় যাক, যমালয়ে যাক তার কিছু আসিয়া যায় না। ও নচ্ছারটার সঙ্গে আর তার কোনো সম্পর্কই নাই। তবু মাঝে মাঝে যশোদার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, একা নন্দই কি দোষী? এই কেলেঙ্কারির জন্য সুবর্ণের কি কোনো দোষ নাই? সুবর্ণ ছেলেমানুষ কিন্তু অমন ভাবপ্রবণ, ফাজিল আর পাকা মেয়েকে ভুলাইয়া চুপ করিয়া পালানোর সাহস কি নন্দের হওয়া সম্ভব? কাঁচপোকার আরসোলাকে টানিয়া নিয়া যাওয়ার মতো সুবর্ণই নন্দকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, দোষটা চাপিয়ে একা নন্দর ঘাড়ে।

ফিরিয়া আসিলে দু'জনের বিবাহ দিয়া দেওয়া যায় না? জ্যোতির্ময়ের কাছে গিয়া কথাটা আগে হইতে আলোচনা করিয়া আসিলে হয়তো সে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজী হইয়া যাইতেও পারে। এ বিবাহ অবশ্য সুখের

হইবে না, কিন্তু এই কুৎসিত ব্যাপারের জের টানিয়া চলার চেয়ে সে সুখের অভাবও অনেক ভাল।

'কিন্তু বিয়ে কি হবে?'

ধনঞ্জয় চমকাইয়া উঠিল।—'বিয়ে? কার বিয়ে?'

ধনঞ্জয়ের সেই চমক দেখিয়া, চমকের মানে বুঝিয়া, যশোদার মনের মেঘ ফাঁক হইয়া কোথা লইতে যেন খানিকটা সোনালী রোদ আসিয়া পড়িল।

ধনঞ্জয়ের হাঁটুতে টোকা দিয়া একটু হাসিয়া সে বলিল, 'কেন, তোমার বিয়ে? আমার সঙ্গে?'

এবেলা যশোদা আর রান্নার ব্যবস্থা করিল না। একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া দু'জন লোক ডাকিয়া আনিয়া, নিজেও কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘরদুয়ার ধোয়ামোছা আরম্ভ করিয়া দিল। বেলা তিনটার সময় দইচিঁড়ার ফলারে পেট ভরাইয়া মাটি ছানিয়া রান্নাঘরে তৈরি করিতে বসিল ছোটখাট একটি উনুন।

সব কাজে সাহায্য করিতে গিয়া ধনঞ্জয় সারাদিন আজ যশোদার বকুনি শুনিয়াছে, উনুন তৈরি করিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া বলিল, 'দু'চার দিনের জন্য আবার উনুন পাতছ কেন?'

ইটের উপর আড়াআড়িভাবে শিক বসাইতে বসাইতে যশোদা বলিল, 'দু'চার দিন কে বললে? থাকতে হ'লে রেঁধেবেড়ে খেতে হবে তো? না, ফলার করবো রোজ?'

'ক'দিন থাকবে?'

'চিরদিন।'

'এখান থেকে যাবে না?'

'কেন যাব?'

'বাড়ি বেচবে না?'

'কেন বেচব?'

'ওবাড়িতে যে মালপত্র গেছে?'

'আনিয়ে নেব। ওবেলা কেদারকে বললেই হবে। তিনটে গরুর গাড়িতে

মাল গেছে, একেবারে একটা লরীতে মাল ফেরত আসবে।'

ধনঞ্জয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যশোদার খেয়ালের আদিঅন্ত পাওয়া ভার। বাড়ি ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না শুনিয়া মুখখানা তার বিমর্ষ হইয়া যায়। নন্দ চলিয়া যাওয়ার পর এ বাড়িতে কেবল সে আর যশোদা ক'দিন বাস করিতেছে। প্রথম রাত্রে নন্দ ফিরিবে কি ফিরিবে না এ কথা কারও জানা ছিল না, কোনো কারণে ফিরিতে তার দেরি হইতেছে ভাবিয়া যে যার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিনের মতো ঘুমও আসিয়াছিল দু'জনের। পরদিন যশোদার সই আর শত্রু কুমুদিনী আসিয়া বলিয়াছিল, 'আমি থাকব ভাই তোর কাছে রাত্রে?'

যশোদার বাড়ি হয় নাই। ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একা একবাড়িতে রাত কাটানোর ভয়াবহ পরিণামের কথা বার বার মনে পড়াইয়া দিয়া কুমুদিনী যশোদাকে কাবু করিতে চাহিয়াছিল, যশোদা হাসিমুখে বলিয়াছিল, 'আমার সুনাম দুর্নামে কার কি আসবে যাবে বল্, কে আছে আমার? দুর্নাম হতে বাকীই বা কি আছে বল্? আমার ভাই মন্দ, আমিই বা মন্দ নই কিসে?'

শেষপর্যন্ত রাগ করিয়া গালাগালি আর অভিশাপ দিতে দিতে কুমুদিনী চলিয়া গিয়াছিল।

অনেক ভাবিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো কল্পনারাজ্যে অনেকক্ষণ বিচরণ করিয়া সেদিন সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমি তোমার ঘরে শোব যশোদা? তোমার হয়তো ভয় করবে?'

'ভয় করবে?'—যশোদা অবাক হইয়া গিয়াছিল, 'আমার ভয় করবে একা এক ঘরে শুতে! গোটা বাড়িটাতেই আমি যে আজ একা থাকবো গো?'

ধনঞ্জয় আর কথা বলিতে পারে নাই। যশোদাকে বুঝা যায় না, যশোদার খেয়ালের অন্ত পাওয়া যায় না।

যশোদা আবার বলিয়াছিল, 'তুমি শোবে সই-এর বাড়িতে, পূবের ঘরে।'

এই বাড়িতে যশোদার সঙ্গে রাত্রি যাপনের মধ্যে ধনঞ্জয় হয়তো অনেক কিছু রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা আবিষ্কার করিতেছিল, কুমুদিনীর বাড়িতে

তাকে রাত্রে থাকিতে হইবে শুনিয়া সে মুষড়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রাজেন আসিল। লরীতে চাপাইয়া রাতারাতি মালপত্র ফিরাইয়া আনিবার অনুরোধে সে একটু হাসিল।

'রাত্তিরে হাঙ্গামা করবার দরকার কি চাঁদের-মা? আমি গিয়ে রাত্তিরটা থাকছি সেখানে, ভোর ভোর মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ব?'

'কেন, সেখানে রাত কাটাবার তোমার দরকার? হরনাম সিংকে বলো-গে, আমার নাম ক'রে গাড়ি আর লোকজন নিয়ে গিয়ে সেই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে, তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে। সকালে ওর গাড়ি পাওয়া যাবে না।'

'কি বকশিশ দেবে আমাকে?'

'রাত্তিরে আমায় পাহারা দিও।'

রাজেন হাসিমুখে চলিয়া গেল। চিরদিন হাসিমুখেই রাজেন তার কাজ করিয়া দেয়,—কুমুদিনীকে ফাঁকি দিয়া। যশোদার সঙ্গে রাজেন বেশী মেলামেশা করিবে কুমুদিনী এটা পছন্দ করে না, দু'জনকে কথা বলিতে দেখিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া যায়, দু'তিন দিনের জন্য যশোদাকে একেবারে ত্যাগ করে। তারপর নিজেই আবার ভাব করিতে আসে। তীক্ষ্ণ কথা আদান-প্রদানের ভাব। দিনান্তে একবার যশোদার কাছে না আসিলে আর খানিকক্ষণ ঝগড়া করিয়া না গেলে কুমুদিনীর ভাল লাগে না, সারারাত মেজাজ তার এমন গরম হইয়া থাকে যে রাজেনের দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

রাজেন বাহির হইয়া যাওয়া মাত্র ধনঞ্জয় ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ওকে থাকতে বললে যে তোমার কাছে?'

লণ্ঠনের আলোয় ধনঞ্জয়ের মুখ দেখিয়া যশোদা রাগ করার বদলে শান্ত-ভাবেই বলিল, 'মাথা খারাপ না কি তোমার? তামাশা বোঝ না?'

ধনঞ্জয় অবুঝ শিশুর মতো আব্দার করিয়া বলিল, 'ওরকম তামাশা আর করো না, বুঝলে? বড় খারাপ লাগে শুনলে।'

যশোদা কথা বলিল না। ধনঞ্জয়ের কথা শুনিয়া তারও খারাপ লাগিতে-ছিল।

২

যশোদা বাড়ি বেচিবে না শুনিয়া সবচেয়ে বেশী গোলমাল করিল কুমুদিনী।

একা একা বাড়িতে থাকার জন্য বটে, বাড়ি বিক্রি করিতে অস্বীকার করার জন্যও বটে! প্রথম কারণটা নিয়া সকালবেলা ঘন্টা দুই ঝগড়া করিয়া ফুঁসিতে ফুঁসিতে বেচারী সবে বাড়ি গিয়া রান্না চাপাইয়াছে, অন্য ব্যাপারটা কানে আসিল। হাঁড়ি নামাইয়া আবার সে ছুটিয়া গেল যশোদার কাছে।

'এটা কি শুনছি চাঁদের-মা সই? বাড়ি নাকি তুই বেচবি না?'

যশোদা উনানে হাঁড়ি চাপাইতেছিল, সংক্ষেপে জানাইল, 'উঁ হুঁ।'

'কেন শুনি? তোর একার জন্য সবাই মরব আমরা তোর কি করেছি, নিজের ক্ষতি ক'রেও আমাদের সব্বোনাশ করবি? তুই পাগল নাকি চাঁদের-মা সই, মাথা কি তোর খারাপ?'

'মাথা নয়। কপাল খারাপ।'

আরও চটিয়া কত কথাই যে কুমুদিনী বলিয়া যায়। যশোদা বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য করে। এইমাত্র ঝাড়া দু'ঘন্টা ঝগড়া করিয়া গিয়া কুমুদিনী বোধ হয় একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রথমদিকে কথাগুলি তার তেমন ঝাঁঝালো হয় না। তার-পর ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতে থাকায় সে যশোদার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতে আরম্ভ করে। মনে হয়, এতকাল শুধু যশোদার দোষের অফুরন্ত তালিকা মুখস্থ করিয়া সে দিন কাটাইয়াছে, যশোদার মতো খারাপ মেয়েমানুষ যে জগতে আর দু'টি নাই এ কথাটা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না।

শেষে যশোদা বলে, 'এদিকে তুই তো আলাপ করছিস আমার সঙ্গে, আরেকজন যে না খেয়ে কাজে গেল?'

'যাক্। আরেকজনের জন্য তোর অত দরদ কেন শুনি?'

'পীরিতের মানুষটার জন্য দরদ হবে না ?'
কুমুদিনী মুখ বাঁকাইয়া বলে, 'তামাশা আর করছো কেন ? পীরিত যে তোমাদের ঢের দিন থেকে চলছে, তা কি আর জানিনে আমি।'
যশোদা হাসিয়া বলে, 'কত গণ্ডা লোকের সঙ্গে যে তুই আমার পীরিত ঘটিয়ে দিলি ভাই ! কিন্তু আমার এমনি পোড়াকপাল—'
কুমুদিনী ফোঁস করিয়া একটা অতি কুৎসিত মন্তব্য করিয়া নিজেই একটু থতমত খাইয়া যায়—কথাটা তার নিজের কানেই বীভৎস শোনায়। এতক্ষণ চটে নাই কিন্তু এবার যশোদা চটিয়া উঠিবে ভাবিয়া কুমুদিনীর একটু ভয়ও বুঝি হয়। চিরদিন সে যশোদাকে ভয় করিয়া আসিয়াছে। রাগ না করিয়া যতক্ষণ যশোদা আমল দেয় ততক্ষণই সে ঝগড়া করে, যশোদা রাগ করিলেই তার কান্না শুরু হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া নিয়া নরম গলায় সে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, কেন বাড়ি বেচবি না বলতে তো দোষ নেই ভাই চাঁদের-মা সই ?'
কুমুদিনীর অকথ্য মন্তব্যে যশোদা রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কেবল মুখখানা তার একটু গম্ভীর দেখায়। একটু ভাবিয়া সে বলে, 'না, বল্‌তে আর দোষ কি ? সত্যপ্রিয় কিনে নিচ্ছে তো ঘরবাড়ি—ওকে আমি বেচব না, লাখ টাকা দিলেও নয়।'
'সত্যপ্রিয়বাবু তো কিনছে না ? একটা কোম্পানী থেকে কিনছে।'
'ওটা সত্যপ্রিয়র কোম্পানী। লোকটা আমার ঘর ভেঙেছে, আমার বদনাম রটিয়েছে, ওকে আমি বাড়িঘর বেচব ? সবাই কত ভালবাসত আমায়, এখন একজন আসে দেখিস আমার কাছে ? কত করেছি ওদের জন্যে আমি, আজ ওরা আমায় বল্‌ছে সত্যপ্রিয়র লোক, সত্যপ্রিয়র টাকা খেয়ে ওদের বন্ধু সেজে ওদের সর্বনাশ করেছি ?
এভাবে কোনো বিষয়ে নালিশ করা, অভিমানে এভাবে বিচলিত হওয়া যশোদার স্বভাব নয়। বন্ধুরূপী শত্রু বলিয়া কুলি-মজুরেরা ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া মনটা কি যশোদার এত নরম হইয়া গিয়াছে ?
কুমুদিনী একটু ভাবিয়া বলে, 'তা এক দিক দিয়ে তো ভালই হয়েছে ভাই চাঁদের-মা সই ? কতকগুলো কুলি-মজুরদের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণা

পাচ্ছিলে, বেঁচে গেছ। এখন অন্য ভাড়াটে রাখো বাড়িতে,—না না, ভাড়াটে রাখবে কি ক'রে, বাড়ি তো তুমি বেচে দিচ্ছ।' বলিয়া কুমুদিনী একগাল হাসিল।

কিন্তু যশোদার জীবন সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যখন তখন যশোদার কাছে ছুটিয়া আসে, মত বদ্‌লানোর জন্য ঝগড়া করে, অভিশাপ দেয় আর মিনতি করে, মাঝে মাঝে ধনঞ্জয়কে পর্যন্ত মধ্যস্থ মানে।

ধনঞ্জয় দ্বিধাভরে বলে, 'আমি তো বল্‌ছি প্রথম থেকে কিন্তু—'

যশোদা বলে, 'কি মুশকিল, তোমরা বেচ না তোমাদের ঘরবাড়ি। আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি? আমায় নিয়ে টানাটানি করছ কেন?'

যশোদার বাড়ি বেচার সঙ্গে তাদের স্বার্থের সম্পর্ক কোথায়, কেবল কুমুদিনী নয় পাড়ার সকলেই অনেকবার কথাটা তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যশোদা স্বীকার করে না। সে বলে, সব সত্যপ্রিয়র চাল। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, অন্য ক্রেতা আসুক, যশোদার বাড়িসুদ্ধ কিনিতে পাইলে যে দর সত্যপ্রিয় দিবে বলিয়াছে তার চেয়ে বেশী দর দিয়া তখন কিনিয়া নিবে, যার খুশি বেচিবে, যার খুশি বেচিবে না, সত্যপ্রিয় কথাটি বলিবে না!

'জমির দর চড়ছে দেখছ না দিন দিন? বেচিবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

রাজেনও যশোদার কথায় সায় দেয়—চিরদিন দিয়া আসিতেছে। তবে কুমুদিনীকে জানাইয়া নয়। কুমুদিনীর কাছে সে যশোদার কথার জোরালো প্রতিবাদই করে।

তারপর একদিন দেখা যায়, যশোদার কথাই ঠিক। পেন্‌সনভোগী এক ভদ্রলোক রাজেনের বাড়ির পাশে উমেশ তরফদারের বাড়িটা এবং ওই ভদ্রলোকেরই এক বন্ধু কানাই নন্দীর এগার কাঠা ফাঁকা জমিটুকু কিনিতে রাজী হইয়া গেল—যশোদা বাড়ি বেচিলে সত্যপ্রিয়র কোম্পানী যে দর দিবে বলিয়াছিল সেই দরে। কিন্তু পেন্‌সনভোগী ভদ্রলোক ও তার বন্ধুর আর এখানে বাড়ি বা জমি কেনা হইল না। কোম্পানীর লোক আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল, যশোদা যে শত্রুতা করিয়া নিজের বাড়িটা আটকাইয়া রাখিতেছে এটা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। একজনের শয়-

তানিতে সকলে মারা পড়িবে কোম্পানী তা সহ্য করিবে না। যে বেচিতে চায় তার বাড়ি আর জমিই কোম্পানী কিনিয়া নিবে। যে বেচিবে না তার সঙ্গে বুঝাপড়া হইবে পরে।

শুনিয়া যশোদা বলিল, 'বুঝাপড়া ? আবার কি বুঝাপড়া করবে ওরা ? বুঝাপড়ার দেখছি শেষ নাই ওদের !'

বিনাশর্তে সকলের বাড়ি ও জমি সত্যপ্রিয়ই কিনিয়া নিল। বেচিল না কেবল কুমুদিনী।

এতকাল কয়েক হাজার কাঁচা টাকা হাতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া, যশোদার সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া করিয়া, শেষ মুহূর্তে সে বাঁকিয়া বসিল। কৈফিয়ত দিল এই : 'আরও দাম চড়ুক, তখন বেচব।'

তারপর কয়েকদিন কুমুদিনী আর যশোদার কাছে আসে না। রাজেনের কাছে খবর পাইয়া যশোদা নিজেই তাকে দেখিতে গেল। কুমুদিনীর সাত বছরের ছেলেটাকে একহাতে ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া বলিল, 'কি হ'ল ভাই কুমুদিনী সই, বাড়ি যে বেচলে না ?'

'তুই যে বেচলি না ? দাম চড়লে তুই যখন বেচবি, আমিও তখন বেচব।'

'তবে আর তুই বেচেছিস্।'

অনেকদিন পরে আজ যশোদার বড় আমোদ ও আনন্দ বোধ হয়। মানুষকে মানুষ ভালবাসে বৈ কি। সকলে না হোক, নাটকীয় ভালবাসা না হোক্, দু'চারজন সত্যই ভালবাসে। কুমুদিনীর অন্তহীন কটু কথায় তার যে একটু রাগ হয় না, কুমুদিনীকে সে ভালবাসে বলিয়াই তো ? তাকে ফেলিয়া একা একা কুমুদিনী যে বাড়িঘর বেচিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে না, কুমুদিনী তাকে ভালবাসে বলিয়াই তো ?

তার বেশী আর কি চাই মানুষের ?

কুমুদিনীর ঘরভরা ছেলেমেয়েদের কলরব শুনিতে শুনিতে যশোদার বিরাট দেহটি অবসন্ন হইয়া আসে। কারণটা বুঝিতে না পারিয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে তো জানে না মনের মধ্যে গভীর অশান্তির গুরুভার বহিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মুক্তি পাইলে শুধু মন নয়

শরীরটাও মানুষের আশ্চর্যরকম হাল্কা মনে হয়, শান্তি যেন আসে ঘুমের ছদ্মবেশে। ঘুমের মতোই হয়তো অস্থায়ী, তবু এখন যশোদার মনে যে শান্তি আসিয়াছে তার তুলনা হয় না।

ইংরাজী নববর্ষ শুরু হয় শীতকালে। রাজেন পরামর্শ দিল, ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন আবার হোটেল খুলিলে কেমন হয়? কারখানার কুলিমজুরদের জন্য না হোক, কারখানার বাইরে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জন করে তাদের জন্য? যশোদারও তো জীবিকা অর্জন করিতে হইবে! বিশেষত ধনঞ্জয়ের মতো বিরাটকায় একটি পোষ্য যখন তার জুটিয়াছে।

যশোদা বলিল, 'কিছুদিন যাক।'

রাজেনও সায় দিয়া বলিল, 'আচ্ছা যাক কিছুদিন।'

দিন যায়। নন্দ ও সুবর্ণর কোনো খবর আসে না। কোথায় কি ভাবে ওরা দিন কাটাইতেছে কে জানে! দিন ওদের চলিতেছেই বা কি করিয়া? নন্দ কি রোজগারের কোনো উপায় করিতে পারিয়াছে? সুবর্ণের গায়ের গয়না একটি একটি করিয়া স্যাকরার দোকানে যাইতেছে হয় তো! নন্দর মতো ছেলে, দু দিন আগেও দিদি মুখে তুলিয়া না দিলে যে প্রায় খাইতেই জানিত না, একটা মেয়েকে চুরি করিয়া পলাইয়া এতকাল সে যে কেমন করিয়া ব্যাপারটার জের টানিয়া চলিতেছে, ভাবিলেও যশোদা অবাক হইয়া যায়।

মাঝে মাঝে নন্দর কীর্তন শুনিবার জন্য যশোদার জোরালো ইচ্ছা জাগে। কীর্তন করিলেই নন্দর শরীর খারাপ হয় বলিয়া নন্দর কীর্তন করা যশোদা আগে পছন্দ করিত না, যদিও কীর্তন শুনিতে শুনিতে সকলের মতো অনির্বচনীয় ভাবাবেগে সেও চিরদিন এক দুর্বোধ্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছে। এখন মাঝে মাঝে তার মনে হয়, নন্দ থাকিলে নিজেই নন্দকে গাহিতে বলিয়া একদিন সে ভাল করিয়া তার কীর্তন শুনিত।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে রাস্তায় একদিন যশোদার দেখা হইয়া গেল। একটি নূতন শ্রমিক-সমিতির সভায় যোগ দেওয়ার জন্য যশোদাকে একরকম

জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছিল, যাওয়ার ইচ্ছা তার একেবারেই ছিল না। আবার শ্রমিকদের ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে যাইবে, তার কি লজ্জা নাই? পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাকে যাইতে হইয়াছিল। সভায় গিয়াই সে টের পাইয়াছিল, তার অনুমানই ঠিক। সমিতিটি খাঁটি শ্রমিক-সমিতি নয়, একজন ভদ্রলোক নিজের স্বার্থের জন্য সমিতি গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন।

সভা শেষ হওয়ার আগেই যশোদা চলিয়া আসিয়াছিল—বাঁচিয়া থাকিতেই যারা মরিয়া আছে তাদের ভাল করার নামে ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের এসব চেষ্টা সে সহ্য করিতে পারে না।

ফিরিবার সময় তার বাড়ির গলি আর বড় রাস্তার মোড়ের কাছে প্রকাণ্ড তিনতলা নতুন বাড়িটার সামনে দু'জনে মুখোমুখি হইয়া গেল। বড় বাড়িটার নিচের একটা অংশে চায়ের দোকান, জ্যোতির্ময় বোধ হয় চা খাইয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এত কাছে বাড়ি জ্যোতির্ময়ের, দোকানে তার চা খাওয়ার কি প্রয়োজন হইয়াছে কে জানে! বাড়িতে কি জ্যোতির্ময়ের যাইতে ইচ্ছা হয় না, যে বাড়িতে একদিন তার একটা বৌ আর একটা বোন ছিল, যে বৌটা মরিয়াছে হাসপাতালে আর যে বোনটাকে চুরি করিয়াছে যশোদার ভাই?

কিছুদিন একটানা কঠিন অসুখে ভুগিলে যেমন হয় সে রকম নয়, জ্যোতির্ময় বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। যশোদার সঙ্গে কথা না বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া দাঁড়াইল।

'কোনো খবর পাও নি, না?'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

জ্যোতির্ময় আনমনে কি যেন ভাবিল। পথে মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়ার সংখ্যা এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, পথের দু'দিকের চেহারা এত বেশী বদলাইয়া গিয়াছে যে যশোদার মনে হয়, এ বুঝি তার বাড়ির কাছের সেই পথটি নয়, দূরে অন্য কোথাও আসিয়াছে।

'খবর একটা পাওয়া যাবে চাঁদের-মা, কি বল?'

'তা পাওয়া যাবে বৈ কি। আজ হোক কাল হোক, নিজেরাই একটা

খবর ওরা পাঠাবে।'

'তোমায় যদি আগে জানায়, আমাকে জানাবে তো সঙ্গে সঙ্গে? আমার খবর দিতে হয়তো ওদের ভয় হবে।'

'আপনাকে জানাবো বৈ কি। কিন্তু ওদের সম্বন্ধে আপনি কি করবেন।'

প্রশ্ন শুনিয়াই জ্যোতির্ময় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, 'সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে চাঁদের-মা। নিজের বোনকে তো আর ফাঁসি দেব না আমি?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনে সে কি যেন ভাবিল। তারপর হঠাৎ বলিল, 'একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি চাঁদের-মা। নন্দ কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেছে, এই কথা বলছো তো সবাইকে?'

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, ওই ধরনের কথাই বলেছি। পাটনায় একটা চাকরি পেয়েছে। জ্ঞান হবার পর এই বোধহয় প্রথম মিছে কথা বললাম জ্যোতিবাবু।'

জ্যোতির্ময় খানিকক্ষণ যেন অবাক হইয়াই যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কথা বলিল বড় খাপছাড়া।

'বাহাদুরী করো না বেশী।'

গট্‌গট্ করিয়া সে চলিয়া গেল বাড়ির উল্টা দিকে। গলিতে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া যশোদা দেখিতে পাইল, আবার সে ফিরিয়া আসিতেছে। আরও কিছু তার বলিবার আছে ভাবিয়া যশোদা একটু দাঁড়াইল কিন্তু জ্যোতির্ময় তার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, সোজা আগাইয়া চলিয়া গেল।

এক মুহূর্ত যশোদা অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি হইয়াছে জ্যোতির্ময়ের? সে কি পাগল হইয়া যাইতেছে? জ্যোতির্ময়ের মন যে কত দুর্বল যশোদার অজানা ছিল না। তাই তার চেহারা দেখিয়া আর কথাবার্তা চালচলনে মানসিক বিকারের স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া যশোদা ভয় পাইয়া গেল।

অনেকদিন পরে সত্যপ্রিয়কেও আজ যশোদা দেখিতে পাইল। জ্যোতির্ময় চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই।

প্রথমে চোখে পড়িল সত্যপ্রিয়র গাড়ি, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। অনেকটা আগাইয়া গিয়া দেখা গেল সত্যপ্রিয়কে। দু'জন সাহেবী পোষাক পরা লোকের সঙ্গে কথা বলিতে সে গাড়ির দিকে ফিরিয়া যাইতেছিল। খুব সম্ভব নূতন কেনা জমি ও বাড়িগুলি দেখিতে এ পাড়ায় আসিয়াছে।

পথের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুইজন চলিতেছিল, যশোদা কল্পনাও করে নাই সত্যপ্রিয় তার সঙ্গে কথা বলিবে। পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সত্যপ্রিয় বলিল, 'কেমন আছ চাঁদের-মা?'

কাছে গেল না, শুধু দাঁড়াইল। যশোদাও পথের অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া পড়িল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'ভাল আছি। আপনি ভাল তো?'

সত্যপ্রিয়র সঙ্গের লোক দু'জন বিস্মিত চোখে চাহিয়া আছে। একজন সাইকেল আরোহী ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়া গেল। পথের মাঝে এ ভাবে পীড়ন করা কেন? এত করিয়াও কি সত্যপ্রিয়র সাধ মেটে নাই?

'চলে যাচ্ছে একরকম।'

সত্যপ্রিয় চলিতে আরম্ভ করিল। যশোদা একমুহূর্ত নড়িতে পারিল না। তার চোখে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ায় পথটা একটু ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল।

৩

বাড়ি ঢুকিয়া যশোদা দেখিতে পাইল, নন্দ আর স্বুবর্ণের বয়সী দুটি ছেলেমেয়ে ভিতরের বারন্দায় জলচৌকিতে বসিয়া আছে। অল্প দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে ধনঞ্জয়।

যশোদাকে দেখিয়া তিনজনেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় তাড়াতাড়ি বলিল, 'এত শীগ্‌গির যে ফিরে এলে চাঁদের-মা?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়া যশোদা পাল্টা প্রশ্ন করিল, 'এরা কে?'

'ওরা ঘর ভাড়া নিতে এসেছে। আমি বললাম এখানে ঘর ভাড়া মিলবে না—'

ছেলেটি বলিল, 'রাজেনদা আমাদের বসতে বলে গেছে। কাছেই বাড়ি না রাজেনদা'র ?

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, কাছেই বাড়ি।'

'রাজেনদা বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসতে গেছে। আমরা থাকলে যদি আপনার অসুবিধে হয়—?'

পরিষ্কার ধব্‌ধবে জামা-কাপড় পরনে, সমস্তই সাদাসিধে সাধারণ, তবু দু'জনের পরিচ্ছদেই যেন মার্জিত রুচি আর সহজ ও স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার ছাপ আঁকা রহিয়াছে। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশের বেশী হইবে না, মুখখানা মেয়েদের মতো কোমল। মেয়েটির বয়স বোধ হয় ষোল বছর, এলোখোঁপায় আটকানো আঁচলটি খসিয়া পড়ি পড়ি করিয়াও পড়িতেছে না, সিঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা। মুখখানা সুশ্রী, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চপল দু'টি চোখ।

এতক্ষণ সে অবাক হইয়া যশোদার বিরাট দেহটি দেখিতেছিল,—জীবনে বোধ হয় সে এতবড় লম্বা-চওড়া মেয়েমানুষ দেখে নাই। এবার ছেলেটির দিকে চাহিয়া অকারণেই ফিক্‌ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি থামো। আমি বুঝিয়ে বলছি।'

তারপর সোজাসুজি যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল, 'আমরা খারাপ লোক নই, আমাদের বিয়ে হয়েচে।'—

যশোদা বলিল, 'বিয়ে না হলে বুঝি লোক খারাপ হয় ?'

মেয়েটি আবার ফিক্‌ করিয়া হাসিল, 'না, তা বলি নি। আপনি যদি কিছু সন্দেহ করেন, যদি ভাবেন আমরা পালিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে, তাই জন্যে আগে থেকে বলে রাখলাম। আমরা দু'জনেই ছেলেমানুষ তো ? আমরা এমনিভাবে এসে ঘরভাড়া নিতে চাইলে আপনার কেন, সব্বারি মনে হতে পারে, ভেতরে কোনো গোলমাল আছে নিশ্চয়। আপনিই বলুন, মনে হতে পারে না ? গোলমাল অবিশ্যি আছে, তবে ওধরনের গোলমাল নয়। আমায় চুরি করার জন্যে ওঁর হাতে একদিন হাতকড়া পড়বে আর আপনাকে নিয়ে পুলিসে টানাটানি করবে, সে ভয় করবেন না। গোলমালটা কি হয়েছে বলছি শুনুন। হয়েছে কি জানেন—'

মুখে যেন খই ফুটিতে থাকে মেয়েটির। যশোদা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। এতটুকু মেয়ে, বিবাহ নাকি হইয়াছে মোটে মাস ছয়েক আগে, কিন্তু কথায় একেবারে পাকা গিন্নি। কি তার মুখের ভঙ্গি, কি ভণিতা, কি ফোড়ন আর ব্যাখ্যা! শুনিতে শুনিতে যশোদার মনে হয়, কার যেন অনুকরণ করিতেছে মেয়েটি, হাত নাড়া, ঠোঁট নাড়া, চোখের পলক ফেলা, রাগ দুঃখ ক্ষোভ বিস্ময় কৌতুক ফুটাইয়া তোলা আর মিলাইয়া দেওয়া, সব যেন তার নকল, কথাগুলি সমস্তই শোনা-কথার পুনরাবৃত্তি। কে জানে মা না মাসী না পিসী কে নিজেকে উজাড় করিয়া মেয়েটির মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে!

গোলমালটা অসাধারন কিছু নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে সর্বদাই ঘটিতেছে। দাদার পছন্দ-করা একটি মেয়েকে বাতিল করিয়া অপছন্দ-করা এই মেয়েটিকে বিবাহ করায়, বিবাহে নগদ টাকা নিতে রাজি না হওয়ায় এবং সম্প্রতি একটা কারখানায় পঁচিশ টাকায় প্রায় কুলি-মজুরের একটা কাজ নেওয়ায়, দাদা ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। দাদার স্ত্রীর মতে, মায়ের পেটের ভাই তো দূরের কথা শত্রুও মানুষের সঙ্গে এমন শত্রুতা করে না।—

'আসলে, আমার জা-ই যত নষ্টের গোড়া। ক'দিন যা দেখেছি তাতেই বুঝেছি ভাশুর আমার লোক ভাল। আমায় দেখে ভাশুরের পছন্দ হয়েছিল, এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন উনি শুনেছেন, কিন্তু আমার জায়ের রংটা আমার চেয়ে একটু কম ফর্সা কিনা, আর দেখতেও আমার মতো সুন্দর নয় কিনা—তা, তার এখন বয়স হয়েছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে তিনটি, প্রথম বয়েসে যেমন ছিল এখনও কি তেমনি চেহারা থাকে, রূপ-যৌবন মানুষের দু'দিনে উবে যায়—আমায় দেখেই তাই অপছন্দ হয়ে গেল। তারপর যে মেয়েটিকে নিজে দেখে পছন্দ করল—ওগো, বল না সে দেখতে কেমন ছিল? হাসছ যে? আমার খুব অহঙ্কার হয়েছে ভাবছ বুঝি? না বাপু, আমি ওসব অহঙ্কার বুঝি না, ন্যাকামিপনার ধার ধারি না। সত্যি কথা বলব তাতে দোষ কি, তা সে নিজের সম্বন্ধেই হোক্ আর যার সম্বন্ধেই হোক? আমি তো আর বলি নি, আমি আকাশের

পরীর মতো সুন্দরী! মোটামুটি দেখতে সুন্দরী আমি, এই পর্যন্ত, বাস্! আমার মতো সুন্দর মেয়ে গণ্ডা-গণ্ডা গড়াচ্ছে পথে ঘাটে। তুমিই তো বলেছিলে সে মেয়েটা দেখতে কালো আর চোখ একটু ট্যারা, বল নি? যাক্ গে, যা বলছিলাম, বলি। কি কথায় কি কথা এসে পড়ল। দেখুন তো দিদি, এমনি ক'রে পেছনে লাগলে কেউ কথা কইতে পারে? কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, সেই হ'ল আমার জায়ের রাগ। এমন ব্যবহার শুরু করলে আমাদের সঙ্গে কি বলব। নগদ টাকা সম্বন্ধে বলতে লাগল, উনি যে নগদ নেন নি সে কি আর অম্নি অম্নি—নগদ নিলে টাকাটা আমার ভাশুরের হাতে পড়ত, এ বেশ বৌ-এর গায়ে গয়না হ'ল। আমার পিসী,—পিসীই আমায় মানুষ করেছে, বড্ড ভালবাসে আমায় —পিসী নিজে থেকে আটশো টাকার গয়না বেশী দিয়ে দিল। গয়না যা দেবার কথা ছিল তাতো দিলই, তার উপরে আরও সাড়ে আটশো টাকার গয়না, নগদ টাকার বদ্‌লিতে। ভাশুর তিনশো টাকা মাইনে পান, ওক'টা টাকা নগদ পেলেই বা তিনি এমন কি বড়লোক হয়ে যেতেন, তিন মাসের মাইনেও নয়! কিন্তু জা' আমার ওই কথা বলে বলে ভাশুরের মন ভাঙাতে লাগল। তারপর ও যেই চাকরিটা নিল,—না নিয়েই বা কি করবে বলুন, ভাল একটা চাকরিও জুটিয়ে দেবে না, এদিকে ঘরে বসে থাকার জন্যও খোঁচাবে! ভাশুর নয়, আমার জা'। হাত খরচের দু'চারটে পয়সা তো মানুষের লাগে? দাদার কাছে চাইলে তিনি বলবেন, আহা বৌদির কাছ থেকে নে না গিয়ে। বৌদির কাছে চাইলে এমন ক'রে মুখ বাঁকাবে—! একবার দু'বার চেয়ে শেষে ও আর চাইত না। আমি একটা গয়না দিলাম বেচতে, তাও বেচবে না। এদিকে নস্যি কেনার একটা পয়সা নেই! তখন এই চাকরিটা নিয়ে নিল। কিন্তু আমার জায়ের সে কি রাগ! বলে কি, লোকের কাছে দাদার মাথা হেঁট করবার জন্যে ইচ্ছে ক'রে এই চাকরি নিয়েছে। নইলে এতগুলো পাস ক'রে কেউ কুলি-মজুরের কাজ নেয়? খেটে খেলে লোকের কাছে মাথা হেঁট হবার কি আছে বলুন তো দিদি? রাত্তিরে আমার জা' কি সব পরামর্শ দিল কে জানে, সকালে আমার ভাশুর ওকে বললেন, কি, হয়

এ-কাজ ছেড়ে দাও, নয় আমার বাড়ি থেকে বেরোও। ফিক্ করিয়া সে আবার হাসিল, 'না, ঠিক অমনিভাবে বলেন নি, তবে, মোট কথাটা দাঁড়াল ওই। আমরাও তাই চলে এলাম।'

ছেলেটির নাম অজিত, মেয়েটির নাম সুব্রতা।

'তোমার ডাকনাম কি বোন? সুব্রতা বলে ডাকতে পারব না।'

'আমার ডাকনাম নেই।'—সুব্রতা হাসে।

অজিত বলে, ওর, ডাকনাম হ'ল গিয়ে—'

সুব্রতা চোখ পাকাইয়া বলে, 'ছাখো, ভাল হবে না কিন্তু!'

অজিত হাসিমুখেই চুপ করিয়া থাকে। তখন সুব্রতা বলে, 'আচ্ছা, বলো। কি আর হবে, আজ হোক কাল হোক জানতে তো পাবেন-ই!'

এই সামান্য হাসি-তামাশার ব্যাপারেও মনে হয়, অজিত যেন বৌ-এর বড় বাধ্য। সুব্রতার কৃত্রিম চোখ-পাকানো রাগকে পর্যন্ত সে সম্মান করিয়া চলে। প্রথমটা যশোদার একটু কেমন কেমন লাগিয়াছিল, তার-পর দু'একটা দিন যাইতে না যাইতে সে টের পাইয়াছে, এটা দু'জনের একটা ভালবাসার খেলা মাত্র। দু'জনে বড় মজা পায় এ খেলায়। এই বয়সের দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে, মিলন যাদের হইয়াছে মোটে ছ'মাস আগে, এমন একটা আশ্চর্য মিল আছে মনের যে যেটুকু যশোদা বুঝিতে পারে তাতেই সে অবাক হইয়া যায়। সুব্রতা যদি আব্দার ধরে, আমায় আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও,—আদর দিলেই বৌরা সময় অসময়ে যে আব্দার ধরিয়া স্বামীদের মেজাজ বিগড়াইয়া দেয়,—অজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিচ্ছি পেড়ে। সুব্রতা জানে অজিত বুঝিবে এটা তার আব্দার, সুব্রতার এই জানা অজিত জানে, অজিতের এই জানাও সুব্রতা জানে, আবার সুব্রতার—দু'জনের জানাজানির এই প্রক্রিয়া যশোদার মনে হয় অন্তহীন আর রহস্যময়, তবু যেন দু'জনের মধ্যেই এর সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা ঘটিয়াছে, সহজ ও শান্ত আনন্দের গভীর অনুভূতিতে।

একেই কি বলে ভালবাসা? মনের মিল?

যশোদা ভাবে।

হিংসার মতো কি যেন একটা মৃদু প্রতিক্রিয়া জাগে যশোদার মনে, ক্ষীণ একটা অস্বস্তি বোধের পীড়ন চলিতে থাকে।

সুব্রতা তার ঘর সাজায়, সকালে আর সন্ধ্যায় অজিত তাকে সাহায্য করে। তিন টাকা ভাড়ায় যশোদা বড় ঘরখানাই তাদের দিয়াছে ; একটি তরঙ্গ আর দুটি স্যুট্‌কেশে ঘরটা যেন খালিখালি দেখায়। সুব্রতা দেয়ালে টাঙায় ছবি আর ফটো, জানালার দেয় পর্দা, অজিতকে দিয়া আল্‌না আনায় আর বেশী-বেশী জামা-কাপড় অকারণে বাহির করিয়া সাজাইয়া রাখে, যশোদার দেওয়া চৌকির পায়া চারটিতে রঙীন কাপড়ের ঢাকনি দেয়, টুকিটাকি আরো কত কি যে সে করে। আর সেই সঙ্গে করে অজিতের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ—যশোদার সামনেই। মাঝে মাঝে যশোদারও মতামত জিজ্ঞাসা করে। মাস নয়, বছর নয়, সমস্ত ভবিষ্যৎকে সে যেন এই একটি ঘরে আটক করিয়াছে। এই ঘরেই তার যেন চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত। কোথায় টেবিল পাতিবে, কোন্‌দিকে আলমারি রাখিবে ক'খানা আর কি ধরনের চেয়ার কিনিবে, এসব কল্পনার আর শেষ থাকে না! যে রেটে সে কল্পনায় আসবাব কিনতে থাকে, তাতে এক বছর পরে এ-ঘরে তিল ধারণের স্থান থাকিবে কি করিয়া যশোদা ভাবিয়া পায় না।

কয়েকদিন রাঁধিয়া খাওয়ায় যশোদাই। তারপর একদিন দুপুরে সুব্রতা বলে, 'আমি কোথায় রাঁধব দিদি?'

'আমার রান্না রুচছে না?'

'ওমা, সে কি কথা! সত্যি বলছি দিদি, এমন রান্না জীবনে খাই নি কখনো। আজ যে কুমড়োর ছক্কা খাওয়ালে, ঠিক অমৃতের মতো লাগলো! কুমড়োর ছক্কার যে আবার এমন স্বাদ হয়, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। তবে কি জান দিদি, আমরা হলাম ভাড়াটে, চিরকাল তো আর তোমার ঘাড়ে খাওয়া উচিত হবে না।'

'আমার ঘাড়ে খাবে কেন বোন? তোমরা খরচা দিও, রান্না এক জাগা-তেই হবে। চারটি তো প্রাণী আমরা বাড়িতে, দু'জায়গায় রেঁধে কোনো লাভ আছে? মিছেমিছি বেশী খরচ।'

শুনিয়া সুব্রতা খুশি হইয়া তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া যায়। যশোদার প্রশংসা করিয়া বলে যে, বাস্তবিক, বয়স না হইলে কি এসব কথা মানুষের মাথায় আসে! কিন্তু একটা বিষয় আপত্তি করে সুব্রতা, সকাল সন্ধ্যায় চা-জলখাবার সম্বন্ধে।

'চা'টা কিন্তু আমি করব দিদি।'

'নিজের হাতে ক'রে খাওয়াতে চাও, না?' বলিয়া যশোদা হাসে।

সুব্রতার সঙ্গে এমনিভাবে আলাপ করে যশোদা, কখনও মা মাসীর মতো, কখনও সমবয়সী সখীর মতো। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পরেই সব গোলমাল হইয়া যায়, সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে সমবয়সী বন্ধু মনে হয় তাকে, আর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে খেয়াল হয় যে সে ষোলবছরের একটা কচি মেয়ে মাত্র, যে বয়সের মেয়ে যশোদারও থাকিতে পারিত।

এরা যে তার ভাড়াটে একথা যশোদার মনেই থাকিতে চায় না। দু'জনকে তার মনে হয় অতিথি, তার বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছে; এদের খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করা আর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখার দায়িত্ব যেন তার।

পরদিন সকালে উনুনে আঁচ দিয়া যশোদা সুব্রতাকে ডাকিতে যায়। এ সময় রোজ সুব্রতা রান্নাঘরে উপস্থিত থাকে, আজ তাকে না দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল।

ঘরে গিয়া যশোদা ছাখে কি, অজিত ছোট টুলটিতে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে, চৌকিতে শতরঞ্জির উপর উপুড় হইয়া গুটানো তোষকে মুখ গুঁজিয়া সুব্রতা কাঁদিতেছে।

'কি হল সকালবেলা তোমাদের?'

যশোদার সাড়া পাইয়াই সুব্রতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে। জলভরা চোখ, ভিজা গাল আর ফুলানো ঠোঁটে কি ছেলেমানুষ আর সুন্দরই তাকে দেখায়! মনে হয় গিন্নিপনার অভ্যাসটাও যেন তার এখনকার মতো ঘুচিয়া গিয়াছে। শিশুর মতো যশোদার কাছে সে নালিশ জানায়।

'চায়ের জিনিসপত্র কিনবার পয়সা পর্যন্ত নেই দিদি। বললাম, এমনি

মোটা-মোটা চুড়ি ছ'গাছা ক'রে কেউ একহাতে পরে না, ছ'গাছা চুড়ি বেচে দিয়ে এস। তা, কিছুতেই বেচবে না। কি হয় বাড়তি চুড়ি বেচলে ?'

'চায়ের জিনিসপত্র কেনার জন্য বৌ-এর গয়না বেচব !'—অজিত বলে।

'কেন, বৌ কি পর ?' সুব্রতা বলে।

কঠিন সমস্যা সন্দেহ নাই। বৌ-এর গয়না বেচার সমস্যা যশোদার আগের ভাড়াটাদের মধ্যেও অনেকবার দেখা দিয়াছে, কিন্তু সমস্যাটা দাঁড়াইত ঠিক উল্টা। গয়না বেচিতে স্বামীরাই ছিল উৎসুক, বৌয়েরা ছিল বিরোধী। কলহ ছিল তাদের ভিন্ন ধরনের, কথা কাটাকাটি ছিল যেন গালাগালি আর অভিশাপ, মারামারির ভূমিকার মতো। দু'একটা স্বামী যে বৌকে চড়-চাপড়টা বসাইয়া দিত না, তাও নয়। অতীতে স্বামী-স্ত্রীর যত কলহ সে মধ্যস্থতা করিয়াছে তার সঙ্গে এই নব দম্পতির কলহের পার্থক্যটা এত বেশী স্পষ্ট হইয়া যশোদার কাছে ধরা পড়ে যে, এদের মিল ঘটানোর লাগসই উপায় সে ভাবিয়া পায় না। মিলনের চেয়ে মধুর যে বিরোধ, তার কি প্রতিবিধান আছে ?

একরকম জোর করিয়া রান্নাঘরে ধরিয়া নিয়া গিয়া দু'জনকে সে চা আর হালুয়া খাওয়ায়। মন কাঁদিতে থাকে নন্দ আর সুবর্ণের জন্য। হয়তো এমনিভাবে কোথায় কার বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তারা আছে, পয়সার টানাটানির জন্যই হয়তো তাদের প্রথম ঝগড়া বাধিয়াছে এমনিভাবে। প্রথম বয়সের উত্তেজনায় দুঃখকে বরণ করায় সুখ দু'দিনে ঘুচিয়া গিয়া দুর্দশার দু'জনের সীমা থাকিবে না, এই কথায় সর্বদা সে ভাবে, কিন্তু আসলে হয়তো এদের মতোই দুর্লভ আনন্দে দিনগুলি তাদেরও ভরিয়া আছে ! ভাবিতে গিয়া সংশয় জাগে যশোদার। সুবর্ণ তো সুব্রতার মতো নয়। সুব্রতার গিন্নিপনা আছে পাকামি নাই, লজ্জাহীনতা আছে বেহায়াপনা নাই, বুদ্ধি আছে কুটিলতা নাই, চপল হাসি মন ভুলানোর অস্ত্র নয় সুব্রতার। সুব্রতার মতো সুবর্ণ কি কাউকে আপন করিতে পারে, সুব্রতার মতো মনের মিল কি সুবর্ণের সঙ্গেও কারো হয় ?

অজিতের চা খাওয়া দেখিতে দেখিতে যশোদার মনে হয়, কে জানে নন্দও তো অজিতের মতো নয়। এদের দু'জনের মতো নয় বলিয়াই হয়তো

ওদের মধ্যে এদের মতো মিল হইয়াছে।

যশোদার গম্ভীর মুখ দেখিয়া অজিত আর সুব্রতা ভাবে, তাদের চুড়ি বিক্রির কথাটাই সে ভাবিতেছে। দু'জনেই যশোদার দিকে তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়, তারপর প্রায় একসঙ্গেই পরস্পরের দিকে মুখ ফিরানোর ফলে যেই চোখাচোখি হয়, দু'জনের মুখেই মৃদু হাসি ফুটিয়া ওঠে। যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটা আজও তাদের চোখে অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, এখনো বিস্ময় আর কৌতুক জাগে।

হাসি দেখিয়া যশোদা বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তোমরা।'

দু'জনে ভাবে, এ বুঝি যশোদার শরীর দেখিয়া হাসার জন্য তিরস্কার। লজ্জায় অজিতের চোখ মিট্‌মিট্ করে, সুব্রতার গাল দু'টি লাল হইয়া যায়।

যশোদা বলে, 'দুটো চুড়ি বেচবে কি বেচবে না, তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, কাঁদাকাটা কেন? তেমন দরকার হ'লে গয়না বেচতে কোনো দোষ নেই —বেচাই বরং উচিত। মেয়েমানুষের গয়না তো শুধু শখের সামগ্রী নয়, বিপদে আপদে কাজে লাগবে বলেই গয়না গড়ানো, ও হল একধরনের সঞ্চয়। তাই বলে যখন-তখন সামান্য কারণে বেচতে নেই। চায়ের জিনিস-পত্র কেনার জন্যে কি আর গয়না বেচা চলে? তবে মনে কর সুবুর— সুব্রতার একটা অসুখ বিসুখ হওয়ার কথাটা যশোদার জিভের ডগায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সামলাইয়া নিয়া সে বলে, 'ছেলেপিলে হবে বলে টাকার দরকার, তখন তো আর বৌ-এর গয়না বেচব না বললে চলবে না! আমার কাছে ধার নাও ক'টা টাকা, পরে শোধ ক'রে দিও।'

সুব্রতার মুখের লালিমা, আরও বেশী গাঢ় হইয়া আসছিল, সে চুপ করিয়া থাকে।

অজিত বলে, 'টাকা ধার করতে কেমন যেন লাগে।'

যশোদা সুব্রতার মুখখানা দেখিতে দেখিতে বলে, 'সে তো ভালই। তবে দিদি ব'লে যখন ডাকো আমায়, নিশ্চয় শোধ ক'রে দেবে জানো মনে মনে, তখন ক'টা দিনের জন্য আমার কাছে নিতে দোষ নেই।'

অজিত কাজে চলিয়া যায়। সুব্রতা রান্নাঘরে আসিয়া যশোদাকে টুকি-

টাকি কাজে সাহায্য করিবার সুযোগ খোঁজে আর বারবার কি যেন একটা কথা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া যায়। রান্না প্রায় সবই হইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল রান্না শেষ করা যশোদার চিরদিনের অভ্যাস, ভাড়াটেরা তার ন'টার মধ্যে খাইয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত। মাঝখানে বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, শুধু সে আর ধনঞ্জয়, তখন রান্না শেষ হইত অনেক বেলায়। অজিত আসিবার পর আবার যশোদা ন'টার মধ্যে সকালের রান্না শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাল যে যশোদার বিশেষ লাগে তা নয়। মস্ত উনুনে কত লোকের রান্না সে একদিন রাঁধিত, বাড়িতে দু'বেলা যেন চলতি নিমন্ত্রণের হাঙ্গামা, এখন শুধু সিদ্ধ করা চারজনের ভাত।

'জানো দিদি—'

কিন্তু যশোদাকে কথাটা সুব্রতার আর বলা হয় না। রাজেন আসিয়া বসিতে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। রাজেনের কাছে হঠাৎ তার এত লজ্জার কারণটা কেউ বুঝিতে পারে না।

'ভাড়াটেরা কেমন চাঁদের-মা?'

'মন্দ কি!'

'আরেক জোড়া ভাড়াটে আছে, আনব?'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'কেন এক জোড়ায় কলঙ্ক ঠেকানো যাবে না?'

রাজেনও হাসিয়া বলে, 'তা কেন, রোজগারের ব্যবস্থাও তো করতে হবে?'

'এদের মতো ভদ্রলোক ভাড়াটে আনবে তো?'

প্রশ্ন শুনিয়া রাজেন উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, এদের কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না চাঁদের-মা? না তিনটাকা ভাড়ায় একখানা ঘর দিতে হয়েছে বলে ভাবছ? আমি কি সে সব না ভেবেই তোমাকে ভাড়াটে এনে দিয়েছি! ক'টা মাস অপেক্ষা কর, অজিতের মাইনে ডবল হয়ে যাবে, তখন—'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলে, সেজন্য নয়। ভাবছি, শেষকালে কি ভদ্রলোক ভাড়াটেই শুধু রাখতে হবে, আমায় যারা দু'চোখে কোনোদিন

দেখতে পারে নি ?'

'আমি কিন্তু মানুষ চাঁদের-মা।'

'মানুষ না ঘোড়া তুমি তা জানিনে, তবে ভদ্রলোক তুমি নও।'

'বি-এ ফেল করেছি, সাতষট্টি টাকায় চাকরি করা, বিয়ে করা, বৌ নিয়ে ঘরসংসার করছি—আমি যদি ভদ্রলোক নই, কে তবে ভদ্রলোক শুনি? সত্যপ্রিয় ?'

'ও আবার একটা লোক নাকি যে ভদ্র হবে ? ও হল মানুষের রূপ ধরা দৈত্য—কিংবা দানোয় পাওয়া মানুষ। চাদ্দিকে হুহু করে বাড়ি তুলে গণ্ডাগণ্ডা ভদ্রলোক এসে বাসা বাঁধছে, ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না ? চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড়লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামা-কাপড় পরে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমানবোধটা থাকে টনটনে কিন্তু যত বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়,—আর বলব ?'

রাজেন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বলতে চাও বল, তবে আর শুনবার দরকার নেই। তোমার যখন ঝোঁক চাপে চাঁদের মা—'

'মুখে খৈ ফুটতে থাকে, না ?'

'ভদ্রলোকের ওপর তোমার এত রাগ কেন যশোদা ?'

'ভদ্রলোকেরা কি মানুষ ?'

আরেক জোড়া ভাড়াটে আনিবার অনুমতি যশোদা দেয়। এক জোড়া যখন আসিয়াছে, আরও আসুক। মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে থাকে যশোদার। মনে হয়, চলিতে চলিতে সামনে একটা বাধা পাইয়াছে বলিয়া নিজের মনের দুর্বলতার জন্য সে যেন বিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুপুরবেলা কুমুদিনী আসিয়া বেড়াইয়া গেল, সুব্রতার সঙ্গে ভাবও করিয়া গেল। ইতিমধ্যে যতবার সে আসিয়াছে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যশোদার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে, বসিতে বলিলেও বসে নাই। আজ প্রায় সমস্ত দুপুর এ বাড়িতে কাটাইয়া গেল।

সুব্রতার কি হইয়াছে কে জানে, সমস্ত দুপুর কুমুদিনী যে এত কথা বলিল তার সঙ্গে, কথায় বা ভাব-ভঙ্গিতে তার এতটুকু গিন্নিপনা দেখা গেল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হইতে লাগিল তাকে।

কুমুদিনী চলিয়া যাওয়ার পর আবার সে উস্‌খুস করিতে থাকে, সকালে রান্নাঘরে যেমন করিয়াছিল।

বলে, 'জানো দিদি, সেই যে বলেছিলে না—?'

যশোদা বলে, 'কি বলেছিলাম?'

'সেই যে, যে জন্য গয়না বেচা চলে?'

কিছুক্ষণ যশোদা বুঝিতেই পারে না, অবাক হইয়া সুব্রতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর খেয়াল হয়।

'ওমা, সত্যি?' বলিয়া সুব্রতাকে সে বুকে টানিয়া নেয়।

কি হয় তখন যশোদার, প্রথম সন্তান সম্ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত পরের একটা মেয়েকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া? তীব্র বেদনার সম্ভাবনায় বিরাট দেহের প্রত্যেকটি অণু ভয়ার্ত ঔৎসুক্যে সজাগ হইয়া ওঠে, চাঁদকে প্রসব করার সময় যেমন হইয়াছিল। আলিঙ্গনের চাপে দম আটকাইয়া সুব্রতার প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। জোর তো সোজা নয় যশোদার দু'টি বাহুতে। সুব্রতার অস্ফুট আর্তনাদে সচেতন হইয়া সে তাকে ছাড়িয়া দেয়। ধপ্ করে মেঝেতে বসিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ক্ষীণস্বরে সুব্রতা বলে, 'আরেকটু হলেই শেষ করে দিয়েছিলে দিদি।'

রাত্রে ধনঞ্জয়কে খাইতে দিয়া সামনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে যশোদার মনে হয়, আরেকজন মানুষকে খবরটা শুনাইতে না পারিলে তার বুকটা ফাটিয়া যাইবে।

'জানো, সুবুর ছেলেপিলে হবে।'

বাড়িতে ভাড়াটে আসিবার পর ধনঞ্জয় কেমন মুষড়াইয়া গিয়াছে। ক'দিন চুপচাপ শুধু সকলকে দেখিয়া গিয়াছে, মুখে তার একটি কথা শোনা যায় নাই। যশোদার মুখে সুব্রতার সন্তান-সম্ভাবনার খবরটা শুনিয়া এবিষয়ে সে কিছুই বলে না, অভিমানী বালকের মতো নিজের

নালিশটা জানাইয়া বসে।

'রাজেনকে তুমি অত খাতির কর কেন চাঁদের-মা ?'

সুব্রতার নূতন খাপছাড়া অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা দেখিয়া যশোদা আশ্চর্য হইয়া গেল। কোথায় সে ছিল, কতদূর বিভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে, হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে কোথায়। কিন্তু ছোট বড় সব বিষয়ে অনেক ভুল করিলেও এবং নানারকম মুশকিলে পড়িলেও কখনো তাকে কাবু হইতে দেখা গেল না। নিজেই ভুল সংশোধন করিতে লাগিল, মুশকিলের আসান করিতে লাগিল। চায়ের সেট আর ওই ধরনের কয়েকটি অভাব মিটানোর জন্য সুব্রতার চুড়ি বিক্রি করার সমস্যা যশোদা সমাধান করিয়া দিয়াছিল। তবে সেটা সাময়িকভাবে কোনোরকমে কাজ চালানো গোছের সমাধান। সে সমাধান গ্রহণ করার বদলে সুব্রতা নিজের সমস্যার আরও স্থায়ী ও ব্যাপক মীমাংসা করিয়া ফেলিল। যশোদার কাছে টাকা ধার করার বদলে দামী চায়ের সেট কেনার মতো প্রয়োজনগুলিকেই বাতিল করিয়া দিল।

হাসিমুখে বলিল, 'প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারি নি দিদি কদ্দূর হিসেব করে চলতে হবে আমাকে।'

একটি এলুমিনিয়ামের কেটলী আর সস্তা কয়েকটি কাপডিস্ মাত্র কেনা হইল। আসবাব কিনিয়া ঘর বোঝাই করা তো বন্ধ হইয়া গেলই, যশোদাকে একদিন সুব্রতা জিজ্ঞাসাও করিল, বাড়তি কয়েকটা আসবাব বিক্রি করিয়া ফেলা যায় না ?

খরচপত্রও সে হঠাৎ কমাইয়া ফেলিল। যুদ্ধের সম্ভাবনা টের পাওয়া মাত্র বুদ্ধি থাকিলে একটা দেশ যেমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই বাধিবে জানিয়া সুব্রতাও যেন তেমনি-ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে।

সুব্রতার মধ্যে ন্যাকামি নাই। তরুণ মনের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা তার মধ্যে যথেষ্টই আছে কিন্তু দামও সে করিতে জানে। বাঁকা আলোয় চকচকে কাঁচকে হীরার মতো খাতির করার খেলায় হয়তো সে আনন্দ পায় এবং সে কাঁচের বিনিময়ে কিছু সোনাদানাও অনায়াসে দিয়া বসে

কিন্তু হীরার বদলে কাঁচ পাইয়াছে বলিয়া কখনো আপসোস করে না। কারণ, কাঁচ যে কাঁচ তা সে জানে, আসলে সে দাম দেয় শুধু আনন্দটুকুর।

যশোদা এ'টা আশা করে নাই। সুব্রতাকে ভাল লাগিলেও এবং একটু স্নেহ জাগিলেও প্রথমটা তাকে যশোদার মনে হইয়াছিল, তুবড়ির মতো উচ্ছ্বাসভরা অকালে পাকা ফাজিল মেয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে যশোদা বুঝিতে পারিয়াছে, কথা বলা ছাড়া আর কোন বিষয়ে সে তুবড়ি-ধর্মী নয়। ঠেকিয়া শেখা অভিজ্ঞতার পরিমাণটা তার অস্বাভাবিক রকমের বেশী নয়, কেবল দেখিয়া-শেখা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্বভাবসিদ্ধ পটুতার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারটা বেশীরকম ভরিয়া ওঠায় তাকে একটু পাকা মনে হয়, আসলে মেয়েটা কাঁচাই আছে। মনকে সঙ্কীর্ণ করার অপরাধে নিজেকে অপরাধী করে নাই বলিয়া সাহস ও সরলতা তার একটু বেশী, তাই তাকে মনে হয় ফাজিল।

রাজেনকে যশোদা বলে, 'না, এরা ঠিক ভদ্রলোক নয়।'

'দেখলে তো? এমন ভাড়াটে এনে দিয়েছি, দু'দিনে পছন্দ হয়ে গেল। কি তোমার ভাল লাগে না লাগে, সব জানা আছে চাঁদের-মা!'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'মনের মানুষ তুমি, তুমি জানবে না তো কে জানবে?'

কাছে বসিয়া কুমুদিনী মুখ বাঁকায়। ধনঞ্জয় অসহায় দৃষ্টিতে যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সুব্রতার সুঠাম দেহ আর সুন্দর মুখখানা দেখিয়া একটা কথা যশোদার বার বার মনে পড়িয়া যায়। বাড়ির লোকের পছন্দ করা কুরূপা মেয়েটির বদলে তাকে বিবাহ করিয়া অজিত যে গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে যশোদাকে প্রথম দিন তাই ব্যাখ্যা করিয়া শোনানোর সময় অজিতকে হাসিতে দেখিয়া সুব্রতা সবিনয়ে ঘোষণা করিয়াছিল, সে সুন্দরী বটে কিন্তু তার মতো গণ্ডা-গণ্ডা সুন্দরী মেয়ে রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি যাইতেছে। সুব্রতার কথা আর ভঙ্গিকে তখন যশোদার মনে হইয়াছিল, একেলে মেয়ের পাকামির প্যাঁচ, ঘষামাজা ন্যাকামি। তারপর যশোদা জানিতে

পারিয়াছে মেয়েদের পক্ষে এ বিশ্বাস পোষণ যতই বিস্ময়কর হোক, কথাটায় স্বব্রতা সত্য-সত্যই বিশ্বাস করে। তার মতো রূপবতী মেয়ের পক্ষে রূপ সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা আন্তরিকতার সহিত পোষণ করা যে সম্ভব, এ অভিজ্ঞতা যশোদার ছিল না। রাম-লক্ষ্মণের মন ভুলানোর প্রতিযোগিতায় সীতা-উর্মিলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এ বিশ্বাস যে সূর্পণখার ছিল, সে তো সে স্ত্রীজাতীয়া জীব বলিয়াই!

স্নেহ করার সঙ্গে স্বব্রতাকে যশোদা তাই একটু শ্রদ্ধাও করিতে শিখিয়াছে।

৪

স্বব্রতার চরিত্রের আরেকটা দিকও ক্রমে ক্রমে যশোদার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মেয়েটা খুব মিশুক।

যশোদা আর কুমুদিনীর সঙ্গে ভাব জমিয়াছিল একদিনে, পাড়ার কয়েকটি বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেও সে ভাব জমাইয়া ফেলিল কয়েকদিনের মধ্যে। প্রথমে পরিচয় করিতে গেল সবচেয়ে কাছের বাড়ির এবং সম্ভবত ছোটখাট একটা পরিধির মধ্যে সবচেয়ে গরীব ও অতি-ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে। পরিবারটি অমূল্য নামে একজন বছর পঞ্চাশেক বয়সের রোগজীর্ণ কেরানী ভদ্রলোকের। যশোদার সঙ্গে এ-বাড়ির মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও পরিচয় আছে অনেকদিনের। পরদিনই ও-বাড়ির সাত হইতে চল্লিশ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের আটজন মেয়ে যশোদার বাড়ি বেড়াইতে আসিল। সাত বছর বয়সের মেয়েটির রঙীন কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, যৌবনে পা দিয়া তাড়াতাড়ি দলের তিনটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে যেন তার তর সহিতেছে না।

অনেকদিন আগে অমূল্যর বাড়ির মেয়েরা ত্ব'একবার যশোদার বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছিল। যশোদা তখনও কুলি-মজুরদের বাড়িতে ভাড়াটে রাখিতে আরম্ভ করে নাই। তারপর নানা আপদে বিপদে মাঝে মাঝে যশোদাকে তারা ডাকিয়াছে বটে, কিন্তু যশোদার বাড়িতে কখনো আসে

নাই। আজও তারা যশোদার কাছে আসে নাই, আসিয়াছে সুব্রতার নতুন সংসার দেখিতে।

অমূল্যর স্ত্রী আশাপূর্ণা পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'আমরা এলাম। কই, তোমার নতুন ভাড়াটে চাঁদের-মা ?'

যশোদা বলিল, 'আমার নতুন ভাড়াটেকে খুঁজছ পাঁচুর মা ? এসো, বসবে এসো।'

আশাপূর্ণার পান চিবানো বন্ধ হইয়া গেল। এতকাল কুলি-মজুরের সঙ্গে কারবার করিয়া প্রায় তাদের মতো বনিয়া গিয়া এখনো তাকে সমানের মতো সম্বোধন করার মতো ভদ্রতা যশোদার আছে, সে তা কল্পনাও করে নাই।

কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল যশোদার বাড়িতে দুপুরবেলা রীতিমতো মেয়েদের বৈঠক বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। দু'একটি মেয়ে নয়, উকিল, ডাক্তার, মাস্টার, প্রফেসর, কেরানী, জীবনবীমার এজেন্ট প্রভৃতি অনেক রকম ভদ্রলোকের বাড়ির অনেক মেয়ে। সকলের বাড়ি যে খুব কাছে তাও নয়। বড় রাস্তার ধারের কয়েকটি বাড়িতে পর্যন্ত সুব্রতা তার পরিচয়ের অভিযান আগাইয়া নিয়া গিয়াছে।

হাসি-গল্প গান-বাজনায় যশোদার বাড়ি দুপুরবেলা মুখরিত হইয়া ওঠে। সুব্রতা মোটামুটি গান জানে, একটি হারমোনিয়াম আর একটি সেতার তার সঙ্গেই আসিয়াছিল। তারপর কয়েক জোড়া তাস আসিয়াছে, নগেন ডাক্তারের বাড়ির ক্যারাম বোর্ডটি আসিয়াছে। একটি করিয়া মুখ আর পরচর্চার মালমসলা তো সকলে সঙ্গে করিয়াই আনে।

একটা আড্ডা পাইয়া সকলেই খুশি। সুব্রতা যেন মেয়েদের একটা ছোট-খাট ক্লাব সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। কাজটা পাড়ার যে কোনো বাড়ির যে কোনো মেয়ে ইচ্ছা করলেই করিতে পারিত কিন্তু এতদিন কারও খেয়ালও হয় নাই যে মাঝে মাঝে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করার বদলে এক জায়গায় সকলে একসঙ্গে মিলিয়া পাড়াবেড়ানোর সাধ মিটাইবার এরকম একটা সহজ উপায় আছে। অবশ্য নিজের বাড়িতে রোজ এতগুলি মেয়েমানুষের সমাগম সকলের পছন্দ হইত না। তবে একত্র হইতে চাহিলে কি আর

স্থানের অভাব হয়!

প্রথম প্রথম কেউ আসিয়াছিল নিছক ভদ্রতার খাতিরে, কেউ মনের খেয়ালে, কেউ কৌতূহলের বশে। আসিবার আগে কেউ ভাবেও নাই যে, তাদের জন্য তাদের নিয়েই সুব্রতা যশোদার বাড়িতে এমন একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করিতেছে।

অল্পদিনে সুব্রতার নামহীন, উদ্দেশ্যহীন, কমিটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীহীন মহিলা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। যশোদা রাগ করিবে কি খুশি হইবে বুঝিয়া উঠিবার সময়ও পাইল না। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার আগে নিজেই সে সঙ্ঘে যোগ দিয়া বসিল। নানাবয়সী মেয়েদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শ্রেণী বিভাগের জন্য সুব্রতাকে যে কৌশল অবলম্বন করিতে হইল, এটা হইল তার ফল।

'গরু আর বাছুর একসঙ্গে বসলে কি জমে দিদি?'

'না দিদি, জমে না।'

'কাল তা'হলে আমি বিনু, উমি, সাবু এদের আমার ঘরে ডেকে নিয়ে যাব, তুমি বড়দের নিয়ে বসবার ঘরটাতে থাকবে, কেমন?'

সুব্রতা ভাড়া নিয়াছে একটি ঘর, কিন্তু মেয়েদের বসানোর জন্য আরেকটি ঘরকে বসিবার ঘরে পরিণত করিতে তার বাধে নাই। যশোদাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে নাই।

তারপর যশোদা বয়স্কাদের আসরে ভিড়িয়া গিয়াছে। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ দু'য়ের মাঝামাঝি, কিন্তু সকলেই শিথিল। কেউ এখনও সচেতন গর্বের সঙ্গেই ফর্সা চামড়ার স্তিমিত রূপের ঝাঁঝ বিকীর্ণ করিতেছে, রূপের অভাবে আসিয়া-যাওয়ায় বয়সটা পার হইয়া কেউ স্বস্তি বোধ করিতেছে। কারও গায়ে গয়না বেশী, কারও গায়ে কম গয়নার ফ্যাসন গয়নার চেয়ে স্পষ্ট। কারও মুখে পান, কারও মুখে ভাঙা-বাঁকা দাঁতগুলি রোজ সকালে কয়লার গুঁড়ার ঘষামাজা পায় বলিয়া বেশ সাদা।

কয়েকটি মুখ যশোদার অপরিচিত। চারিদিকে অনেক নতুন বাড়ি উঠিয়াছে অনেক নতুন লোক শহরতলিতে বাস করিতে আসিয়াছে। সুব্রতা হয়তো

এতদূর হইতেও একজনকে টানিয়া আনিয়াছে, শহরতলির পুরানো বাসিন্দা হইলেও যার মুখ চেনার সুযোগ যশোদার ঘটে নাই। চেনা হোক, অচেনা হোক, যশোদা এদের চেনে। এরা সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের গিন্নি। কপালে থাকলে যশোদা নিজেই হয়তো এতদিনে এদের মতো একজন গিন্নি হইয়া দাঁড়াইত।

কিন্তু কোথায় যশোদার চাঁদ? আত্মীয়-স্বজনভরা সংসার? সংসার না থাকিলে কি গিন্নি হওয়া চলে! মজুরদের নিয়া সে সংসার গড়িয়া গিন্নি হইয়া বসিয়াছিল, সত্যপ্রিয় সে সংসারও তার ভাঙিয়া দিয়াছে।

যশোদার দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ রাগ দ্বেষ হিংসা গ্লানি সব কিছুর উপর চিরদিন স্থায়ী একটা প্রলেপ থাকিত—মজা লাগার। জিভের ঘায়ে মধুমাখা মলমের প্রলেপের মতো। সেই প্রলেপের অভাবে যশোদার মনের সবগুলি আঘাতের ক্ষত আজকাল কটকট করে।

যশোদার কিছুই করিবার নাই।

সর্বদা পরের বিপদ ঘাড়ে করা, পরের সমস্যার মীমাংসা করা, বাঁচিয়া থাকার মর্মান্তিক প্রচেষ্টায় আহত অনেকগুলি অশিক্ষিত ও অমার্জিত বয়স্ক শিশুর সেবায় মশগুল থাকা, সব ঘুচিয়া গিয়াছে। রাজেন তাই তাকে শ্রমিক নেতার কাজে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, বাড়িতে ভাড়াটে আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যা নিয়া যশোদা ছেলের শোক ভুলিয়াছিল, আত্মীয় পরিজনের অভাব ভুলিয়াছিল, নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পাইয়াছিল, এসব কৃত্রিম খেলনায় কি সে অভাব মেটে?

অপরের দেখাইয়া দেওয়া আদর্শের দিকে অপরের সৃষ্ট কর্মের নালায় জীবনস্রোতকে বহাইয়া দিবার সাধ যশোদার কোনোদিন ছিল না। ওসব তার ধাতে সহ্য হয় না। সে যেমন আর তার যা আছে তেমনি থাকিয়া আর সেই সব নিয়া অনেকগুলি পছন্দসই পরের জীবনের ঘনিষ্ঠ আবেষ্টনীর মধ্যে সে নিজের নিয়মে বাঁচিতে চায়।

ভদ্রলোক নামে যে একশ্রেণীর মানুষ আছে তাদের পুত্রকন্যা প্রসব

করিয়া আর সংসার চালাইয়া মাঝ বয়সেই যেসব গিন্নিদের দেহ, মন, মুখ, এমন কি শাড়ির আঁচল আর ব্লাউজ শেমিজ পর্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাদের সঙ্গে কয়েকটা দুপুর আড্ডা দিয়াই যশোদার হাঁপ ধরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। তার বদলে হঠাৎ সে যেন আহত মনের ক্ষতে মিষ্টি মলমের মৃদু একটা স্বাদ অনুভব করিতে লাগিল।

তার বাড়িতে আসিয়া তার ঘরে বসিয়া একেবারে তার চোখের সামনে পাড়ার এতগুলি স্ত্রীলোক নিজেদের শ্যাওলা ধরা জীবন মেলিয়া ধরে আর উপেক্ষা, অবহেলা বা বিতৃষ্ণার বদলে যশোদার মনে জাগে মমতা। অজানা কিছু নয়, নতুন কিছু নয়। যশোদা এদের জানে, এদের জীবন যাত্রার পরিচয়ও রাখে। এদের দূরেও সে রাখিত সেই জন্যই। তবে দূরে রাখিয়া মোটামুটি ধারণা পোষণ করা এক কথা। একঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া অসংখ্য খুঁটিনাটি বিকৃতি আর ব্যর্থতা আবিষ্কার করিয়া মমতা বোধ করার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য।

কেবল অসুখের সময় গিয়া সেবা করিয়া, বিপদের সময় গিয়া সাহস দিয়া আর উৎসবের সময় গিয়া খাটিয়া আসিয়া যশোদা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল যে এরাও মানুষ।

চাঁদ মরিয়া যাওয়ার পর সে যেমন ডাকছাড়িয়া কাঁদিয়াছিল, নগেন ডাক্তারের ফর্সা মোটা বৌ অতসী তার ছেলের শোকে তেমনিভাবে কাঁদিয়াছে।

অতসীর এখনো তিনটি ছেলে আর দু'টি মেয়ে আছে। বড় ছেলে রমেন ডাক্তারি পড়ে। বড় ম্লান মুখখানা ছেলেটার, বড় বিষণ্ণ স্তিমিত দৃষ্টি। দেখিলেই যশোদার মনটা কেমন করিয়া ওঠে। ক'দিন আগে দুপুরবেলা কি দরকারে সে মাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তখন তার চোখে যশোদা যেন দেখিতে পাইয়াছিল, একটা চাপা-পড়া লাজুক ভাবপ্রবণ ক্ষুধা। 'বলগে যা, আসছি' বলিয়া ছেলেকে বিদায় দিয়া হাতের তাস নামাইয়া সকলের দিকে চাহিয়া অতসী তৃপ্তির হাসি হাসিয়াছিল,—সগর্বে।—'আর বছর ডাক্তারি পাস করবে। এক বাড়িতে দু'জন ডাক্তার হবে, রুগীকে আর ফিরতে হবে না—একজন বাড়ি না থাক আরেকজন তো

থাকবে, কি বলেন? পাস করেই অবিশ্যি ওনার মতো চার টাকা ফি করলে চলবে না, প্রথম দু'চার বছর দু'টাকা করে, তারপর পসার বাড়লে চার টাকা। উনি হয়তো তদ্দিনে আট টাকা ফি করে ফেলবেন, এখন থেকেই বলছেন, চার টাকায় আর পোষায় না—'

নন্দর কাছে রমেন কীর্তন শিখিতে আসিত। তখনও তাকে দেখিয়া যশোদার মনে হইত, ডাক্তারি বিদ্যার চাপে ছেলেটা যেন দিন দিন কুঁকড়াইয়া যাইতেছে। দেহতত্ত্ব জিজ্ঞাসু বৈষ্ণবের ছাঁচে ঢালিয়া মানুষ করিয়া ছেলেকে মড়া কাটিতে পাঠানোর জন্য অতসীর গর্ব দেখিয়া একটা দুর্বোধ্য বন্ধনের অনুভূতিতে যশোদাকে ব্যাকুলভাবে একবার জোরে শ্বাস টানিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর যশোদার মনে হইয়াছিল, কেবল রমেন তো নয়। সুন্দরী বড় মেয়েটাকে আই. সি. এস. বরের উপযোগী লেখাপড়া চালচলন শিখাইয়া তার চেয়ে অশিক্ষিত মাঝ বয়সী গেঁয়ো রাজার রানী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেবল অতসীও তো নয়। একে একে অন্য গিন্নিদের ছেলেমেয়ের কথাও যশোদার মনে পড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যেন এক ধরনের জীবন যাপনের জন্য সকলেই যেন অন্য ধরনের জীবন যাপনের উপযোগী করিয়া ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করে।

যশোদা বড়ই মমতা বোধ করিয়াছিল। এদিক দিয়া কুলি-মজুরেরাও ভাল। আধমরা পশুর মতো জীবন হোক, ছেলেমেয়েগুলি তাদের আধ-মরা পশুর মতো জীবন যাপনের জন্যই জন্ম হইতে তৈরি হয়।

সুকুমার উকিলের স্ত্রী বনলতাও ফর্সা এবং মোটা। সর্বদা পান খায়। সুযোগ পাওয়া মাত্র রোয়াকে দাঁড়াইয়া মুখভরা পান চিবাইতে চিবাইতে চুপি চুপি সে যশোদাকে বলে, 'চার টাকা না চারশো টাকা! যা মুখে আসে বললেই হল। পসার তো ভারি, সারাদিন হাঁ করে বসে থাকে রুগীর জন্য, একটা টাকা দিলেই ছুটে আসবে। চারটাকা কোথায় আদায় করে জানো চাঁদের-মা? অন্য ডাক্তার ডাকবার সময় নেই, এদিকে রুগীর যায় যায় অবস্থা, তখন। আবার বলে আট টাকা করবে!

এমন হাসি পায় মাগীর কথা শুনলে।'

হাসিবার জন্যই বোধ হয় যশোদার ঝকঝকে উঠানের একটা কোণ পিক ফেলিয়া ভাসাইয়া দেয়। তিন চার দিন আগে অতসী তার ডাক্তার স্বামীর ফির সম্পর্কে কথা বলিয়াছিল, যশোদার কাছে সে কথার ফাঁকি ধরাইয়া দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত বনলতা সযত্নে কথাগুলি মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছে। এমনি চুপি চুপি আরও কত জনকে বলিয়াছে কে জানে, হয়তো আরও সপ্তাহখানেক ধরিয়া বলিয়াই চলিবে।

যেখানে সেখানে পানের পিক ফেলার স্বভাবের জন্য একটা কড়া কথা বলিতে গিয়া যশোদা চুপ করিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, বনলতার মাথাটা যেন একটু খারাপ। বাড়িতে যারা আসিতেছে তাদের সকলের মানসিক অবস্থাই কমবেশী অস্বাভাবিক, কিন্তু বনলতার মন যেন স্বাভাবিকতার স্তর পার হইয়া একটু বেশী রকম আগাইয়া গিয়াছে।

অতসীর সঙ্গে বনলতার খুব ভাব, তাস খেলার লড়াই-এ প্রায় রোজই তারা দু'জনে মিলিয়া একটি পক্ষ গঠন করে। বনলতা কথা বলে না অনুরূপার সঙ্গে। অনুরূপা প্রফেসর সুনীল সেনের স্ত্রী। মানুষটা একটু হাবাগোবা ধরনের, বড়ই নিরীহ। যে যা বলে তাই সে মানিয়া নেয়, কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। এরকম গোবেচারা মানুষের সঙ্গে বনলতার কথা বন্ধ করার কারণটা যশোদা কোনো মতেই ভাবিয়া পায় না।

এরকম খাপছাড়া যুক্তিহীন ব্যাপারে যশোদাকে পীড়া দেয়। কতকটা নিজের বিরক্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সে ভাবে, কারণ যাই থাক, দু'জনের মধ্যে ভাব করাইয়া দিলে দোষ কি ?

জিজ্ঞাসা করিতে বনলতা বলে, 'কথা বলব না কেন, বলি তো ?'

যশোদা বুঝিতে পারে অনুরূপার সঙ্গে সে যে কথা বলে না তাও বনলতা স্বীকার করবে না, কথাও বলিবে না। এ চাল যশোদা জানে, তাই বনলতার সঙ্গে সময় নষ্ট না করিয়া সে ধীরে ধীরে অনুরূপার পাশে গিয়া বসে, বনলতা পিক ফেলিতে উঠিয়া গেলে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'সেন গিন্নির সঙ্গে বুঝি আপনার বনে না ?'

অনুরূপা অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে বলে, 'বনবে না কেন, তবে কি

জানেন—'

সুব্রতার ঘরে তখন মধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ হইয়াছে। অনুরূপার মেয়ে অলকা চমৎকার গান গায়। বড় রাস্তার কাছাকাছি সামনে ছোট বাগানওয়ালা দোতলা বাড়িটিতে তারা উঠিয়া আসিয়াছে বছরখানেক আগে এবং আসিয়াই অলকা পাড়ার গায়িকাদের খ্যাতি ম্লান করিয়া দিয়াছে।

'আপনার মেয়ে বড় সুন্দর গান গায়' অনুরূপাকে এই কথা বলিবার জন্য যশোদা মুখ খুলিয়াছে, পিক ফেলিয়া আসিয়া পানের পিকের মতোই মুখ লাল করিয়া বনলতা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলে, 'ওই রে, ছুঁড়ি আবার গান ধরেছে! শুনছেন? ফের প্যানপ্যানানি শুরু করেছে।'

অবিনাশ চাটুয্যের বৌ প্রভা মিনতি করিয়া বলে, 'আহা, একটু শুনতে দিন না?'

বনলতা যেন ক্ষেপিয়া যায়।—'কি শুনবে ভাই? ওকি গান নাকি? মিনমিন ক'রে কাঁদলেই যদি গান হ'ত—'

ইনস্যুরেন্স এজেন্ট জগদীশের দ্বিতীয়পক্ষের বৌ অমলা হঠাৎ বলিয়া বসে, 'খুকুর চেয়ে তো ভাল গায়।'

বনলতা ধপাস করিয়া বসিয়া পড়ে।—'খুকুর চেয়ে ভাল গায়? এত বড় বড় ওস্তাদ রেখে খুকুকে গান শেখালাম, খুকুর চেয়ে ভাল গায়?'

বনলতা হাউহাউ ক'রে কাঁদিতে আরম্ভ করে। কাঁদিতে কাঁদিতে মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়।

অতসী তীব্র ভর্ৎসনার সুরে অমলাকে বলে, 'ওর পেছনে লাগবার কি দরকার ছিল আপনার?'

এই সব গোলমালের মধ্যে ও-ঘরে গান বন্ধ হইয়া যায় এবং যশোদা এক গেলাস জল আনিয়া বনলতার তালুতে একটু একটু করিয়া থাপড়াইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বনলতা শান্ত হইয়া উঠিয়া বসে।

যশোদা জানে এ শুধু ঈর্ষা আর অহঙ্কারের ব্যাপার নয়, নিজের মেয়ের, চেয়ে অন্য একজনের মেয়ে ভাল গান গায় বলিয়া সুস্থ মানুষ এরকম করে না। ভিতরে বিকার আছে আর সেই বিকার এই রকম খাপছাড়া

উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

এ ধরনের বিকার শুধু এদের মধ্যেই দেখা যায়, কুলি-মজুরদের বৌ-রা এ হিষ্টিরিয়ার ধার ধারে না। অভাবের চাপে আর ঝাঁঝালো নিষ্ঠুর বাস্তবতার তাপে তারা শুকাইয়া যায়, এদের মতো পচিতে শুরু করে না।

যশোদার চিন্তিতভাবকে সুব্রতার মনে হয় গাম্ভীর্য। সন্ধ্যার পর মন খারাপ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করে, 'কি ভাবছ দিদি ?'

যশোদা প্রথমে বলে, 'ভাবছি ? কই, কিছুই তো ভাবছি না ভাই ?' তারপর বলে, 'ও, হ্যাঁ, একটা কথা ভাবছি। মেয়েদের গান শেখাবার ইস্কুলের মতো করলে হয় না একটা ? ঘরোয়া ইস্কুলের মতো, মাইনে-টাইনের দরকার নেই, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়েরা এসে গান শিখে যাবে। যন্ত্রপাতি কিনবার যদি দরকার হয় তখন বরং সকলের কাছ থেকে চাঁদার মতো কিছু কিছু নিলেই হবে। কি বল ?'

প্রস্তাবটি শুনিয়াই সুব্রতা খুশি হইয়া ওঠে, 'নিশ্চয়, ঠিক। আমিও ভাবছিলাম ওই রকম কিছু করতে হবে। বসে বসে শুধু গল্প করলে চলবে কেন ?'

'তুমি, অলকা, আর খুকু গান শেখাবে ; 'অলকা আর খুকু ?' সুব্রতার মুখে দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, 'তবেই তো মুশকিল !'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'সে আমি ঠিক করে দেব।'

প্রথমে যশোদা গেল প্রফেসর সুনীল সেনের বাড়ি। অনুরূপা তার সব কথাতেই সায় দিয়া গেল, সব প্রস্তাবেই রাজী হইয়া গেল। কেবল অলকা একটু মুখ ভার করিয়া বলিল, 'খুকু আর আমি ? ও মেয়েটা বড় হিংসুটে।'

কিন্তু যশোদার কাছে এতটুকু মেয়ে কেন মুখ ভার করিয়া থাকিতে পারিবে, বিশেষত নিজের তাগিদে একটা করার ভার গ্রহণ করিয়া হঠাৎ যখন যশোদার শরীর মন হাল্কা মনে হইতে আরম্ভ করিয়াছে ? অলকাকে জয় করিতে তার কয়েক মিনিট সময় মোটে লাগে। খুকু তো ঠিক হিংসুটে নয়, বোকা। তাছাড়া, অলকার গান শুনিয়া গান জানা কোন্ মেয়ের

না হিংসা হয় ?

'খুকুকে না ডাকলেও তো চলবে না দিদি ! সারেগামা শেখানো, গলা সাধানো, সোজা গান শেখানো এসব তো একজনের করা চাই ? এমন গান করো তুমি, তোমায় কি এসবের জন্য বলতে পারি ? তোমার সময়ই বা কই ? মাঝে মাঝে তুমি গিয়ে দু'একখানা ভাল গান শেখাবে, বাস—!'

তেল মাখাইতেও যশোদা কম পটু নয়, গর্বে আর আনন্দে অলকার মুখখানা তেল মাখানো মুখের মতই চকচক করিতে থাকে।

তখন যশোদা যায় বনলতার বাড়ি, মা ও মেয়েকে বুঝাইয়া বলে,—আসলে খুকুই আমাদের গান শেখাবে, সব ভার থাকবে খুকুর ওপরে অলকা মাঝে মাঝে আসে তো আসবে, দু'একখানা গান শিখিয়ে যাবে। মিহি গলা থাকলেই তো গান শেখানো যায় না, গান শেখাতে হলে সুর তাল শেখাতে হয়, নয় দিদি ?'

খুকু গদ্‌গদ ভাবে বলে, 'আরও কত কি আছে—গান শেখা কি সহজ !'

একটি হারমোনিয়াম, একটি এস্রাজ আর পাঁচ ছ'টি ছাত্র নিয়া যশোদার ঘরোয়া সংগীত বিদ্যালয় আরম্ভ হয়। সকলের যে খুব বেশী উৎসাহ জাগিয়াছে তা নয় সকলে ভাবিতেছে, যশোদার মতলবটা কি ? কিন্তু যশোদা জানে বিনা পয়সায় মেয়েদের গান শেখানোর সুযোগ কেউ ছাড়িবে না, মেয়েদের গান বাজনার চর্চা যারা পছন্দ করে না তারাও নয়। দু'চার দিনের মধ্যে ছোট বড় মেয়ের ভিড়ে তার ঘর ভরিয়া উঠিবে। এই তো সবে শুরু।

সকলেই আজ এক ঘরে। অন্য সকলে এলোমেলো ভাবে যে যেখানে পারে বসিয়াছে, একটি আস্ত পাটি কেবল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে গানের শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীদের। হারমোনিয়ামের একদিকে বসিয়াছে ছাত্রীরা, অন্যদিকে পরস্পরের যতটা পারে তফাতে সরিয়া বসিয়াছে অলকা আর খুকু। কিন্তু এত কাছে বসিয়া, একই কাজ করিতে বসিয়া, পরামর্শ না করিয়া চুপচাপ শুধু বসিয়া থ কিলে চলিবে কেন ? বিশেষত সকলে যখন কি ভাবে গান শেখানো আরম্ভ হয় দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তারা যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না, তাদের মায়েরাও

বলে না, এটা তাই তখনকার মতো তাদের ভুলিয়া যাইতে হয়।

প্রথমে অলকা বলে, 'কি শেখানো যায়? গান?'

তখন খুকু বলে, 'গলা কি করে সাধতে হয় শেখালে হত না?'

অলকা বলে, 'গলা তো সাধবেই, একটা সোজাসুজি গান দিয়ে আরম্ভ করলে বোধ হয় ভাল হয়।'

খুকু বলে, 'একেবারে গান দিয়ে আরম্ভ করলে—'

পরামর্শের সুবিধার জন্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তারা পরস্পরের একটু কাছে সরিয়া আসে।

ছয় সাতটি নানা পর্দায় গলার বেমিল, বেসুরো, হঠাৎ-জাগা, হঠাৎ-থামা আওয়াজে ঘরটা গম্‌গম্ করিতে থাকিলে যশোদা বনলতা আর অনুরূপার মুখের দিকে তাকায়। এই দু'টি জননীর মধ্যে ভাব জমানোর যে তুচ্ছ খেয়াল হইতে এই সুরচর্চার উৎপত্তি হইয়াছে, যশোদা তা ভোলে নাই। সুরচর্চা অবশ্য যশোদা আর থামিতে দিবে না, আরও ব্যাপক ও শৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাবে চর্চা করাইবে, কিন্তু ওদের দু'জনের ভাব হওয়াটা তো দরকার?

হঠাৎ যশোদা উঠিয়া যায়, ঘরের এক প্রান্ত হইতে হাত ধরিয়া অনুরূপাকে অন্যপ্রান্তে বনলতার কাছে টানিয়া আনে, বনলতার পাশে তাকে বসাইয়া দু'জনের হাতে হাত মিলাইয়া দিয়া আবেগ কম্পিত গলায় বলে, 'আপনাদের দু'টি মেয়েই রত্ন। ওদের জন্যই আমার সাধ মিটল। ওরা যদি আমার মেয়ে হত!'

বনলতা প্রায় কাঁদিয়া ফেলে।—'কত ওস্তাদ রেখে কত চেষ্টায় মেয়েকে আমি গান শিখিয়েছি!'

অনুরূপা বলে, 'আপনার মেয়ে সত্যি শেখার মতো করেই শিখেছে।'

বনলতা কাঁদিয়া ফেলে। 'ওর গলাটা যদি তোমার মেয়ের মতো মিষ্টি হ'ত ভাই।'

তিন মাসের মধ্যে পথের ওদিকে এ-বাড়ির মুখোমুখি যশোদার অন্য বাড়িতে একটি রীতিমতো সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গেল। বাড়ির সামনে ছোট একটি কাঠের ফলকে নামটা লিখিয়া টাঙাইয়া দেওয়াও

হইল। বাড়িটি যশোদা কোনোদিন আর ভাড়া দিবে না ঠিক করিয়াছিল। তবে ভাড়া দেওয়া আর কাজে লাগানোর মধ্যে তফাত আছে।

বনলতা একদিন চুপি চুপি যশোদাকে বলে, 'স্কুল তো দিব্যি চলছে চাঁদের-মা। খুকু তো প্রাণ দিয়ে খাটছে তোমার স্কুলের জন্য, এবার ওর জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দাও?' বনলতা পান চিবাইতে চিবাইতে হাসে, 'মাইনের কথা বলছি না, অত খাটছে মেয়েটা, হাতখরচ বাবদ কিছু'— তারপর হঠাৎ হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলে, 'ওস্তাদ রেখে গান শেখাতে জলের মতো টাকা ঢেলেছি কিনা, তাই বলছি।'

তবু যশোদা ভুল করে না যে বনলতার মাথা আসলে সকলের চেয়ে বেশী খারাপ নয়।

৫

ছেলে বা জামাই কেউ সত্যপ্রিয়র মনের মতো নয়। আত্মীয়-পরিজন কেউ যে তার মনের মতো তাও অবশ্য নয়, তবু সেটা কোনোরকমে সহ্য হইয়া যায়। বড় ছেলে আর বড় মেয়ের জামাই যে তার অপদার্থ এই আপসোস মাঝে মাঝে মানুষকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলে। সকলকে বড় বড় উপদেশ দেয়, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার মারাত্মক ক্রটি আবিষ্কার করিয়া সকলকে জানাইয়া দেয়, মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সহজ সরল পথ কি তাই নিয়া গবেষণা করে, আর তার ছেলে আর জামাই এমন। না জানি লোকে কি ভাবে? না জানি তার সব অকাট্য যুক্তিগুলিকে সকলে তার ছেলে আর জামাইয়ের কথা ভাবিয়া অনায়াসে কাটিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া দেয় কিনা?

মেয়েটি সত্যপ্রিয়র খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু অনেক খুঁজিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া জামাই আনা হইয়াছে রূপবান। কি রঙ্ জামাইয়ের! যেন সোনার ওজনে সোনার পুতুলই সত্যপ্রিয় কিনিয়া আনিয়াছে মেয়ের জন্য।

একজন আত্মীয়, যে কখনো সত্যপ্রিয়র কাছে টাকা প্রত্যাশা করে না,

সত্যপ্রিয় যাচিয়া দিতে গেলেও বোধ হয় যে বিশেষ দরকারের সময়ও তার টাকা নিবে না, সম্বন্ধ ঠিক করার সময় সে একবার বলিয়াছিল, 'আরেকটু চলনসই পাত্র আনলে হ'ত না ?'

সত্যপ্রিয় মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল, 'কেন ?'

'কি জান, তোমার মেয়েকে যদি ছেলেটির পছন্দ না হয় ? নিজের চেহারার জন্যেই এ সমস্ত ছেলের মাথা গরম হয়ে থাকে, টাকার লোভে যদি বা বিয়ে করে, খুব সুন্দরী মেয়ে না পেলে নিজের সঙ্গে মানায় নি ভেবে মনটা হয়তো খুঁতখুঁত করবে।'

'সবাই কি তোমার মতো ভাবপ্রবণ ভাই!'

'তা মানুষ একটু ভাবপ্রবণ বৈ কি। টাকা দিয়ে গরীবের ছেলে কিনছ, ছেলে তোমাদের সকলের অনুগত হয়ে থাকবে বটে, কিন্তু তাতে কি ছেলে আর মেয়ের মনের মিল হবে ? আর মনের মিল যদি না হ'ল—'

কিন্তু সত্যপ্রিয় বুঝিতে পারে নাই। সে যাকে কিনিয়া আনিতেছে, বাড়িতে রাখিতেছে, জীবিকার উপায় করিয়া দিতেছে, তার মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়ার মতো স্পর্ধা কখনও তার হইতে পারে! বিবাহের এক বছরের মধ্যে মেয়ের মুখের হাসি নিভিয়া যাইতে দেখিয়া তাই সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। তারপর তার চোখের সামনে চিরস্থায়ী বিষাদ মেয়ের মুখকে আশ্রয় করিয়াছে, কেমন যেন উদাস উদাস চাহনি হইয়াছে মেয়ের।

অথচ যামিনীর স্বভাব খুব নম্র, তার মতো শান্তশিষ্ট নিরীহ গোবেচারী জামাই পাওয়াই কঠিন। সত্যপ্রিয়র সঙ্গে কখনো মুখ তুলিয়া কথা বলে না। বাড়ির কারো সঙ্গে কখনো তর্ক করে না। বৌ-এর সঙ্গে একটা দিনের জন্যও কোনোদিন সে কলহ করিয়াছে বলিয়া কেউ শোনে নাই। চরিত্রও তার খারাপ নয়, হঠাৎ বড় লোকের জামাই হইয়া হাতে অনেক টাকা পাইয়াও বাহিরে স্ফূর্তি করার দিকে তার এতটুকু টান দেখা যায় না।

তবে ? যোগমায়া মাঝে মাঝে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে কেন ?

নিরুপায় আপসোসে সত্যপ্রিয়ের হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা করে।

কিছুই করিবার নাই, কিছুই বলিবার নাই। যামিনী যদি মেয়েকে তার মারিত, মদ খাইয়া মাতলামি করিত, কিংবা অন্য কোনো স্পষ্ট অপরাধে মেয়ের চোখের জল আনিত, সে তাকে উপদেশ দিতে পারিত, শাসন করিতে পারিত, চাপ দিয়া সিধা করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু এখানে যে কোনো প্যাঁচ পর্যন্ত খাটানোর উপায় নাই! যামিনীর হাতখরচের টাকাটা কোনো ছুতায় বন্ধ করিয়া দিলে কি কিছু লাভ হইবে? মেয়ের মনে বরং তাতে কষ্ট হইবে আরও বেশী।

তা ছাড়া সমস্যা তো ওরকম নয়। যে উদ্ধত নয় তাকে নরম করা চলিবে কেমন করিয়া?

একদিন যামিনীর একটু জ্বর হইয়াছে, সামান্য সর্দিজ্বর, ব্যস্ত হওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু সত্যপ্রিয় যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ব্যাকুল হওয়াটাই সত্যপ্রিয়র পক্ষে খাপছাড়া ব্যাপার, এমন সামান্য ব্যাপারে, তাকে ব্যাকুল হইতে দেখিয়া যামিনীও ভয় পাইয়া গেল যে, অসুখটা বুঝি তার ভয়ানক কিছুই হইয়াছে।

নিজে মোটরে করিয়া সত্যপ্রিয় যামিনীকে ডাক্তারের কাছে নিয়া গেল। ফোনটা তুলিয়া নিয়া একটা করিয়া হুকুম দিলে যার বাড়িতে ডাক্তারের ভিড় জমিয়া যাওয়ার কথা, জামাইকে দেখানোর জন্য সে নিজে ডাক্তারের বাড়ি যাইবে, এ ব্যাপারটা সকলের বড়ই অসাধারণ মনে হইল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সকলে ঠিক করিল, হয়তো যামিনীর এমন কোনো অসুখ হইয়াছে যা পরীক্ষা করিতে বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতি লাগে, যে সব যন্ত্রপাতি নিয়া ডাক্তারের বাড়িতে আসিবার উপায় নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয় নিজে গেল কেন? যদি বা গেল, কাউকে সঙ্গে নিল না কেন? এভাবে সে তো কখনো কোথাও যায় না!

ডাক্তারের বাড়ি দেখিয়া যামিনী অবাক। মারাত্মক রোগ হইয়াছে তার, মস্ত এক ডাক্তারের বাড়িতে তাকে নিয়ে যাওয়া হইতেছে, এই ভাবনায় মুখখানা যামিনীর সর্দিজ্বরের টস্‌টসে ভাবের মধ্যেও শুকনো দেখাইতেছিল। কিন্তু বড় ডাক্তার কি গলির মধ্যে এমন একটা ছোট রঙ্‌-চটা বাড়িতে থাকে, এমন চেহারা হয় তার বসিবার ঘরের? পুরানো একটা

ওষুধের আলমারি, কয়েকখানা কাঠের চেয়ার আর একটা ময়লা কাপড়-ঢাকা কাঠের টেবিল, তাতে পাঁচ ছ'খানা ডাক্তারি বই। ঘরের মাঝখানে সবুজ রঙ-করা চটের পার্টিশন দেওয়া, তার ওপাশে বোধ হয় রোগীকে পরীক্ষা করা হয়।

ডাক্তার সম্ভবত প্রতীক্ষা করিতেছিল, সতপ্রিয়কে দেখিয়া খুব বেশী বিস্মিত হইল না। কেবল মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, 'আসুন, আসুন, বসুন!'

একজন মাত্র রোগী বসিয়াছিল, পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের বয়সের একটি যুবক। চেহারাটি শীর্ণকায়, চোখের নিচে কালিপড়া, মুখখানা তেলতেলা। তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য ডাক্তার বলিল, 'আচ্ছা, আপনি দিন সাতেক পরে আবার আসবেন। যা-যা বললাম করবেন আর ওষুধ দু'টো নিয়ম মতো খাবেন।'

'রাত্রে ঘুম হবে তো ডাক্তারবাবু?'

যুবকটির গলা খুব মোটা আর কর্কশ কিন্তু কি যে গভীর হতাশা তার প্রশ্ন আর প্রশ্নের ভঙ্গিতে! রাত্রির ঘুমের কথা ভাবিয়া, এখন, এই সকালবেলাই, সে যেন আতঙ্কে আধমরা হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বলিল, 'হবে। শোবার আগে যে ওষুধটা দিয়েছি, ওটাতেই ঘুম হবে। ঘুম যদি না হয় কাল সকালে একবার আসবেন।'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তোমার রাত্রে ঘুম হয় না?'

অপরিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ছেলেটি এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিল যেন স্নায়ুর কেন্দ্রে ঘা লাগিয়াছে, চোখের পলকে মুখখানা তার ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সত্যপ্রিয়র মুখের দিকে একনজর তাকাইয়াই চোখ নিচু করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সত্যপ্রিয় প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ছেলেবেলা থেকে ব্রহ্মচর্যের অভাব ঘটলে তো এরকম হবেই। কত ছেলে যে এমনি ক'রে আত্মহত্যা করছে! তাদেরি বা দোষ কি, সব শিক্ষার দোষ। মা বাপ যদি না খেয়াল রাখে, তারা ছেলেমানুষ, তাদের কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে যে ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেদের সামলে চলবে! কি বলেন ডাক্তারবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈ কি।'

ছেলেটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আজ আসি ডাক্তারবাবু।' বুঝা গেল পালানোর জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'বোসো একটু, তোমার ঘুমের জন্য একটা কথা বলে দিই। ওষুধের চেয়ে এতে তোমার বেশী কাজ হবে। শোয়ার আগে এক কাজ করবে, মেঝেতে জোড়াসন হয়ে মেরুদণ্ড সিধা ক'রে বসবে। এই-খানে তোমার নাভিপদ্ম আছে জানো বোধ হয়? এখানে বাঁ হাত দিয়ে এই ভাবে আস্তে স্পর্শ ক'রে থাকবে—আঙুলগুলি যেন সোজা থাকে আর পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে, বুঝলে? ডান হাতটি এই ভাবে মাথার তালুতে রাখবে। তারপর চোখ বন্ধ ক'রে ভাববে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত জীবিত প্রাণী আছে সব ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে নিও, কেউ যেন ঘরে না আসে। আর—'

ছেলেটি কাতরভাবে বলিল, 'আজ্ঞে, আমার ঘরে আমার চারটি ভাই-বোন শোয়, আমার বাপ-মাও ও-ঘরে থাকেন। ঘরে সব সময় লোক থাকে।'

'অন্য ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা ক'রে নিও।'

'আরেকটা ঘরে দাদা-বৌদি শোয়। আর ঘর নেই আমাদের।'

ছেলেটি আর দাঁড়াইল না, একরকম পলাইয়া গেল। এই অবহেলাতেই সত্যপ্রিয় জ্বালা বোধ করে সব চেয়ে বেশী। কেউ শুনিতে চায় না, তার এত দামী দামী কথাগুলি সাধ করিয়া কেউ ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে চায় না। না শুনিয়া যাদের উপায় নাই, শুধু তারা শোনে, অন্য সকলে পালা-নোর জন্য ছটফট করে। এত হাল্কা মানুষের মন? ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'এই সব অপদার্থ ছেলের জন্যই দেশটা রসাতলে গেল।'

ডাক্তার সায় দিয়া বলিল, 'নিশ্চয়। ওদের কথা আর বলবেন না।'

তারপর পরীক্ষা হইল যামিনীর। তাকে সঙ্গে করিয়া চটের পার্টিশনের ওপাশে গিয়া মিনিট পনেরো পরে আবার ডাক্তার ফিরিয়া আসিল। যামিনীর সুন্দর মুখখানা তখন টুকটুকে লাল হইয়া গিয়াছে। এদিকে

আসিয়া সে ঘাড় নীচু করিয়া সত্যপ্রিয়র পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।
সত্যপ্রিয় বলিল, 'তুমি গাড়িতে গিয়ে বোসো যামিনী। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে আসছি।'
যামিনীকে পরীক্ষা করিল অজানা অচেনা গরীব এক ডাক্তার কিন্তু চিকিৎসা আরম্ভ করিল সত্যপ্রিয়র পরিচিত মস্ত নাম-করা কবিরাজ। যামিনীর জন্য নানা অনুপানের সঙ্গে পাথরের খলে কবিরাজী বড়ি পেষণ করা হইতে লাগিল, অনেকরকম সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা হইল।
ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা সত্যপ্রিয় সমস্তই মানিয়া নিল, কিন্তু একটা বিষয়ে কবিরাজের সঙ্গে তার মতের মিল হইল না। চিকিৎসার সময়টা যোগমায়াকে আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে কবিরাজ ঘাড় নাড়িল।
'ভালর চেয়ে তাতে মন্দই বেশী হবে মনে হয়।'
কিন্তু চিকিৎসকেরও সব কথা স্বীকার করা সত্যপ্রিয়র পক্ষে অসম্ভব, এ-যুগের চিকিৎসকেরা কি জানে? জানিলেও সত্যপ্রিয়র চেয়ে তো বেশী জানে না!
'ব্রহ্মচর্য পালন না করলে শুধু ওষুধ আর পথ্যে কি ফল হবে কব্‌রেজমশায়?'
কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'স্বামী-স্ত্রীকে গায়ের জোরে তফাত করলেই কি ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা হয়ে যায়? ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে না দিলে ফলটা খারাপ হবে।'
ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কবিরাজ একটু ভাবিল, তারপর বলিল, 'তা ছাড়া, আমার মনে হয় সবটাই আপনার অনুমান, আপনার জামায়ের কোনো চিকিৎসার দরকার ছিল না। শ্রীমানের স্বাস্থ্য তো এমন-কিছু খারাপ নয়! ওর মানসিক স্বাস্থ্যই বরং একটু খারাপ যাচ্ছে!'
'তা বলতে কি বুঝাচ্ছেন?'
'বুঝাচ্ছি যে শ্রীমানের মনটা একটু বিকারগ্রস্ত, কোনো আঘাতটাঘাত পেয়েছে মনে কিংবা অনেকদিনথেকে কোনো দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে আসছে।

ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা না ক'রে খুব হৈ-চৈ ফুর্তি ক'রে দিন কাটাবার ব্যবস্থা করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।'

'হৈ-চৈ ফুর্তিটা কি রকম?'

'এই মনের আনন্দে থাকা আর কি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হাসিতামাশা করা, খেলাধূলা ভাল লাগলে তাই করা, দেশটেশ বেড়ানো, ভাল লাগলে শিকার-টিকারে যাওয়া—কি জানেন, সবাইকার তো এক জিনিস পছন্দ নয়, যার যেদিকে মন যায়। একেবারে মদটদ খেয়ে গোল্লায় যাবার ব্যাপার যদি না হয়, বেশী বাঁধাবাঁধির চেয়ে অল্পবিস্তর অসংযমও ভাল। শ্রীমান বড় বেশী ভয়ে-ভাবনায় দিন কাটায়—'

'কিসের ভয় ভাবনা?'

সত্যপ্রিয়র মুখ দেখিয়া কবিরাজ কথার মোড় ঘুরাইয়া নিল। যে চিকিৎসা চায় উপদেশ চায় না, তাকে যাচিয়া উপদেশ দিয়া লাভ কি!

কবিরাজের সঙ্গে আলোচনার কয়েকদিন পরেই সত্যপ্রিয়র মেয়েকে দেশে পাঠানোর আয়োজন করে। দেশের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আছে। সত্যপ্রিয়র এক পিসতুতো বোন স্বামীপুত্র নিয়া অনেকদিন হইতে এখানে আছে, হঠাৎ তার দেশে গিয়া বাস করার শখ চাপিল। সত্যপ্রিয়র ইঙ্গিতে অনেকের মনে অনেকরকম শখই জাগিয়া থাকে। ঠিক হয়, যোগমায়াও এদের সঙ্গে যাইবে।

প্রথমে যোগমায়া কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়, তারপর যখন বুঝিতে পারে তাকে দেশে পাঠানোর ইচ্ছাটা সত্যপ্রিয়র, তখন সে মুখ ভার করিয়া বলে, 'না বাবা, আমি এখন কোথাও যাব না।'

সত্যপ্রিয় বলে, 'ক'দিন বেড়িয়ে আয়। বিয়ের পর দেশের সবাই তোকে দেখতে চাচ্ছে।'

শুনিয়া যোগমায়া আর আপত্তি করে না। মেয়ে-জামাইকে দেশে আত্মীয়-স্বজনকে দেখাইবার ইচ্ছা যদি সত্যপ্রিয়র হইয়া থাকে সে তো ভাল কথা। স্বামীর সঙ্গে সর্বত্র যাইতেই সে রাজী আছে।

'দুশো টাকা দেবে বাবা আমায়?'

'বিয়ের পর তুই যে হরদম টাকা নিচ্ছিস্।—কি করবি টাকা দিয়ে?'

'নতুন রকম একটা গয়না কিনব! আজকেই দাও বাবা—আজকেই কিনব।'

বিবাহের পর বাপের ভয়টা যেন যোগমায়ার একটু কমিয়াছে--সব মেয়েরই কমে। বিবাহের পর খুব কড়া মেজাজের বাপও মেয়ের সঙ্গে একটু খুশি মেজাজেই মেলামেশা করে, মেয়েকে কিছু স্বাধীনতা দেয়। বাপ ও মেয়ের মধ্যে অতিরিক্ত একটা সম্পর্ক যেন কোথা হইতে কি ভাবে গড়িয়া উঠে।

কিন্তু যোগমায়া যখন টের পায় তাকে একাই যাইতে হইবে, যামিনীর সঙ্গে যাইবে না, তখন সে হঠাৎ বাঁকিয়া বসে। না তার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না, সে যাইবে না। শরীরটা ভাল নয় তার। কি হইয়াছে? এই গা ম্যাজ-ম্যাজ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, আরও অনেক কিছু হইয়াছে।

সন্তানের এ রকম মুখোমুখি অবাধ্যতার অভিজ্ঞতা সত্যপ্রিয়র জীবনে এই প্রথম। প্রথমটা সে কেমন থতমত খাইয়া যায়। তারপর ক্রোধে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।

পিসতুতো বোন বলে, 'কি করব দাদা, যাব! মায়া তো কিছুতে যেতে রাজি নয়। যামিনীর এমন অসুখের সময় ওকে ফেলে কোথাও যেতে চায় না।'

'তোমাদের সকলের মাথায় গোবর ভরা।'

নিজের দোষটা বুঝতে না পারলেও পিসতুতো বোন মন্তব্যটায় সায় দিয়া চুপ করিয়া থাকে।

দিন তিনেক পরে সত্যপ্রিয় জামাইকে তার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলে, 'যামিনী।'

যামিনী বলে, 'আজ্ঞে?'

'তোমার ভালর জন্যেই বলা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জীবনে উন্নতি করতে হলে অভিজ্ঞতা চাই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমাদের দিল্লী ব্রাঞ্চের সাব-ম্যানেজার ক'মাসের ছুটি নিয়েছে। তার জায়গায় তুমি গিয়ে কাজ ক'রে আসতে পারবে না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব বৈ কি।'

ক্রুদ্ধ আহত মনে যামিনীর বিনয়ে একটু শান্তি বোধ হয়। নিজের মেয়ের চেয়ে পরের ছেলেই ভাল। শ্বেতপাথরের মেঝেতেই দু'জনে বসিয়াছিল, যামিনী ঘাড় নিচু করিয়া উসখুস্ করিতে থাকে। কি যেন বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না।

'কবে যেতে হবে ?'

'কালকেই রওনা হয়ে যাও। নিয়মিত ওষুধপত্র খেয়ো। কব্‌রেজ মশায়কে বলে দেব, ডাকে ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন। আর সকাল-সন্ধ্যায় একটু যে যোগাভ্যাস শিখিয়ে দিয়েছি—'

'আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।'

সত্যপ্রিয় হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। কতগুলি বিষয়ে বুদ্ধিটা খুবই ধারালো, হঠাৎ তার মনে হয় জামাইয়ের সম্বন্ধে একটা নূতন তথ্য যেন আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে।

'কত টাকা ?'

'পাঁচশো।'

খুব লজ্জার সঙ্গে ভয়ে-ভয়েই যামিনী টাকার আবেদন জানাইয়াছে, তবু সত্যপ্রিয়র মনে হয় মাঝে মাঝে দু'একজন তাকে ফাঁদে ফেলিয়া যেভাবে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে, যামিনীর টাকার দাবিটা যেন কতকটা সেই ধরনের। আপিসে নামমাত্র কাজের জন্য হাতখরচ বাবদ যামিনীকে মাসে দুশো টাকা দেওয়া হয়। খরচ তার কি যে দুশো টাকাতেও কুলায় না ? গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় একটু ভাবে, তারপর চেক বই বাহির করিয়া পাঁচশো টাকার একটা চেক লিখিয়া দেয়।

সারাটা দিন তার কেবলি মনে হইতে থাকে, চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি করিতে করিতে যেন দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতাভরা শান্তির শান্তভাব।

যামিনী দিল্লী রওনা হইয়া যায় আর অতদূরে অসুস্থ স্বামীকে কাজ

করিতে পাঠানোর জন্য বাপের ওপর রাগ করিয়া যোগমায়া বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দেয়। শুনিয়া সত্যপ্রিয় নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে সকলে কি অকৃতজ্ঞ! যার ভালর জন্য যা করি তাতেই তার রাগ হয়।

মাস দুই পরে পিসতুতো বোন একদিন সত্যপ্রিয়কে একটা খবর দেয়। শুনিয়া সত্যপ্রিয় কথাটা বিশ্বাস করতেই চায় না।

'কা'র ছেলে হবে?'

'মায়ার। এই চার মাস।'

সংবাদটা এমন খাপছাড়া মনে হয় যে সত্যপ্রিয় তবু বোকার মতো আবার জিজ্ঞাসা করে, 'ভুল হয় নি তো তোমাদের?'

দিল্লীর সাব-ম্যানেজার তিন মাসের ছুটি নিয়াছিল। যামিনী তিনমাস কাজ করিবার জন্য সেখানে গিয়াছে। দু'চারদিনের মধ্যেই তাকে সেখানে স্থায়ী করার নির্দেশপত্র পাঠানোর কথাটা সত্যপ্রিয় ভাবিতেছিল। এবার একেবারে চুপ করিয়া যায়। সহজে সত্যপ্রিয় লজ্জা পায় না, হঠাৎ যেন মেয়ের কাছে মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করিতে থাকে। কেবল মেয়ের কাছে নয়, আরো অনেকের কাছে। জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া সত্যপ্রিয় অনেক ব্যাপারে বাহাদুরী করিয়াছে, এমন অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে যে দিকে তার তাকানোই উচিত ছিল না, কিন্তু কারো কাছে কোনদিন এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে নাই। মনে মনে বরং নিজের সর্বব্যাপী প্রভুত্বে গর্বই অনুভব করিয়াছে। কিন্তু মেয়ে আর জামাইয়ের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়া এত বড় একটা ভুল করার জন্য সঙ্কোচ বোধ না করার ক্ষমতা সেও নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না।

ছি, কি কদর্য ভুল!

মাসখানেক পরে যামিনী ফিরিয়া আসিল। শোনা গেল, যোগমায়ার মুখে নাকি হাসি ফুটিয়াছে।

দিন পনের পরে একদিন সকালে যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সত্য-প্রিয়র কাছে শ'তিনেক টাকা চাহিল। তার বিশেষ দরকার।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোমায় পাঁচশো টাকা দিয়েছি যামিনী।'

সন্ধ্যার পর যোগমায়া আসিয়া আব্দার করিয়া বলিল, 'আমায় তিনশো টাকা দেবে বাবা?'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোকে দুশো টাকা দিয়েছি মায়া।'

পরদিন শোনা গেল, যোগমায়ার মুখ নাকি কালো হইয়া গিয়াছে। চোখ দেখিয়া বুঝা গেল, রাত্রে খুব কাঁদিয়াছে। ঘুম ভাঙার পর হইতে যামিনীর আপিস যাওয়া পর্যন্ত একবার ধারে-কাছেও ঘেঁষিল না দেখিয়া বুঝা গেল' দু'জনে ঝগড়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর মেয়েকে ডাকিয়া সত্যপ্রিয় তিনশো টাকার একখানা চেক তার হাতে দিল। যোগমায়া নীরবে চেক হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

আপিসে সেদিন একজন লোক সত্যপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। মহীতোষ তার কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার নিয়াছিল, যতদিন পারে অপেক্ষা করিয়া একেবারে শেষদিন লোকটি অগত্যা সত্যপ্রিয়র কাছে আসিয়াছে।

'কোটিপতি মানুষ আপনি, আপনার ছেলের নামে এ ক'টা টাকার জন্য নালিশ করব? আমি কি পাগল? আমি জানি আপনার কাছে এসে দাঁড়ালেই টাকা পাওয়া যাবে। দু'মাস অপেক্ষা করব তাতে আর কথা কি? তবে কি জানেন, হঠাৎ বড় দরকার পড়ে গেল টাকাটার—আজকের মধ্যে না পেলে নয়।'

পরদিন কোর্টে নালিশ রুজু না করিলে দেনাটা তামাদি হইয়া যাইবে। সত্যপ্রিয় নীরবে একটা চেক লিখিয়া দিয়াছিল।

অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া সত্যপ্রিয় ভাবিতে থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতির সমস্যার কথা নয়। অন্য কথা।

বুদ্ধিটা সত্যপ্রিয়র সত্যই তীক্ষ্ণ। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে মানুষের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুঝিবার কাজেই শুধু লাগে, মানুষ বুঝিতে চায় না। সত্যপ্রিয় জানে, একই মানুষের মধ্যে এরকম সমাবেশ ঘটে না, তবু সে আশা করে গরীব মা-বাপকে পাঠানোর জন্য জামাই তার যদিও বা যোগমায়াকে কষ্ট দিয়া তার কাছে টাকা আদায় করার উপায়টা অবলম্বন করিয়াছে, মানুষটা সে আসলে ভাল, মনটা তার কাছে নিশ্চয়

নরম, টাকার ব্যবস্থার জন্য ছাড়া অন্য কোনো কারণেই তার মেয়েকে হয়তো সে কষ্ট দেয় না। যামিনী যে বাপকে পাঠানোর জন্য টাকা আদায় করে সম্প্রতি এটা সত্যপ্রিয় টের পাইয়াছে।

টাকা আদায় করিবার উপায় থাকিলে তা সে স্ত্রীর উপর চাপ দিয়াই হোক আর যে ভাবেই হোক, টাকা আদায় করাকে সত্যপ্রিয় বিশেষ সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে করে না, খুব বেশী অন্যায় বলিয়াও গণ্য করে না। যত মানুষকে সে চেনে তারা সকলেই টাকা টাকা করিয়া পাগল। তাই নিয়ম সংসারে। কেবল নিজের মেয়ে জামাইয়ের ব্যাপার বলিয়াই তার একটু খারাপ লাগিতেছে।

নরনারী সম্পর্কে যে মনের মিল বলিয়া একটা খুব বড় রকমের ব্যাপার আছে, সোজাসুজি অবিচার অত্যাচার না করিয়া, এমন কি রীতিমতো ভাল ব্যবহার করিয়াও যে একজন আরেকজনকে অবহেলা করিতে পারে, মিষ্টি ভদ্রতার সম্পর্ক আর স্নেহ মমতার সম্পর্কের মধ্যে যে তফাত অনেক সত্যপ্রিয় তা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। পুরুষমানুষ যদি অকারণে মেয়েমানুষকে মারধোর গালাগালি না করে, তবে আর মেয়েমানুষের সুখের জন্য কি দরকার হইতে পারে সে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যোগমায়ার অসুখী মন আজকাল নানা দিক দিয়া নানাভাবে তাকে ক্রমাগত আঘাত করে। সাধারণ অবস্থায় হয়তো সে খেয়ালও করিত না, কিন্তু এদিকে এখন তার মন গিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা চাহিলে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না বরং না চাইলেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় এই সমস্যার মতো, কন্যার বিবাহিত জীবনটাও তার কাছে এখন একটা সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মেয়ে যে অসুখী হইয়াছে এর চেয়ে তার যেন বেশী যন্ত্রণা বোধ হয় এই ভাবিয়া যে সে মেয়েকে সুখী করিবার জন্য নিজে সে পাত্র ঠিক করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, অথচ মেয়ে সুখী হয় নাই।

ব্যবসার একটি সমস্যার মতো ব্যাপারটাকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে কয়েক দিনের মধ্যেই খুব ভাল একটি সমাধান আবিষ্কার করিয়া ফেলে। ব্যাপারটা তো মূলত এই। মেয়েকে সুখী করার ভার

সে জামাইয়ের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সেজন্য খরচ করিয়াছে অনেক টাকা। তার মেয়েকে সুখী করার দায়িত্বটা জামাইয়ের। জামাই যদি কাজটা না পারিয়া থাকে, তাকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার দায়িত্বটা সে পালন করিতে পারে নাই। সেই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, দায়িত্বটা ভালভাবে পালন না করিলে তার নিজের অবস্থাটাও সুবিধা দাঁড়াইবে না। অনেক কর্মচারী আর এজেন্টের ভোঁতা মাথায় এই জ্ঞান-টুকু ঢুকাইয়া দিয়া অনেক দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কাজ সে করাইয়া নিয়াছে।

এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মনে হয় নাই ভাবিয়া সত্যপ্রিয় একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। একদিন যামিনীকে ডাকিয়া বলে, 'বাবা, তোমার মনের অবস্থাটা বড় খারাপ দেখছি। তোমার মুখ দেখে যোগমায়ার মুখখানাও সব সময় শুকিয়ে থাকে। তা তুমি এক কাজ কর, ক'দিন বাপমা'র কাছ থেকে এসো গে। আজকেই চলে যাও, এইবেলা, এই-মাত্র—জিনিসপত্র থাক্।'

যামিনী আমতা-আমতা করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, 'আজ্ঞে, আমার মনের অবস্থা—'

'পথের খরচ বাবদ এই চার টাকা দিলাম—গাড়িভাড়া তিন টাকা চৌদ্দ পয়সা, নয়? মন সুস্থ না করে, মানে, মনের অবস্থা না বদ্‌লে এসো না।'

এক ঘণ্টার মধ্যে জামাই বিদায় হইয়া গেল।

জামাইকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ভাবিতে গেলে সকলের মাথা ঘুরিয়া যায়। তাও কি সম্ভব? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সকলে ভাবে, ভিতরে কিছু আছে। কোনো কাজে যামিনীকে পাঠানো হইয়াছে, কোনো উদ্দেশ্যে। সত্যপ্রিয়র অদ্ভুত কাজ আর উদ্দেশ্যের তো অন্ত নাই।

কিন্তু মজাটা কি? কি উদ্দেশ্য সত্যপ্রিয়র?

রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যামিনীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমায় কেন পাঠিয়ে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছ তো বাবাজি?'

'আজ্ঞে না, ঠিকমতো—

এত করিয়াও যদি না বুঝানো গিয়া থাকে তবে আর এ অপদার্থের কাছে কি আশা করা যায়! সত্যপ্রিয় বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়!

'বুঝতে পারলে লিখে জানিও। আমি সঙ্গে-সঙ্গে সব ব্যবস্থা করব ফিরে আসার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানাব বৈ কি, নিশ্চয়।'

যামিনী চলিয়া গেলে সত্যপ্রিয় ভাবে, মাসে মাসে এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া আর এমন আরাম ও উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইয়া নিয়া টাকা আর আরামের অভাবটাও যদি সেখানে তাকে আসল ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতে না পারে, তবে আর কিছু না বুঝাইলেও চলিবে।

তবু, কয়েকদিন পরেই সে যামিনীর কাছে একখানা পত্র পাঠাইয়া দেয়। জামাইয়ের কাছে একরকম কবিত্বপূর্ণপত্র লেখা সত্যপ্রিয়র মতো মানুষের পক্ষে শুধু নয়, অনেকের পক্ষেই উদ্ভট আর খাপছাড়া। সত্যপ্রিয়র পত্রের মর্ম এই যে, বিবাহের পর হইতে মেয়ের মুখ তার বিষণ্ণ, যাই হোক, এবার যামিনী ফিরিয়া আসিবার পর বোধ হয় তার মুখে হাসি ফুটিবে : অন্তত যামিনী যে হাসি ফুটাইবে তাতে সন্দেহ নাই।

৩

যশোদা ভাবিয়াছিল, শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝি চিরকালের জন্যই চুকিয়া গিয়াছে। বহুদিন নিজের বাড়ি দু'টিতে অনেকগুলি ওই শ্রেণীর নরনারীকে আশ্রয় দিয়া, দু'বেলা কুড়ি-বাইশ জনের জন্য ভাত রান্না করিয়া, এখানে-ওখানে দু'চারজনের কাজ জুটাইয়া দিয়া, বিপদে আপদে পরামর্শ দিয়া আর সাহায্য করিয়া তার মনে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, ঠিক ওভাবে ছাড়া এসব মানুষের সঙ্গে আর কোনোরকম সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না।

সম্পর্কটা গড়িয়া উঠিয়াছিল আপনা হইতে, স্বাভাবিক ভাবে। প্রথমে ওদের কেবল ভাড়াটে হিসাবে যশোদা বাড়িতে থাকিতে দিয়াছিল মাত্র, ওদের সুখ-দুঃখ ভালমন্দের ভাবনাটাও যে তাকে একদিন ভাবিতে হইবে সে তখন একথাটা কল্পনাও করিতে পারে নাই। চোখের সামনে এই শ্রেণীর জীবগুলির কয়েকজন প্রতিনিধির জীবন-যাপনের প্রক্রিয়া দেখিতে

দেখিতে যশোদা টের পাইয়াছিল, এরা সব বয়স্ক শিশুমাত্র, অভাবে আর চাপে খানিকটা বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটু একটু করিয়া তখন মায়া জাগিয়াছিল যশোদার মধ্যে। একটু একটু করিয়া তারপর সে জড়াইয়া গিয়াছিল ওদের জীবনের সঙ্গে। চাঁদের জন্য সব সময় যশো-দার মনটা তখন হু-হু করিত, এতগুলি বয়স্ক শিশুকে পাইয়া শোকটা তার কমিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ওরা তাকে ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়র কারসাজিতে আর তাকে ওরা বিশ্বাস করে না। তাকে শত্রু জানিয়া, তার সংস্পর্শে আসিলে বিপদ ঘটিবে জানিয়া, সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে। ওদের ভাল-বাসিবার ভান করিয়া সে উপরওয়ালাদের স্বার্থসাধনে সাহায্য করে, ওদের ন্যায্য দাবি ত্যাগ করায়, ধর্মঘট ভাঙিয়া দেয়, কাজ হইতে তাড়ায়। এতকাল পরে যশোদার সম্বন্ধে ওদের এই ধারণা জন্মিয়াছে।

অর্থহীন অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানুষ যশোদা নয়, কোনো ব্যাপারকে ব্যক্তিগত কল্পনার বাষ্পে সে ফাঁপাইয়া তোলে না। বাঁচিয়া থাকাটাই যাদের পক্ষে একটা বীভৎস সংগ্রাম, অত কৃতজ্ঞতার ধার ধারিলে কি তাদের চলে? কৃতজ্ঞতাও ওদের যথেষ্টই আছে। কাজ না থাকার সময় দুদিন যাকে যশোদা খাইতে দিয়াছে, কাজ পাওয়ার পরেও যশোদার একটি ধমকে সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া যাইত, বসিয়া বসিয়া যশোদা দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করিলে সকলে যে কৃতার্থ বোধ করিত, এ কি কৃতজ্ঞতা নয়? কিন্তু যখন জানা গেল যশোদা তলে তলে তাদের ক্ষতিই করে, যশোদার বাড়িতে থাকিলে কাজ থাকে না, শ্রমিক সমিতি হইতেও যখন উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল যশোদাকে বর্জন করিবার, ওদের তখন আর কি করিবার ছিল?

এসব কথা যশোদা ভাবিয়াছে। কিন্তু মন তার অবুঝ হইয়া পড়িয়াছে, কিছুই আর মানিতে চায় না। সুবর্ণকে লইয়া উধাও হইয়া গিয়া নন্দ তাকে আরও বেশী কাবু করিয়া দিয়াছে। নিজেকে যশোদার কেমন অপরাধী মনে হয়। মনে আর জোর পায় না। যুক্তিতর্ক দিয়া মনকে বুঝাইয়া মনের জোর তো আর বাড়ানো যায় না।

তাই, কেবল শ্রমিকরা যে তাকে ত্যাগ করিয়াছে তা নয়, সেও একরকম ওদের ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়-মিলের কেউ না আসুক, অন্য মিলের অনেকে মাঝে মাঝে যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে বিপদে পড়িয়া, কেউ আসিয়াছে কাজের সন্ধানে, কেউ আসিয়াছে নিছক দু'দণ্ড যশোদার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিবার জন্য। সকলে যে তাকে ত্যাগ করে নাই তার এতবড় একটা প্রমাণও যশোদাকে কিন্তু খুশি করিতে পারে নাই।

সোজাসুজি কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কি চাই?'

কি চাই অর্ধেকটা শুনিতে না শুনিতে বলিয়াছে, 'আমি পারব না। আমার কাছে এসেছ কেন?'

মনটা যশোদার সত্যিই একটু বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তবু মনের কোণে হয়তো যশোদার ক্ষীণ আশা বা ইচ্ছা ছিল, একদিন আবার বাড়িতে তার কুলি-মজুরেরা বাসা বাঁধিবে, আবার সে দু'বেলা ওদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবে। কিন্তু রাজেনের প্ররোচনায় বাড়িতে ভদ্র ভাড়াটেদের আনিবার পর সে-আশাও যশোদার ঘুচিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তার বাড়ির চারিদিকে শহরতলিতে, তাতে কুলি-মজুরদের এখানে আর বাস করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। চারিদিকে শহুরে ভদ্র আবহাওয়ার চাপে বেচারাদের দম আটকাইয়া আসিবে, এক মুহূর্তের স্বস্তি থাকিবে না।

কিন্তু আবার অন্য দিক দিয়া কুলি-মজুরদের সঙ্গে যশোদার যোগাযোগ টিকিয়া গেল।

একদিন রাজেন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে আনিয়া হাজির, যশোদার সঙ্গে আলাপ করিবে, মানুষটার নাম কি, কি করে, কিছুই রাজেন প্রথমে বলিল না। লোকটিও ঘণ্টাখানেক এ-বিষয়ে সে-বিষয়ে এলোমেলো আলোচনা করিয়া উঠিয়া গেল। আলাপ করিতে যে আসিয়াছে সে শুধু আলাপ করুক, যশোদার তাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এ কোন্ দেশী আলাপ? একেবারে যে অনেকদিনের পরিচয় ছিল, খানিকক্ষণ বসিয়া গল্পে আনন্দ করিয়া চলিয়া গেল। লোকটি বসিয়া থাকিতে থাকিতেই

যশোদা কয়েকবার রাজেনের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু লোকটি বিদায় হওয়ার আগে তার কাছে একটি কথাও শুনা গেল না।
'আসছি' বলিয়া লোকটির সঙ্গে উঠিয়া গিয়া রাজেন ফিরিয়া আসিল।
'কেমন লাগল লোকটিকে চাঁদের-মা ?'
'তা যেমনি লাগুক, আগে বল তো শুনি লোকটি কে ?'
'খুব নাম-করা লোক গো—বিধুবাবু।'
বিধুবাবুর নাম যশোদাও শুনিয়াছে, শ্রমিক-নেতা হিসাবে লোকটি সত্যই এতখানি বিখ্যাত যে এভাবে বাড়ি আসিয়া যশোদার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাওয়া সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার।
'বিধুবাবু! বিধুবাবু আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন কেন ?'
রাজেনের চেয়ে সে-কথা বিধুবাবুই যশোদাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল, দিন তিনেক পরে। আবার তেমনিভাবে অসময়ে আসিয়া আল-গোছে একটি মোড়াতে বসিয়া বলিল, 'তাহ'লে পরশুর সভাতে যাচ্ছ তো দিদি ?'
আগের দিন বিধুবাবু তাকে 'তুমিও, বলে নাই, দিদিও বলে নাই। যশোদা আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কিসের সভা ?'
বিধুবাবু আরও বেশী আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কেন রাজেন বলে নি ?'
'কই, না ?'
সঙ্গে সঙ্গে বিধুবাবুর হাসির শব্দে যশোদার বাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল। —'তা রাজেন ওই রকম মানুষই বটে! আমি কে তাতো বলেছে, না তাও বলে নি ?'
'প্রথমে বলে নি, আপনি যাওয়ার পর বলেছে।'
যশোদারও হাসি আসিতেছিল। প্রথমদিন বিধুবাবুর তবে ধারণা ছিল যশোদা তার নাম-ধাম আর দেখা করিতে আসার উদ্দেশ্য সমস্তই জানে, তাই পরিচয়ও দেয় নাই, কাজের কথাও বলে নাই। লোকটিকে যশোদার ভাল লাগিতে থাকে। এরকম লোকই ভাল, যারা অকারণে প্রথম পরি-চয়ের দিন অনাবশ্যক ব্যগ্রতার সঙ্গে বড়-বড় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া আরও বড় প্রয়োজন যে চেনা হওয়া, তাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বসে না।

দু'দিন পরে শ্রমিকদের একটি সভা হইবে, সাধারণ সভা। প্রথমে কর্মী-দের সভা, তারপর শ্রমিকদের। বিধুবাবু যশোদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া যাইতে চায়, ব্যাপারটা একটু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিবে। তারপর যশোদার ইচ্ছা হয়, সমিতির মধ্যে ভিড়িয়া গিয়া একটু কাজ করিতে চায় সে তো আনন্দের কথা। আর ভিড়িতে যদি না চায় নাই ভিড়িবে। একবার গিয়া দেখিয়া আসিতে দোষ নাই।

'সমিতি-টমিতির সঙ্গে কি আমার বন্‌বে বিধুবাবু? সমিতির লোকেরা আমার ওপর চটে আছে, কত কথাই রটিয়েছে আমার নামে।'

'ওসব লোকেশবাবুর কাজ দিদি। লোকেশবাবুর একটু বাড়াবাড়ি আছে কিনা সব বিষয়ে, সমিতির মেম্বার না হয়ে কেউ শ্রমিকদের ভাল করবে তা পর্যন্ত সহ্য হয় না। আগের কথা ভুলে যাও দিদি, তোমাকে আমাদের চাই।'

অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া যশোদা সভায় যাইতে রাজি হইয়া গেল।

বিদায় নেওয়ার আগে যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা শুনলে কার কাছে? রাজেন বলেছে বুঝি?'

বিধুবাবু বলিল, 'সত্যপ্রিয়-মিলের কাণ্ডটার সময় আমি ছিলাম পশ্চিমে। এসে অনেক রকম কথা শুনলাম। তোমার কথা তো আগে থেকে সব জানতাম দিদি, তাই শুনে মনে হ'ল, এ তো বড় খাপছাড়া ব্যাপার হচ্ছে। তারপর রাজেন একদিন আমায় বললে বসে বসে মরচে ধরায় বড় নাকি কষ্ট পাচ্ছ। আমারও একটু দরকার ছিল, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। সত্যপ্রিয়-মিল বড় করেছে জানো?'

'শুনেছি।'

বিধুবাবু খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যশোদার মুখের ভাব দেখিতে থাকে। বড় ধারালো দৃষ্টি বিধুবাবুর, দেখিলেই বুঝা যায় মানুষটা সে ভয়ানক নিষ্ঠুর। তবে একটু যশোদা আগেই বুঝিয়াছিল, অন্যকে কষ্ট দিয়া আনন্দ পাওয়ার নিষ্ঠুরতা এটা নয়, এ নিষ্ঠুরতা জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার, প্রতিক্রিয়া যে প্রতিক্রিয়ায় মনের কোমলতা আর ভাবপ্রবণতা গোড়া

সুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া যায়। সাধারণ আলাপেই এটা বেশ বোধগম্য হয়। তাছাড়া, যে ভাবে বিধুবাবু হাসে তার মধ্যেও তার মনের এ পরিণতির প্রমাণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এ রকম হাসির সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, তার পরিচিত আরেক জন লোক এভাবে হাসিত। সমস্ত ব্যাপারে যারা কৌতুক বোধ করে, মর্মান্তিক বেদনায় কাঁদিবার সময়ও একজনকে খাপছাড়া মুখের ভঙ্গি করিতে দেখিয়া যাদের হাসি পায়, কেবল তারাই এ রকম হাসি হাসিতে পারে।

এ রকম লোককে কিন্তু এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করা যায়। এদের আর যাই থাক, কিছুমাত্র স্বার্থপরতা থাকে না। পরের জন্য বেশী মন না কাঁদুক, নিজের ভাবনাটা এরা একেবারে ভাবে না।

সেদিন খাওয়ার সময় সুব্রতা বলিল, 'আমরাও আজ এক জায়গায় যাচ্ছি দিদি।'

অজিত তাকে আজ সিনেমায় নিয়া যাইবে। খবরটা দেওয়ার সময় সুব্রতা মুচকি মুচকি হাসে। যশোদাও হাসে।

'আমায় নিয়ে যাবে না?'

'তুমি না কোথায় যাচ্ছ আজকে?'

'ও, তাই আজ তোমরা সিনেমায় যাচ্ছ, আমায় ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়ে!' বলিয়া প্রচণ্ড শব্দে যশোদা হাসিতে থাকে। এই সামান্য পরিহাসে এত জোরে হাসিবার কি ছিল সেই জানে, হাসিটা বিধুবাবুর মতো হইতেছে খেয়াল করিয়া হঠাৎ সে থামিয়া যায়।

তারপর সুব্রতা যে খবরটা দেয় সেটা একটু মারাত্মক। একজনের গাড়িতে তারা সিনেমায় যাইবে, এদিকেই কোথায় সত্যপ্রিয় বলিয়া একজন মস্ত বড়লোক থাকে, তার ছেলের গাড়িতে। কবে যেন অজিত তার সঙ্গে কোন্ স্কুলে পড়িয়াছিল, হঠাৎ ক'দিন আগে দেখা হইয়া গিয়াছে। তারপর তাদের পরামর্শ হইয়াছে পরস্পরের বৌকে নিয়ে আজ তারা একসঙ্গে সিনেমায় যাইবে, আলাপ পরিচয়ও হইবে, একটু আনন্দও করা হইবে।

পাকা গিন্নীর মতো মুখ করিয়া সুব্রতা বলিতে থাকে, 'আমার কি আর সিনেমা-টিনেমায় যাওয়ার শখ আছে দিদি? কি করব, বন্ধু বড় ধরেছে। ও কি বলছিল জানো দিদি? বন্ধুর বাপ নাকি বৌকে নিয়ে ছেলের কোথাও যাওয়া ছ'চোখে দেখতে পারে না, ভীষণ চটে যায়। সেকেলে ভূত আর কি। বাপ নাকি কোথায় গিয়েছে ক'দিনের জন্য, ছেলেও বৌকে নিয়ে খুব বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

মহীতোষকে যশোদা জানে, ছেলেটার বুদ্ধি একটু কাঁচা। সকলে তাকে সেকেলে গেঁয়ো আর অসভ্য মনে করে ভাবিয়া বড়ই মনের কষ্টে সে দিন কাটায়। বাহিরের লোকের সঙ্গে কথায় ব্যবহারে সে বিনয়ের অবতার, যশোদার সঙ্গে পর্যন্ত এমন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কথা বলে যে দেখিলে হাসিও পায়, মমতাও হয়। রাতে ঘুমের মধ্যেও হয়তো বাপের ভয়ে মহীতোষ চমকিয়া জাগিয়া ওঠে, কিন্তু বাড়িতে যারা আশ্রিত ও আশ্রিতা, আপিসে ও কারখানায় যারা জীবিকার প্রত্যাশী তাদের সঙ্গে তার ব্যবহার বড় খারাপ। কথায় কথায় কারণে অকারণে রাগিয়া যায়, গালাগালি দেয়, অপমান করে। অজিতের সঙ্গে মহীতোষের বন্ধুত্ব না হয় আছে, কিন্তু মহীতোষ কি জানে না বন্ধু তার যশোদার বাড়িতে থাকে? যশোদার বাড়ির ভাড়াটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার সাহস সে পাইল কোথায়?

শ্রমিক সমিতির সভায় গিয়া যশোদা যে বিশেষ খুশি হইল তা বলা যায় না, তবে তেমন খারাপ তার লাগিল না। পরিচালক সমিতির সভায় বড় বেশী তর্ক চলে, নিজের নিজের মতামতটা জাহির করিবার জন্য অনেকে বড় ব্যস্ত। বড় বড় কথাও অনেক বলা হয়, একেবারে নাটকীয় ভঙ্গীতে, অবরুদ্ধ একটা উত্তেজনা যেন বক্তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে সকলে এরকম নয়, শান্ত ও সংযত মানুষও কয়েকজন আছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়াই যারা কথা বলে। কিন্তু এদেরও আসল বক্তব্যটা যশোদা আগাগোড়া ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতে-ছিল না। খানিকক্ষণ হয়তো কথাগুলি জলের মতো পরিষ্কার বুঝা যাইতে লাগিল তারপর হঠাৎ কখন কি ভাবে যে সমস্ত বিষয়টা জটিল

আর দুর্বোধ্য হইয়া গেল কিছুই যশোদার মাথায় ঢুকিল না। তবে সে-জন্য এদের সে দোষ দিল না, অপরাধটা ধরিয়া নিল নিজের বুদ্ধির। এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্কবিতর্ক পরিষ্কার বুঝিবার মতো জ্ঞান সে কোথায় পাইবে? তার মতো ঠেক্‌নো দিয়া দশ-বিশজন শ্রমিককে কোনো রকমে খাড়া রাখিবার ব্রত এদের নয়, ধনিকতন্ত্রের চোরাবালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা এদের কাজ।

সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলি-মজুরের সঙ্গে সে মিশিয়াছিল, তাঁদের কয়েকজনকে ভাল বাসিয়াছিল, একটা শ্রেণী হিসাবে তাদের কথা কখনো ভাবিয়া ছাখে নাই। আজ সকলের আলোচনা হইতে শ্রমিক সমস্যার স্বরূপ তার কাছে যতটুকু প্রকট হইয়া উঠিল তাতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রমিকসভার বক্তৃতাগুলি যশোদার ভাল লাগিল না। প্রত্যেকটি বক্তা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসই শুধু বিতরণ করিয়া গেল, কোনো বিষয়েই একটু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা কারো দেখা গেল না। বক্তৃতাগুলি জোরালো হইল সন্দেহ নাই, শ্রমিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাবও দেখা গেল বক্তৃতায়, কিন্তু এরকম প্রভাব কি স্থায়ী হয়? কাজে লাগে?

হয়তো লাগে। যা ওদের করা উচিত সেটা কেন করা উচিত বুঝাইয়া দেওয়ার বদলে এমনি বক্তৃতার সাহায্যে করাইয়া নেওয়াই হয়তো সহজ ও সম্ভব।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত প্রায় ন'টার সময় বাড়ির কাছা-কাছি আসিয়া যশোদার চোখে পড়িল, তাদের গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে সত্যপ্রিয়র প্রকাণ্ড গাড়ি। ভিতরে একা বসিয়া আছে একটি অল্প-বয়সী বৌ। পাশ কাটাইয়া যশোদা গলির মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছিল, বৌটি ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিল, 'চাঁদের-মা, ও চাঁদের-মা, শুনুন।'

বৌটি কে এবং এখানে গাড়ির মধ্যে একা কেন বসিয়া আছে যশোদা আগেই অনুমান করিয়াছিল। কাছে আসিতে মহীতোষের বৌ বলিল,

'ওঁকে একটু শীগ্গির পাঠিয়ে দেবেন চাঁদের-মা ?'

'তা দিচ্ছি, কিন্তু তোমায় একা বসিয়ে রেখে কি বলে নেমে গেলে বাছা ?'

'কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেছেন।'

বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া মহীতোষ, অজিত আর সুব্রতার মধ্যে তখনো কথা চলিতেছিল। অজিত বা সুব্রতা যে মহীতোষকে আটকাইয়া রাখে নাই, মহীতোষ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে বলিয়াই দু'জনে তারা ভিতরে যাইতে পারিতেছে না বুঝিতে যশোদার দেরী হইল না। ছেলে-মানুষ তিনজনেই এবং মহীতোষের বুদ্ধিটা সত্যই একটু কাঁচা। সুব্রতাই বা কি, এদিকে তো মুখে তার কথা ছোটে তুবড়ির মতো, ভদ্রতা বজায় রাখিয়াই একটু ইঙ্গিতেও কি সে মহীতোষের মনে পড়াইয়া দিতে পারিল না, গলির মোড়ে বৌটাকে সে একা ফেলিয়া আসিয়াছে ? যশো-দাকে দেখিয়া মহীতোষ বলিল, 'কেমন্ আছেন চাঁদের-মা ? আজ এঁদের নিয়ে—'

'একা বসে থাকতে বৌমার ভয় করছে।'

'আঁ ? ও, হ্যাঁ যাই।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া যে যার ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেল। ধনঞ্জয় যশো-দার বিছানা দখল করিয়া শুইয়া আছে।

'তুমি এখানে যে ?'

ধনঞ্জয় জবাব দিল না।

'ভাত খেয়েছ !'

'খেয়েছি।'

সারাদিন রাগে গজগজ করিতে করিতে কুমুদিনী আজ এখানে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে। কথা ছিল, কুমুদিনীর ননদ আসিয়া রাঁধিয়া দিবে, কিন্তু শত্রুর বাড়িতে নিজে রাঁধিয়া দিতে না আসিলে কুমুদিনীর বোধ হয় তৃপ্তি হয় না।

বাহিরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া যশোদা তিনজনের ভাত বাড়িল, তারপর

ধনঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিল, 'এখানে এসো না, আমাদের খাওয়া দেখবে আর গল্প শুনবে কোথায় গিছলাম ?'

ধনঞ্জয় সাড়া দিল না বটে কিন্তু খানিকক্ষণ পরে মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া আসিল। সকলে তখন খাইতে বসিয়াছে। কাঠের পা ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে সে বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেল। সুব্রতা বলিল, 'ওঁর ঠক্‌ঠক্ ক'রে হাঁটা দেখলে এমন লাগে আমার! কি হ'ল দিদি তোমার ওখানে ?'

'কি আর হবে, কুলি-মজুরের মিটিং হ'ল। তোমরা কেমন বায়োস্কোপ দেখলে বল।'

বায়োস্কোপের চেয়ে মহীতোষ আর তার বৌ-এর সঙ্গে পরিচয়ের কাহিনী বলিতে আর দু'জনের সমালোচনা করিতে সুব্রতার আগ্রহ দেখা গেল, ওদের কথাতেই খাওয়া শেষ হইয়া গেল। একবার মুখ খুলিলে সুব্রতা আর থাকিতে পারে না। আঁচাইয়া উঠিয়া ছবির গল্প আরম্ভ করিয়া বলিল, 'দেখবে দিদি বইটা ? নাম টাম আছে, অনেকের ছবিও আছে।'

বাংলা চলচ্চিত্র। সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে যশোদা ছাপানো প্রোগ্রামটির পাতা উল্টাইতেছিল। এক পাতায় দু'জন অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি দেখিয়া তার চোখের পলক বন্ধ হইয়া গেল।

নন্দ আর স্বর্ণ সিনেমায় অভিনয় করিতেছে ?

সুব্রতা বলিল, 'কি হ'ল দিদি ? কার ফটো দেখেছ ?—ওঃ; ছেলেটার! এমন সুন্দর গান করলে দিদি ছেলেটা কি বলব তোমায়!'

৭

যামিনী ফিরিয়া আসিল এবং পরাধীনতায় অভ্যস্ত মানুষও যেমন বড়রকম একটা ঘা খাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য গা' নাড়া দিয়া উঠিয়া স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়, চার টাকা পথ খরচ দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য সেইরকম একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল। আমাদের স্বাধীন কর বলাটাই এ ধরনের আন্দোলনের প্রচলিত প্রথা।

যামিনীও রাগ করিয়া সত্যপ্রিয়র কাছে দাবি করিয়া বসিল, সত্যপ্রিয় তার ভিন্ন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিক।

'ভিন্ন থাকবে ? মেসে ?'

'আজ্ঞে না। অন্য একটা বাড়ি নিয়ে—'

সত্যপ্রিয় সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল তবু জামাইয়ের ছেলেমানুষী রাগ কমানোর জন্য মৃদু একটু হাসিয়া পরিহাসের সুরে বলিল, 'আমার তো আর বাড়ি নেই বাবা, এই একটা ছাড়া ?'

'ছোটখাটো একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলছিলাম।'

এবার একটু গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'বেশ তো, সেজন্য ব্যস্ত হবার কি আছে ! কিছুদিন যাক না !'

যামিনী একগুঁয়ের মতো বলিল, 'আজ্ঞে না, দু'চার দিনের মধ্যে একটা বাড়ি ঠিক করে চলে যাব ভাবছিলাম।'

সত্যপ্রিয় এবার রীতিমত গম্ভীর হইয়া গেল।

'দু'চার দিনের মধ্যে চলে যাবে ভাবছিলে ? তা বেশ। একটা বাড়ি দেখে নাও, কলকাতায় বাড়ির অভাব নেই। কিন্তু, একা একজনের জন্য একটা বাড়ি না নিয়ে মেসে হোটেলে থাকলেই সুবিধে হ'ত না ?'

তখন যামিনী স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিল যে একা বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিবার কথা সে ভাবিতেছে না, সকলকে সঙ্গে নিয়া যাওয়াই তার ইচ্ছা।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'আমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এই কথা বলছ তো ? মাসে মাসে বাড়ি ভাড়াটাও দিতে হবে নিশ্চয় ?'

'আমার মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিলে—'

'কিসের মাইনে ? একজনকে বসিয়ে বসিয়ে মাসে দুশো টাকা হাত খরচা দিলে কি আপিস চলে বাপু ? কাজকর্ম শিখলে হয়তো একদিন মাইনে হবে তোমার, এখন আমার পকেট থেকে যে হাত খরচার টাকাটা দিচ্ছি, সেটা আর বাড়াতে পারব না। কমিয়ে দিতে হবে কিনা কে জানে,—বড় টাকার টানাটানি চলছে আমার।'

খুব সকালে যামিনী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ঝগড়ার পর না খাইয়াই আবার বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিকালে অজিতের সঙ্গে গেল যশোদার বাড়ি।

সত্যপ্রিয় চার টাকা পথ খরচ দিয়া জামাইকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে যশোদা এ খবরটা জানিত। অজিত খবর দিয়াছিল। অজিত মহীতোষের বন্ধু, বুদ্ধিটাও মহীতোষের তেমন ধারালো নয় যে ঘরের কোনো কোনো খবর যে বন্ধুর কাছেও চাপিয়া যাওয়া উচিত এটুকু তার খেয়াল থাকিবে। সত্যপ্রিয়র মনের কোনো কথা কেউ কোনদিন ঘুণাক্ষরে টের পায় না, মহীতোষের মনের কথাগুলি বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়।

যামিনীকে দেখিয়া যশোদা একটু অবাক হইয়া যায়, তারপর তার প্রস্তাব শুনিয়া যশোদার একেবারে চমক লাগে।

'আমার এখানে থাকবেন মানে কি গো জামাইবাবু?'

অজিত বুদ্ধিমানের মতো একটু তফাতে সরিয়া গিয়াছিল। যামিনী গম্ভীর ভাবে বলিল, 'শ্বশুরের অন্ন আর কতকাল ধ্বংস করব চাঁদের-মা? তাই ভাবছি, অজিতবাবুর মতো আপনার এখানে ঘর ভাড়া করে থাকব।'

'একা?'

'উঁহুঁ, সবাইকে নিয়ে থাকব—অজিতবাবুর মতো।'

যশোদা হাসিয়া ফেলিল। সত্যপ্রিয়র মেয়েকে নিয়া যামিনী তার বাড়িতে ঘর ভাড়া করিয়া থাকিবে। এমন ছেলেমানুষী কথা যশোদা জীবনে কখনো শোনে নাই।

'ঝগড়া হয়েছে বুঝি শ্বশুরের সঙ্গে?'

'ঠিক ঝগড়া নয়, ওখানে আর বাস করা যায় না। কি কুক্ষণেই যে বড়-লোকের মেয়ে বিয়ে করেছিলাম চাঁদের-মা!'

প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও শেষ পর্যন্ত যশোদা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিতে পারে। একটু সহানুভূতি পাইয়াই যামিনীর মুখ খুলিয়া যায়, ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া বাড়াইয়া কমাইয়া অবিরাম সে বড়লোকের, বিশেষ করিয়া সত্যপ্রিয়র মেয়েকে বিবাহ করার ট্র্যাজেডি বর্ণনা করিয়া যায়, দুর্ভাগ্যের ইতিহাস যেন তার শেষ হইবে না।

ব্যাপারটা বুঝিতে যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না, সত্যপ্রিয়কে সে তো চেনেই, যামিনীর মতো ছেলেরাও তার অজানা নয়! অন্য কারও ঘরজামাই হইলে যামিনীকে সে আমল দিত কিনা সন্দেহ, সস্ত্রীক যামিনীকে বাড়িতে থাকিতে দিলে যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে সেটা সে বেশ অনুমান করিতে পারে। তাছাড়া, বেশীদিন বড়লোক শ্বশুরকে অবহেলা করিয়া শ্বশুরবাড়ির আরাম ছাড়িয়া এখানে বাস করিয়া থাকিবার মানুষও যামিনী নয়, তার বড়লোক শ্বশুরের কন্যাটিও নয়। সত্যপ্রিয়র কাছ হইতে একবার ডাক আসিলেই দু'জনে ফিরিয়া যাইবে। সত্যপ্রিয়কে একটু নরম করার জন্য এ বিদ্রোহ।

তবু দু'দিনের জন্যও সত্যপ্রিয়কে একটু বিপাকে ফেলা চলিবে শুধু এই জন্যই যশোদা যামিনীর প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেল।

প্রতিহিংসা?

তাছাড়া আর কি বলা চলে! মুখোমুখি দু'টি বাড়িতে পঁচিশ-ত্রিশটি মানুষ নিয়া যশোদার ছিল গুছানো সুখের সংসার, সত্যপ্রিয় সে সংসার ভাঙিয়া দিয়াছে। সত্যপ্রিয়কে জ্বালাতন করার সুযোগ কি সহজে ছাড়া যায়!

ক্ষতি করার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়া সুখ পাওয়ার স্বভাব যশোদার নয়, সত্যপ্রিয়কে আঘাত দেওয়ার জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় আবিষ্কার করার কথাটা তার মনেও আসে নাই। যামিনী বাড়ি বহিয়া আসিয়া প্রতিশোধের এরকম একটা সুযোগ হাতে তুলিয়া না দিলে যশোদা কোনোদিন কিছু করিত না। তাছাড়া, মেয়ে-জামাইকে এভাবে বাড়িতে রাখিলে সত্যপ্রিয়র ধনসম্পদ নষ্ট হইবে না, হাত-পাও ভাঙিবে না। হয়তো শুধু সহ্য করিতে হইবে নিছক একটু মানসিক অশান্তি। যশোদার অশান্তির তুলনায় সেটা কিছুই নয়।

'উনি কি মেয়েকে ছেড়ে দেবেন আপনার সঙ্গে?'

'উনি ছেড়ে না দিন, ওঁর মেয়ে আসবে।'

'মেয়েকে চুরি করবেন!' বলিয়া যশোদা হাসে।

যশোদা তামাশা করুক, যামিনীর সমস্যা কিন্তু দাঁড়াইয়াছিল তাই, সত্যপ্রিয়র মেয়েকে চুরি করিবে, অথবা সকলের সামনে বুক ফুলাইয়া তার

হাত ধরিয়া সত্যপ্রিয়র বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে? সত্যপ্রিয়কে আগে হইতে জানাইয়া তার মেয়েকে নিয়া বাড়ি ছাড়া সহজ ব্যাপার নয়, যদিও সে যামিনীর আইন আর শাস্ত্রসম্মত স্ত্রী।

যোগমায়ার সঙ্গে সে দেখা করে দুপুরে, সত্যপ্রিয় যখন বাড়ি থাকে না। পর পর তিনটি দুপুর পরামর্শের পর যোগমায়া মন স্থির করিতে পারে। গরীবের মতো কিন্তু স্বাধীনভাবে থাকিবার অর্থ যোগমায়ার জানা নাই, সেটা তার কাছে একটা কাল্পনিক উত্তেজনাময় নূতনত্ব মাত্র, যশোদার বাড়িতে থাকিবার কথায় সে খুঁতখুঁত করিতে থাকে। কলিকাতায় এত বাড়ি থাকিতে যশোদার বাড়িতে কেন? তাছাড়া বাপের বাড়ির এত কাছে যশোদার বাড়িতে থাকাটা কি উচিত হইবে, না ভাল দেখাইবে? নাটক ছাড়া মানায় না এমন অনেক বড় বড় আবোল-তাবোল কথা বকিয়া যশোদার বাড়িতে বাস করিতে যোগমায়াকে যামিনী যদি বা রাজি করাইতে পারে, চুপি চুপি বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে যোগমায়া কিছুতেই রাজি হয় না।

'কেন, আমি কি পাপ করছি? স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে যাব, তা লুকিয়ে-চুরিয়ে যাব কেন?'

যোগমায়া এখনো স্বামীর ঘর করিতে যায় নাই, সে অভিজ্ঞতাও তার নাই। সে শুধু শুনিয়াছে, স্বামীর ঘর করিতে যাওয়াটা মেয়েদের মহা গৌরব ও সৌভাগ্যের কথা।

'বাবা যেতে দেবেন না।'

'খুব দেবেন।'

আসল কথা, যোগমায়ারও শখ চাপিয়াছিল, একটু বেড়াইয়া আসিবে, জীবনে একটু নূতনত্ব আনিবে। রাজপ্রাসাদের মতো এতবড় বাগান-ঘেরা বাড়ি ঘরভরা গাদা গাদা আপনজন আর আত্মীয়স্বজন, এতসব দামী আসবাব আর দাসদাসী, নানা উপলক্ষে প্রায়ই লোকজনকে খাওয়ানোর হৈচৈ, কর্তার মেয়ে বলিয়া সকলের উপর এতখানি কর্তৃত্ব, তবু যেন যোগমায়ার সব একঘেয়ে লাগে।

বিবাহের অনেক আগে হইতেই একঘেয়ে লাগে, বাড়ির বাহিরে খেলা

করিতে যাওয়া সত্যপ্রিয় যখন রদ করিয়া দিয়াছিল। বিবাহ হইলে ভাল লাগিবে ভাবিয়াছিল, যামিনীর সঙ্গে রাত কাটাইতে ভাল লাগেও বটে, কিন্তু তাতে কি মানুষের মন ওঠে, বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্রব-বিহীন অল্প-বয়সী একটি মেয়ের মন?

যোগমায়ার রাগও হইয়াছিল। যামিনীকে দেশে পাঠানোর জন্য নয়, চার টাকা পথ-খরচ দিয়া যামিনীকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এই গুজবটা রটিয়াছে বলিয়া। তার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে তার বাবা, সকলের কাছে তার স্বামীকে এমনভাবে অপমান করে! স্বামীর সঙ্গে ভাঙা ঘরে সে উপবাস করিবে (কিছুদিন করিবে, সত্যপ্রিয় ব্যস্ত হইয়া ফিরাইয়া আনিতে গেলেই ফিরিয়া আসিবে) তবু আর সে এমন বাপের বাড়িতে থাকিবে না।

সুতরাং সত্যপ্রিয়র বাড়িতে একদিন সত্যই হৈচৈ পড়িয়া গেল।

মেয়েদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ গুজগাজের শেষ রহিল না। সকলেই বুঝিতে পারিল যে যামিনী রাগ করিয়া যোগমায়াকে নিয়া যাইতেছে, তবু যোগ-মায়া বাড়ির যেখানে যায় সেখানেই যেন তাকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসু মেয়েদের সভা বসিতে লাগিল। কেবল সত্যপ্রিয়র অনুমতি চাইতে যাওয়ার সময় কেউ তার সঙ্গে গেল না।

যামিনী দুপুরবেলা তার অনুপস্থিতির সময় আসা-যাওয়া করিতেছে শুনিয়া সত্যপ্রিয় মনে মনে একটু হাসিয়াছিল। আর দু'একদিনের মধ্যেই যামিনী আসিয়া পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। আসল ব্যাপারটা তার কানে গিয়াছিল সকালে যোগমায়া অনুমতি চাহিতে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায়। তারপর সত্যপ্রিয় মনে মনে আর হাসে নাই বটে, মেজাজটাও গরম করে নাই।

খবরটা দিতে আসিয়াছিল তার ভগ্নীপতি, খবর দিয়া আফসোসের শব্দ করিয়া বলিয়াছিল, 'আচ্ছা বিপদ হ'ল তো!'

সত্যপ্রিয় আশ্চর্য হওয়ার ভান করিয়া বলিয়াছিল, 'কিসের বিপদ?'

তার সঙ্গে লড়াই করিবে তার টাকা দিয়া কেনা জামাই? সত্যপ্রিয়ও

লড়াই করিতে জানে।

দুরুদুরু বুকে ঘরে গিয়া যোগমায়া ছাখে, সত্যপ্রিয় মেঝেতে যোগাসনে বসিয়া সামনে খবরের কাগজ বিছাইয়া ঝুঁকিয়া কাগজ পড়িতেছে।

কি ভাবে কথাটা বলা যায়? কি ভাবে বাপকে জানানো যায়, আমি তোমার বাড়ি ছাড়িয়া চলিলাম। মাথা ঘুরিয়া, গা কাঁপিয়া যোগমায়া অস্থির হইয়া পড়ে, কি ভাবে যে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলিয়া বসে নিজেই ঠিকমত বুঝিতে পারে না।

সত্যপ্রিয় আগেই মুখ তুলিয়াছিল, সহজভাবে বলে, 'যামিনী নিয়ে যাবে? আচ্ছা। কবে যাবি?'

যোগমায়া বলে, 'আজ।'

সত্যপ্রিয় বলে, 'বেশ।'

যোগমায়ার পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়। শুধু আশা নয়, যোগমায়ার বিশ্বাস ছিল সত্যপ্রিয় কখনো তাকে পাঠাইতে রাজি হইবে না, রাগ করিবে, বকুনি দিবে, তাকে বুঝাইবে—আর সে তখন কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে যে, তোমার জন্যেই তো সব গোলমাল, তুমি কেন ওকে অপমান করিলে! তার বদলে, একি! এক কথায় তাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়া দিল? এখন তো আর না গিয়া উপায় থাকিবে না।

সত্যপ্রিয় খবরের কাগজ পড়িতে মন দেয়।

কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া বলে, 'আমি কিন্তু আর ফিরে আসব না বাবা, আমায় আর আসতে দেবে না।'

সত্যপ্রিয় অন্যমনে বলে, 'বেশ তো!'

যামিনী আসিলে খবরটা দিয়া যোগমায়া চোখ বড় বড় করিয়া প্রশ্ন করে, 'কি উপায় হবে এখন?'

এত সহজে অনুমতি পাইয়া যামিনীরও ভাল লাগিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া বলে, 'ভালই তো হ'ল।'

'ছাই হ'ল ! তোমার মাথা হ'ল !'

যোগমায়া কাঁদিতে থাকে, কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা নাড়িয়া বলে, 'আমি যাব না।' রাগ করিয়া যামিনীর সঙ্গে ক'দিনের জন্য চলিয়া যাওয়ার কল্পনায় যোগমায়া যত মজা আবিষ্কার করিয়াছিল তার একটাও এখন আর সে খুঁজিয়া পায় না। যা ছিল ছেলেমানুষী তাই এখন ভয়ানক বিপদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে !

'যাবে না মানে ?'

'না না, যাব না। কোথায় যাব আমি বাবাকে ছেড়ে ?'

যামিনী আহত হইয়া বলিল, 'বেশ। যাওয়া ঠিক করে এখন উল্টো গাইছ।'

'তুমিই তো কুপরামর্শ দিয়ে মাথা ঘুলিয়ে দিলে আমার ?'

যামিনীর সঙ্গে যোগমায়ার ঝগড়া হইয়া যায়।

বাপকে গিয়া যোগমায়া বলে, 'না বাবা, আমি যাব না। তোমাদের মনে কষ্ট দিয়ে—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'আমাদের আবার কষ্ট কিসের !'

যোগমায়া থমকিয়া যায়। সামলাইয়া উঠিয়া আবার বলে, 'আমি জানি তোমার ইচ্ছে নেই বাবা, তোমার মনে ব্যথা দিয়ে—'

নিজে না গলিলে এজগতে কারও ক্ষমতা নেই সত্যপ্রিয়কে গলায়। তেমনি স্নেহহীন কণ্ঠে নির্বিকার ভাবে সে বলে, 'আমার মনে ব্যথা দিবি কেন ?'

বাপের ব্যবহারে মর্মাহত যোগমায়ার দারুণ অভিমানে আবার মনে হয়, যামিনীর সঙ্গে যাওয়াই ভাল, সত্যপ্রিয় যতদিন নিজে না আনিতে যায় ততদিন না আসাই ভাল।

তবু, কোনোরকমে চোখ কান বুজিয়া সে বলে, 'তুমি যদি ওকে একটু মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে বল বাবা—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'তোরা দু'জনেই বড় বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস্, মাথায় চড়ে গেছিস্ দু'জনে।'

অগত্যা যামিনীর সঙ্গে যোগমায়া যশোদার বাড়িতে গিয়া উঠিল। রওনা

হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় বাড়িতেই ছিল। যোগমায়া ইচ্ছা করিয়াই দেরি করিয়া করিয়া সত্যপ্রিয় বাড়ি ফিরিবার পর রওনা হইয়াছে। যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যদি নরম হয়। মেয়েকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মন কেমন করিয়া উঠিলে সে যদি একটু নত হইয়া যামিনীকে মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া শান্ত করিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেয়!

আগে পরে দু'জনে সত্যপ্রিয়কে প্রণাম করিল। সত্যপ্রিয় যামিনীকে বলিল, 'সাবধানে থেকো' আর যোগমায়াকে বলিল, 'সাবধানে থাকিস্।'

কয়েক মিনিট পরেই যশোদার বাড়ি। যশোদা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, সুব্রতা হাত ধরিয়া যোগমায়াকে ভিতরে নিয়া গেল, পাড়ার যেসব মেয়েরা যশোদার বাড়িতে সত্যপ্রিয়র মেয়ের পদার্পণ দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তারা হাঁ করিয়া চাহিয়া রইল।

যশোদাকে যোগমায়া চেনে, তার বাড়িটি কোনোদিন ছাখে নাই। ভিতরে ঢুকিয়া সেও যেদিকে চোখ পড়িতে লাগিল সেইদিকেই হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিল। ঘর দেখিয়া সে যেন মরিয়া গেল। কি সর্বনাশ, এই ঘরে তাকে থাকিতে হইবে নাকি? খাটপালঙ্ক, আলমারি, ড্রেসিংটেব্‌ল এ-সব না থাক, কিন্তু একি দেয়াল, একি মেঝে, একি দরজা জানালা! কতটুকু ঘর!

সুব্রতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলিল, 'যাক্, এ্যাদ্দিনে একজন মনের মতো সঙ্গী জুটল। তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার কথা এত শুনেছি ভাই।'

'তুমি আমার ভাইকে চেনো?'

'চিনি না? কবে থেকে চিনি।'

'কি ক'রে চিনলে?'

প্রশ্ন শুনিয়া মনের মতো সঙ্গী সত্যই জুটিয়াছে কিনা সে বিষয়ে বড়ই সন্দেহ জাগায় সুব্রতা একটু দমিয়া গেল।

'ওঁর সঙ্গে পরিচয় আছে। তোমার দাদা ওঁর বন্ধু।'

'তাই নাকি? তাতো জানতাম না।'

যশোদা যোগমায়াকে দেখিয়াই দমিয়া গিয়াছিল। পাড়ার মেয়েদের আস্তে আস্তে বিদায় করিয়া যে যামিনীকে নিয়া পড়িল।

'আপনার কেমন ধারা বিবেচনা জামাইবাবু?'

'কেন চাঁদের-মা?'

'দু'দিন বাদে ওর ছেলেপিলে হবে, ওকে নিয়ে এসময় টানা-হ্যাঁচড়া হাঙ্গামা আরম্ভ করেছেন? প্রথমবার লোকে কত সাবধানে রাখে, মন ভাল রাখার জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, আর আপনি এমন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। বয়স তো কম হয় নি আপনার?'

যামিনী আমতা-আমতা করিয়া বলিল, 'এখনো দেরি আছে।'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ছাই আছে। ও দু'চার মাস সময় কোন্ দিক দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবেন না। দেরি থাকলেই বাকি, এ সময় কেউ এমনি হাঙ্গামা করে?'

যশোদার বড় অনুতাপ হয়! সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ পাইয়া খুশি হওয়ার সময় তার মেয়ের কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল। সে অবশ্য জানিত না যোগমায়ার এরকম অবস্থা, তবু এতটুকু একটা মেয়ের মনে এই ধরনের হাঙ্গামার ব্যাপার কি রকম আঘাত দিতে পারে সেটা অনুমান করা তো তার পক্ষে কঠিন ছিল না। মানুষকে হিংসা করিলে এমনি হয়, একজনকে হিংসা করিতে গিয়া মনেও থাকে না আরও অনেকে তার ফলভোগ করিবে।

কি আর করা যায়, যোগমায়ার মনটা একটু ভাল করার জন্য যশোদা চেষ্টা আরম্ভ করে। গল্প জুড়িয়া দেয়, হাসি-তামাশা করে, গম্ভীরমুখে বলে, 'দু'দিনের জন্য বেড়াতে তো এলে দিদি, দু'দিন বাদে বাপ যখন গাড়ি পাঠিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ঘর যে তখন আমার খালি হয়ে যাবে বাছা?'

'বাবা আর আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না যশোদাদিদি।' যোগমায়া কাতরভাবে বলে।

যশোদা হাসিয়া বলে, 'থামো বাছা তুমি। বাপ কখনো মেয়েকে ত্যাগ করতে পারে?'

'আমার বাবার ভীষণ রাগ, তুমি জানো না! চলে আসতে যখন দিয়েছে, কখ্খনো আর ফিরে যেতে দেবে না।'

'দেবে—আমি বলছি দেবে। বাপ-মার রাগ ক'দিন টেকে? দু'দিন বাদে রাগ জল হয়ে গেলে যখন মন কেমন করতে আরম্ভ করবে, নিজে এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদের।'

কুমুদিনী প্রথম হইতে একপাশে মুখ বুজিয়া বসিয়াছিল, এবার সে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করে, 'রাগারাগি করে এসেছে বুঝি?'

যশোদা বলে, 'কিসের রাগারাগি? সংসারে অমন কথা কাটাকাটি হয়।'

যামিনী ও সত্যপ্রিয়র কলহের ব্যাপারটাই যশোদা একেবারে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। যামিনী শ্বশুরের সঙ্গে আর সত্যপ্রিয় জামাইয়ের সঙ্গে যেন একটু ছেলেখেলা করিতেছে, যশোদার ভাবটা এই রকম। যোগমায়াকে সাহস দেওয়ার জন্য এটা শুধু যশোদার ছলনা নয়। সত্যপ্রিয়কে সে জানে। পুতুল কথা না শুনিলে ছোটছেলে যেমন তার অত সাধের পুতুলটি ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙিয়া ফেলে, সত্যপ্রিয়ও তেমনি তার অবাধ্য প্রিয়জনকে পিষিয়া ফেলিতে পারে অনায়াসেই। তবু যশোদা বিশ্বাস করিতে পারে না সত্যপ্রিয় মেয়েকে ফিরাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া বেশীদিন চুপ করিয়া থাকিবে।

যোগমায়া যশোদার সঙ্গে যেন একেবারে আঁটিয়া যায়। অনেক দিন আগে, যশোদার বাড়িতে যখন শুধু কুলি-মজুরের আস্তানা ছিল আর সত্যপ্রিয় হঠাৎ যশোদাকে খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, একদিন সত্যপ্রিয়র বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া বেয়াদবি করার জন্য যশোদা যোগমায়াকে আচ্ছাকরিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিল। সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করিয়াছিল সেদিন যোগমায়া। আজ যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে বিদ্যুতের আলো জ্বলে না, ঘরের দেয়াল সরিয়া সরিয়া আসিয়া চাপ দিতে থাকে, দম আটকাইয়া আসে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হয়, যোগমায়া যশোদার কাছে সরিয়া সরিয়া আসে, পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়।

'ঘরটা গুছিয়ে নাও।' যশোদা বলে।

'আমার কি হবে যশোদাদিদি ?' যোগমায়া বলে।

ধনঞ্জয় ঘরে আর রোয়াকে বসিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল, এক ফাঁকে চুপি-চুপি যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা এখানে থাকবে নাকি চাঁদের-মা ?'

যশোদা বলে, 'না।'

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া যশোদা উনান ধরাইতেছে, যামিনী উঠিয়া আসিল। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু।

'ঘুমোচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। এই তো ঘুমোলো চারটের সময়।'

যশোদা তা জানিত।

'খুব কেঁদেছে না ?'

'শুধু কান্না! কি বিপদেই যে পড়লাম চাঁদের-মা।'

যশোদা তাও জানিত। একটা আফসোসের শব্দ করিল।

যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'একটা বড় দেখে বাড়ি ঠিক ক'রে উঠে যাব চাঁদের-মা ?'

যামিনীর কাছে শ'খানেক টাকা আছে যোগমায়ার কাছেও আছে সাতাত্তর টাকা। যোগমায়ার গায়ে আর বাক্সে গয়না আছে অনেক। কিন্তু যশোদা সংক্ষেপে বলিল, 'বড় বাড়ি দিয়ে কি হবে ? ক'টা দিন যাক।'

যশোদা ভাবিয়াছিল, দু'একদিনের মধ্যেই সত্যপ্রিয়র কোনো আত্মীয় মধ্যস্থ হইয়া আসিবে। কিন্তু চার পাঁচদিন কাটিয়া যায় কারও পাত্তা মেলে না। সত্যপ্রিয় যেন সত্যই মেয়ে-জামাইকে ত্যাগ করিয়াছে। যোগমায়ার অবস্থা দিন দিন কাহিল হইতে থাকে, যশোদা না থাকিলে ইতিমধ্যেই হয়তো তার নার্ভাস্ ব্রেকডাউন ঘটিয়া যাইত। যশোদা তাকে আদর করে, ধমক দেয়, নানাভাবে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া রাখে। কিন্তু মনের যার জোর নাই একেবারে, কতটুকু মনের জোর তার মধ্যে সংক্রামিত করা যায় ? ধার-করা মনের জোর কতক্ষণ কাজে লাগে মানুষের ?

যশোদা যখন বলে, 'এরকম যদি করবে, এলে কেন ?'
যোগমায়া বলে, 'আমি আসি নি, আমায় জোর ক'রে এনেছে।'
যামিনী যখন বলে, 'এমন জানলে তোমায় আমি আনতাম না।'
যোগমায়া বলে, 'আমাকে মেরে ফেলে বাবাকে কষ্ট দেবে বলে তুমি আমায় জোর ক'রে এনেছ।'
'চলো তবে তোমায় রেখে আসি ?'
'বাবা না ডাকলে কি ক'রে যাব ?'
শুধু এই একটি বিষয়ে সত্যপ্রিয়র মেয়ের মতোই তার তেজ দেখা যায়। অথবা সত্যপ্রিয়র মেয়ে বলিয়াই হয়তো সে হিসাব করে যে না ডাকিতে ফিরিয়া গেলে ভবিষ্যতে প্রায়ই চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখানোর সুবিধা থাকিবে না।
সাতদিনের দিন সকালে মহীতোষ আসিল। অজিত আর সুব্রতার সঙ্গে মহীতোষ মাঝে মাঝে আড্ডা দেয়, তবে সেটা তার নিজের গাড়িতে অথবা মাঠে ঘাটে হোটেল সিনেমায়, যশোদার বাড়ির মধ্যে নয়। এবার কোথা হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে একটা পিঁড়ি দখল করিয়া বসিল।
যোগমায়া তো আনন্দে প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম।—'দাদা! দাদা এসেছো। তুমি কোত্থেকে এলে দাদা ? বাবা পাঠিয়েছে ?'
মহীতোষ নিষ্ঠুরের মতো নির্বিকার হাসি হাসিয়া বলিল, 'বাবা পাঠাবেন বৈ কি!' কাউকে আসতেই বাবা আরও বারণ ক'রে দিয়েছেন, বাবা পাঠাবেন!'
যোগমায়া দমিয়া গেল—'বারণ ক'রে দিয়েছেন!'
'করবেন না ? যা কীর্তিটাই তোমরা করলে!'
যশোদা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিল, 'আহা, কেন মিছে ঘাব্‌ড়ে দিচ্ছেন ওদের ? রাগ করবেন সে তো জানা কথা—ও রাগ কি টেকে ? সব ঠিক হয়ে যাবে।'
মহীতোষ সায় দিয়া বলিল, 'তা যাবে—তা যাবে। নিশ্চয় যাবে। তবে কিনা—তা ঠিক, সব ঠিক হয়ে যাবে বৈ কি।'

'অন্য সবাই বলে না আমার কথা ?'

'বলে বৈ কি।'

'কি বলে বলো না দাদা ?'

'নিন্দে করে, আবার কি বলবে।'

শুনিয়া যোগমায়া স্তব্ধ হইয়া যায়। নিন্দা করিবে বৈ কি, স্পর্ধা কি কম সকলের ! করুক, যত পারে নিন্দা করুক। ফিরিয়া গিয়া নিন্দা করার মজাটা সকলকে সে যদি টের না পাওয়াইয়া দেয়—

যোগমায়ার মন যতই খারাপ থাক আর বাড়িঘরের অবস্থার জন্য যতই লম্বা করিয়া কান্না আসুক, এটা তো ধরিতে গেলে একরকম তার নিজের বাড়ি, এখানকার কুঁড়েঘরেও তারই তো সংসার। মহীতোষকে যে কি দিয়া অভ্যথনা আর আদর-যত্ন করিবে সে ভাবিয়া পায় না। শেষে, একরাশ বাজারের খাবার আনাইয়া তাকে খাইতে দেয় আর খুঁটিয়া বাড়ির সব খবর জিজ্ঞাসা করে। ক'দিন আর সে বাড়ি ছাড়িয়াছে, ক'দিনের মধ্যেই কতগুলি বছর যেন কাবার হইয়া গিয়াছে। জবাব দিতে দিতে মহীতোষ বিব্রত আর বিরক্ত হইয়া বলে, সবাই ভাল আছে, সব ঠিক আছে। যেমন ছিল তেমনি সব আছে। কেন ভাবছিস ?'

যেমন ছিল সব তেমনি আছে ? সে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই ? একটু কাঁদাকাটাও করে নাই কেউ ? যোগমায়া দুঃখে অভিমানে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

আরও বেশী বিব্রত হইয়া কয়েক মিনিট বসিয়াই মহীতোষ উঠিয়া পড়ে। যোগমায়া কান্না থামাইয়া আব্দার জানায় : 'রোজ একবার ক'রে এসো কিন্তু দাদা।'

'আসব।'

'আর শোন, বাবা যদি জিজ্ঞেস করে আমার কথা—'

'বাবা কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি এসেছিলাম জানতে পেরে আমায় না খেয়ে ফেলে।'

মেয়ের খোঁজখবর নিতে সকলকে বারণ করিয়াছে ? মেয়ে-জামাইকে ঘরে ফিরানোর চেষ্টাটা সত্যপ্রিয়র দিক হইতে আরম্ভ হইবে এটা বোধ

হয় তবে আর আশা করা যায় না। আশা কেন যশোদা করিয়াছিল, যশোদা নিজেই জানে না। মেয়ে-জামাই অন্য কোথাও গেলে হয়তো সত্যপ্রিয় কিছু করিত, তারা যশোদার বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বোধহয় সে গুম খাইয়া গিয়াছে। এবং হয়তো গুম খাইয়াই থাকিবে। অথবা হয়তো এমন কিছু করিবে যাতে মেয়ে-জামাই তার যশোদার বাড়ি ছাড়িয়া তার পায়ের উপর গিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িবে আর যশোদার হইবে সর্বনাশ। কি ভাবে সত্যপ্রিয়র পক্ষে এটা করা সম্ভব যশোদা ভাবিয়া না পাক, সত্যপ্রিয়র মগজে ওরকম অনেক মতলব ঠাসা থাকে, সাধারণ মানুষের কাছে যা দুর্বোধ্য কল্পনাতীত।

কিন্তু আগে মেয়ে-জামাই-এর একটা ব্যবস্থা না করিয়া সে কি যশোদার কিছু করিবে? কে জানে, হয়তো যার উপর রাগ হইয়াছে তাকে পিষিয়া মারার জন্য মেয়ে-জামাই-এর ভাল-মন্দের কথাটাও সে ভাবিবে না। মেয়ে-জামাইকেই হয়তো যশোদাকে জব্দ করার কাজে ব্যবহার করিবে। ওদের উপরেও তো সে কম রাগে নাই!

যশোদার মনটা খারাপ হইয়া থাকে। আবার সত্যপ্রিয়র সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল? একটা তুচ্ছ বাজে উপলক্ষে? আদর্শবাদের ব্যাপারটা যশোদা একেবারেই বোঝে না, তবু তার সহজবুদ্ধিতেই সে বুঝিতে পারে, এবারকার লড়াইটা একেবারে অর্থহীন, জগতে কারও এতে কোনো উপকার হইবে না।

যোগমায়ার মনটা খারাপ হইয়া গেল বীভৎস রকমের। তার রকম-সকম দেখিয়া যশোদাও ভড়কাইয়া গেল। কোনো বিষয়ে ভড়কাইয়া যাওয়া যশোদার বড় অপছন্দ। বিরক্ত হইয়া যোগমায়াকে একেবারে সে আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিল, তারপর অনেক আদর করিল, তারপর নিজের বিষাদের স্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলবার মতো মাথা ঝাঁকি দিয়া বলিল, 'কি মন খারাপ করে আছি আমরা সবাই মিছিমিছি! বাড়িতে যেন মড়া জমেছে ক'গণ্ডা। এসো তো বাছা সবাই মিলে একটু ফুর্তি করি আজ। কি করা যায় বল তো?'

সুব্রতাই ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, 'সিনেমায় যাবে দিদি সবাই মিলে?'

সিনেমা-থিয়েটার যাওয়া ছাড়া ফুর্তি করার আর কোন্ উপায়ের কথা সুব্রতার জানা আছে কিনা সন্দেহ।

যশোদা না ভাবিয়াই বলিল, 'তাই চল।'

শহরতলিতে থাকিয়াও কতকাল যশোদা সিনেমায় যায় নাই তার নিজেরও মনে নাই। নন্দ আর সুবর্ণকে পর্দায় দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছাটা আজকাল জোরালো হইয়া উঠিয়াছিল, যাই-যাই করিয়াও এতদিন যাওয়া হয় নাই। ভাবপ্রবণ ব্যাকুলতাকে যশোদা বড় ভয় করে। নন্দকে পর্দায় নড়িয়া চড়িয়া কথা বলিতে দেখিলে আর তার গান শুনিলে হয়তো সে ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কাটা যশোদাকে আটকাইয়া দিয়াছিল। সাধ করিয়া ওরকম ব্যাকুল হইয়া লাভ কি—ও তো মদ খাইয়া মাতাল হওয়ার সামিল!

আজ সে সুব্রতাকে বলিল, 'সেই ছবিটা দেখতে যাব—সেই যে সেদিন দেখে এসে আমায় বললে, একটা ছেলে চমৎকার গান গায়?'

সুব্রতা বলিল, 'সেটা তো আমি দেখেছি। একটা নতুন ছবি হচ্ছে, খুব ভাল বই, সেটা দেখবে চল।'

যশোদা বলিল, 'না, ওই ছবিটা দেখব। এক ছবি দু'বার দেখলে তুমি মরবে না। ইচ্ছে না হয়, যেও না।'

৮

সকলে সিনেমায় গেল দল বাঁধিয়া। যশোদার বাড়িতে যারা বাস করিতেছিল। তারা তো গেলই, বাহির হতে আসিয়া যোগ দিল কুমুদিনী আর কেদার।

যোগমায়া শেষ মুহূর্তে হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছিল।

সকলে তখন সাজগোজ করিয়াছে, কেদার আর কুমুদিনীও আসিয়া হাজির হইয়াছে। যশোদার সিনেমায় যাওয়ার উপযুক্ত বেশভূষা করা নিয়া একটু হাঙ্গামা বাধিয়াছিল—সেরকম কাপড় কই, ব্লাউজ কই? সুব্রতা যাচিয়া যশোদাকে কাপড় আর ব্লাউজ ধার দিতে গিয়াছিল,

বলিয়াছিল, 'আমার এই কাপড়টা পরো না দিদি, আর এই ব্লাউজটা।'
অনেক দিনের পুরোনো তোরঙ্গ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যশোদা বলিয়াছিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমার জামা আমার হাতে ঢুকবে কিনা সন্দেহ, গায়ে দেব!'
'আচ্ছা, কাপড়টা পরো তাহ'লে।'
'না দিদি, আমার যা আছে তাই ভাল।'
সুব্রতার মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছিল।
'জানো দিদি, তোমার এই স্বভাবের জন্য তোমায় কেউ দেখতে পারে না।'
চওড়া পাড় পরিষ্কার একখানা সাদা শাড়ি পরিয়া যশোদা নিজেই একটু হাসিয়াছিল।—'রঙীন কাপড় পরার বয়েস কি আর আছে বোন? তোমার এমনি সাদাসিধে কাপড় থাকলে পরতাম। তোমার ঐ কাপড় পরে বৌ সাজি, আর আমায় দেখে সঙ ভেবে সবাই হাসুক, অত বোকা তোমার দিদিকে পাও নি।'
'রঙীন কাপড় পরলে লোকে হাসবে, এত বুড়ি তুমি হও নি দিদি। তোমার বয়েসে সবাই সাজগোজ করে।'
জামাকাপড়ের এই আলোচনায় বোধ হয় যোগমায়ার খেয়াল হইয়াছিল, একে একে সে চাহিয়া দেখিয়াছিল সকলের দিকে। তারপর চাহিয়াছিল নিজের জমকাল শাড়িখানার দিকে। এদের সঙ্গে সে সিনেমা দেখিতে যাইবে, এদের সঙ্গিনী হিসাবে? কি ভাবিবে লোকে? চেনা লোকে যদি তাকে এদের সঙ্গে দেখতে পায়? এ পাড়াটা পার হইয়া যাওয়ার সময় তো অনেক চেনা লোকের চোখে পড়িয়া যাইবে, সত্যপ্রিয় চক্রবর্তীর মেয়ে সে, কে না তাকে চেনে এপাড়ায়?
তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া যোগমায়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। একটু পরে রওনা হওয়ার সময়েও তাকে ঘরের বাহির হইতে না দেখিয়া সুব্রতা ডাকিতে গেল।
যোগমায়া বলিল, 'আমি যাব না, যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।'
'কেন? হঠাৎ তোমার কি হ'ল, যাবার জন্য তৈরি হয়ে?'

'বললাম তো ইচ্ছে করছে না।'

সুব্রতা মুখ ভার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, 'ও যাবে না দিদি। কাপড়-চোপড় ছেড়ে বসে আছে।'

তখন ব্যাপার বুঝিতে গেল যশোদা।

মুখ ভার করিয়া যোগমায়া চৌকিতে বসিয়া আছে, বিনা দোষে কে যেন তাকে তিরস্কার করিয়াছে অনেক।

'কি হ'ল হঠাৎ, যাবে না কেন?'

'ভাল লাগছে না যশোদা দিদি!'

যশোদা একটু হাসিল, বলিল, 'সেজেগুজে রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ এরকম ভাল না লাগা তো ভাল কথা নয়। চলো, লোকে কিছু ভাববে না। যদি ভাবে তো ভাববে যে, আমরা তোমার চাকর-দাসী—তুমি কোথাকার রাজরানী-টানী হবে, পাঁচ-সাতজন চাকর দাসী নিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে এসেছো।

যোগমায়া চোখও তোলে নাই, আর কথাও বলে নাই।

যশোদা গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর না? সাদাসিধে একখানা কাপড় প'রে চলো, এ কাপড়টা তোলা থাক। আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে—মনের খুঁতখুঁতানিটা যদি চাপতে পার কোনোরকমে, 'কি ফুর্তিটা হবে বল তো?'

পাশে বসিয়া যোগমায়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'নতুন কিছু একটা করেই ছাখো না আমার কথায়—খেলা মনে ক'রে ক'রে ছাখো একবার? শখ ক'রে!'

সাদাসিধে একখানা শাড়ি পরিয়াই শেষে যোগমায়া দলে ভিড়িয়াছিল। সকলেই হাসিখুশি, অল্পবিস্তর উত্তেজিত—উত্তেজনা ছাড়া তো আনন্দ হয় না। কেবল যোগমায়ার উত্তেজনার মধ্যে আনন্দ নাই, যশোদার হুকুমে সে সকলের সঙ্গে আসিয়াছে কিন্তু মন কেন খুশি হওয়ার হুকুম মানিবে!

টিকিট আগেই করা ছিল, সকলে ভিতরে গিয়া বসিল। আরম্ভ হইতে তখনও আধঘণ্টার উপরে দেরি। তবে তাতে কিছু আসে যায় না।

অজিত আর যামিনী নিয়মিত সিনেমা ছাখে, তারা ছাড়া, এ আধঘণ্টা সকলের কাছেই উপভোগ্য, যে আনন্দ টিকিটের দামে কেনা হইয়াছে তার ফাউ। একেবারে অপরিচিত না হোক এই আলোঝলমল গুঞ্জন-ধ্বনি-মুখরিত ঘনীভূত আধুনিকতার জগতে সময় কাটানোর অভ্যাস যশোদার নাই। সকলের আগে যশোদার মনে হয় চারিদিকের দেয়াল আর ছাদগুলি যেন শিশুকে ভুলানোর জন্যে মুখে রঙ মাখা স্নন্দরী মেয়ের মতো অসহ্য কৌতুকের উদ্ভট মুখভঙ্গি করিয়া আছে। ঘরের দেওয়ালে, আনাচে-কানাচে সর্বত্র হাস্যকর অনিয়ম। কোণগুলি কোণ নয়, রেখা-গুলি সাপের মতো আঁকাবাঁকা, এখানে ওখানে দু'চারহাত সমতল স্থান যদি বা থাকিয়া গিয়াছে রঙের কায়দায় সেখানটাও দেখাইতেছে উঁচু-নিচু। কেমন পছন্দ মানুষের কে জানে, এমন খাপছাড়া ভঙ্গিতে ঘর তৈরি করে আর ঘর সাজানোর মধ্যে এমন কুৎসিত অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে!

হল ইতিমধ্যেই প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল, এখনও ক্রমাগত লোক ঢুকি-তেছে—ছোটবড় গৃহস্থ পরিবার, স্কুল কলেজের যুবক, মাঝবয়সী ও বৃদ্ধ। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যাই বেশী, রঙীন শাড়ি আর গয়নায় সাজানো পুতুলের মতো বৌ আর তার স্বামী, কোনো কোনো স্বামীর কোলে একটি শিশু, আবার অনেক দলে অল্পবয়সী মেয়ে বৌ-এর সঙ্গে বাড়ির বয়স্কা গৃহিণীও আছে, সাজগোজটা তার একেবারে তুচ্ছ নয়।

যশোদার মনে হয়, এরা সকলেই যেন তার চেনা মানুষ—ঠিক সামনের সীটের গল্প-বিভোর প্রেমিক-প্রেমিকা দুটিকে যেমন চেনে, খানিক তফাতে পাশাপাশি প্রায় তিন গণ্ডা সীট দখল করিয়া যে পরিবারটি বসিয়াছে তাদেরও তেমনি চেনে। সবাই যেন তার প্রতিবেশী, পাশের বাড়ির লোক।

কুমুদিনী বলিল, 'ভিড় হয়েছে তো খুব।'

স্নব্রতা সগর্বে বলিল, 'বলি নি ভাল ছবি? কতদিন হ'ল চলছে, এখনো ভিড় হয়।'

যোগমায়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে শুধু চারিদিকে চাহিতেছিল

আর কেউ তার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চাহিয়া নাই বলিয়া জ্বালা বোধ করিতেছিল। জমকালো শাড়ি গয়নার অভাবে তার মনে হইতেছিল ভিড়ের মধ্যে সে যেন একটু উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছে। কি ভাগ্যে চেনা কারও সঙ্গে দেখা হইয়া যায় নাই!'

যশোদাও চুপ করিয়াছিল। ছবি আরম্ভ হওয়ার আগে হইতেই সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কখন নন্দ পর্দায় আসিবে!

'কত দেরি ছবি শুরু হতে?'

'এইবার শুরু হবে।'

যশোদার আগ্রহে সুব্রতা মনে মনে একটু হাসিল। যারা কখনো সিনেমায় আসে না, তারা এই রকম অধীর হইয়া পড়ে।

তারপর ঘর অন্ধকার করিয়া ছবি আরম্ভ হইল। যশোদা অন্ধকারে নিশ্চিন্তমনে ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে পর্দায় নন্দর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় নন্দ? এলোমেলো কতকগুলি নরনারী পর্দায় নড়াচড়া করিয়া আবোল-তাবোল কি সব বলে গেল, তারপর আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সুব্রতা কি ভুল করিয়াছে?

যশোদা সুব্রতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কই সেই ছেলেটা তো গান করল না!'

সুব্রতা সবজান্তার মতো বলিল, 'বই তো এখনো আরম্ভ হয় নি। বেশী বড় বই হ'লে হাফ-টাইমের আগে দেয়। ছোট বই হ'লে শীগ্‌গির হাফ-টাইম দিয়ে, পরে দেয়। কমিকটা সুন্দর হয়েছে, না?'

যোগমায়া সব-ভুলিয়া-যাওয়া উজ্জ্বল হাসির সঙ্গে বলিল, 'সত্যি। কি জব্দই হ'ল ছেলেটা মেয়েটার কাছে! বিয়ে ক'রে তবে রেহাই।'

কুমুদিনী বলিল, 'জব্দ হ'ল কিনা কে জানে!'

যোগমায়ার হাসি আরও উছলিয়া উঠিল: 'সত্যি! ঠিক্! বিয়ে করতেই তো চাইছিল।'

কমিক? বিয়ের কমিক? যশোদা রাগ করিয়া সোজা হইয়া বসে। এমন কেন হইয়াছে আজকাল, চোখের সামনে যা ঘটে তাও চোখে পড়ে না? মনে কষ্ট পাওয়ার কারণ ঘটিয়াছে, মনে কষ্ট হোক, তাতে যশোদার

আপত্তি নাই। হাল-ভাঙা নৌকার মতো দিশেহারা হইলে চলিবে কেন? আসল ছবি আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নন্দর আবির্ভাব ঘটিল। নন্দই বটে, কিন্তু যেন কোন্ দেশী নন্দ, একেবারে চেনাই যায় না। সায়েব বাড়ির একটা ঘরে বাঙালী বাড়ির একটা মেয়ে অর্গান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল, এমন সময় আসিল সাহেবী পোষাক পরা নন্দ। গান শেষ হওয়া পর্যন্ত মেয়েটি টেরও পাইল না কেউ ঘরে আসিয়াছে, তারপর চমকমারা, লজ্জাভরা আনন্দময় বিস্ময়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি অর্গান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। তারপর অনেকক্ষণ একটি অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে আর অতি বুদ্ধিমান ছেলের কথা কাটাকাটি, হাসি তামাশা অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি চলিতে লাগিল। প্রথমেই নন্দ একটা গান শোনানোর অনুরোধ জানাইয়াছিল এবং মেয়েটি বলিয়াছিল নন্দর মতো গায়কের সামনে সে কিছুতেই গান করিবে না, ধেৎ, তাই কি সে পারে, তার লজ্জা করে না বুঝি? মনে হইতে লাগিল, এ তর্কের জের যেন তাদের মিটিবে না। কথায় কথায় অন্য কথা আরম্ভ করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে কত কথায় যে তারা দর্শকদের জানাইয়া দিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কত বাড়ির লোক আর বাহিরের কত বন্ধু ও বান্ধবী বাজে ছুতায় আসিয়া দর্শকদের কাছে কৌশলে নিজেদের পরিচয় জানাইয়া চলিয়া গেল, তার পরেও দু'জনের মধ্যে কে আগে গান করিবে এ সমস্যা ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

'কেন শুনতে চাইছ গান?'

'তোমার গান বলে।'

'তার মানে আমি গাইতে পারি না। আমার গান বলে কোনোরকমে শুনবে।'

'তোমার চেয়ে গান দামী, গানের চেয়ে তুমি দামী। গানে গানে সুরের মূর্ছনায় তুমি যখন জগৎ ভরে দাও, আমি নিজেকে ভুলে যাই।'

'আমিও। তুমি আগে গাও।'

'না, তুমি আগে।'

কি মানে দু'জনের এই কথা কথাকাটির? যশোদা ভাবিয়া পায় না। সে তো

জানে না দু'জনের গান সম্বন্ধে দর্শকের কৌতূহল বাড়ানোর এটা কৌশল। তখন নন্দ বলিল, দু'জনে মিলে সেই গানটা গাই এসো।'

অর্গানের ধারে-কাছেও কেউ গেল না, নেপথ্যে কোথায় যেন গান আরম্ভ হওয়ার আগেই বাজনা বাজিয়া উঠিল—বাঁশী, বেহালা, হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদির ঐকতান।

পালা করিয়া দু'জনে গান গায়, কাছাকাছি আসিয়া পরস্পরকে ধরাধরি করে, চোখে চোখে চাহিয়া থাকে, হঠাৎ পাক দিয়া তফাতে সরিয়া যায়। সকলে মুগ্ধ হইয়া ছাখে আর শোনে।

যশোদা যাত্রায় এ রকম ডুয়েট গান অনেক শুনিয়াছে, তবে এতটা খাপ-ছাড়া আর মার্জিত নয়। যাত্রার ডুয়েট্ গান যেন কাহিনী, আবেষ্টনী আর অভিনয়ের সঙ্গে বেশ মানায়।

তবে এখানে নন্দ আছে।

পর্দার কাহিনী আগাইয়া চলে, কোন্ দেশের মানুষের কোন্‌দেশী কাহিনী বুঝিয়া উঠিতে গিয়া যশোদার ধাঁধা লাগিয়া যায়। যে ঘটনা ঘটা উচিত সে ঘটনা ঘটে না, যার যে কথা বলা উচিত সে সে-কথা বলে না, অথচ মাঝে মাঝে ঘরোয়া ঘটনা উঁকি দিয়া যায়, ঘরোয়া কথা কানে আসে।

আগাগোড়া সবটা রূপকথা হইলে বোধ হয় যশোদা এতটা বিব্রত হইয়া পড়িত না। রূপকথাতেও আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য থাকে। যশোদা যখন ভাবে, এইবার নন্দ রাগ করিবে, নন্দ তখন হাল্কা হাসি হাসে, নন্দর হাসি দেখিবার আগ্রহে যশোদা যখন সামনে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে, নন্দ তখন রাগে আগুন হইয়া ওঠে।

যশোদার নিজেরই তখন রাগ হয়।

তারপর দেখা দেয় সুবর্ণ। সুবর্ণ একটি অপ্রধান পার্টে নামিয়াছে, অল্প-বয়সী বৌ-এর পার্টে। এই পার্টটিই বোধ হয় সে ভাল অভিনয় করিতে শিখিয়াছে।

যশোদাকে সহজে চমক দেওয়া যায় না, সে ধীরে ধীরে নাড়া খায়। সুবর্ণের উপর যশোদা বিশেষ খুশি ছিল না, ছবি শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটার জন্য তার যেন বেশ মায়া জন্মিয়া যায়। মনের তলে একটা

আশা যশোদার ছিল বৈ কি যে একদিন নন্দ আর স্বর্ণ ফিরিয়া আসিবে, দু'জনকে সে ক্ষমা করিবে আর ভাই ও ভাই-এর বৌকে নিয়ে সংসার করিয়া চলিবে সুখে। এখন মনে হইতে থাকে, নন্দ যেন তার সে আশা চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তার ঘরের বৌকে করিয়া দিয়াছে সিনেমার অভিনেত্রী। জীবনে আর কোনোদিন সে তার বাড়িতে বৌ সাজিয়া থাকিতে আসিবে না।

যশোদা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, আমার মতো ভাগ্যবতী সংসারে কেউ নেই। আমি যা ধরতে যাই তাই ফসকে যায়। যে সুখ আমার জোটা উচিত ছিল, তা জোটে না। মরণও হচ্ছে না সেই জন্য ?

বাড়ি ফিরিবার পথে সুব্রতা জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে দিদি ?'

যশোদা সংক্ষেপে বলে, 'বেশ।'

রাজেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে যশোদার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। মন্তব্য করে কুমুদিনী।

বলে, 'ছেলেটা ঠিক আমাদের নন্দর মতো নয় ? গলার আওয়াজটা পর্যন্ত একরকম। প্রথমটা আমি তো—'

কেদার বলে, 'আহা, চুপ কর না ?'

কুমুদিনী ফোঁস করিয়া ওঠে, 'কেন, চুপ করব কেন ?'

যশোদা ধীরে ধীরে বলে, 'নন্দর মতো নয়, ওই আমাদের নন্দ।'

'ওমা সে কি কথা গো ?'

প্রথমে খানিকক্ষণ কুমুদিনী পলক না ফেলিয়া চাহিয়া থাকে, তারপর যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে এইরকমভাবে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া বলে, 'হুঁ তাই তো বলি, জনে জনে কি এমন মিল থাকে! কেমনধারা সাজ-পোষাক করেছে তাই, নইলে কি আর চিনতে একদণ্ড দেরি হ'ত। নন্দ বায়োস্কোপ করছে ?'

যোগমায়া ধীরে ধীরে বলে, 'আমি দেখেই চিনেছিলাম।'

এসব আলোচনা যশোদার আর সহ্য হয় না। সে বিরক্ত হইয়া বলে, 'চেনা মানুষকে চিনবে, তাতে আশ্চর্যের কি আছে ? কি যেন আরম্ভ

ক'রে দিয়েছ তোমরা।'

মনে মনে যশোদা ভাবে, নন্দকে চিনিতে পারিল, সুবর্ণকে কেউ চিনিতে পারিল না কেন ?'

সমস্ত পথ গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবে কুমুদিনী, বাড়ি ফিরিয়া যশোদাকে একান্তে টানিয়া নিয়া বলে, 'বলি চাঁদের-মা, একটি বৌ দেখলাম জ্যোতির্ময়বাবুর বোনের মতো, সে বুঝি—'

'সে সুবর্ণ।'

'মাগো ! এসব কি !—'

কুমুদিনীর মুখ দেখিয়া মনে হয় সে বুঝি শুধু আশ্চর্য হয় নাই, ভয়ও পাইয়াছে।

পরদিন সকালে রাজেনকে ডাকিয়া যশোদা বলিল, 'একটা কাজ ক'রে দেবে ?'

এরকম ভূমিকা করা যশোদার স্বভাব নয়। রাজেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

'কি কাজ ?'

'নন্দর ঠিকানাটা জেনে আসবে ?'

'নন্দর ঠিকানা জেনে করবে কি চাঁদের-মা ?'

যশোদা হাসিল—'বেশ মানুষ বটে তুমি, বেশ কথা সুধোচ্ছো।'

রাজেন ইতস্তত করিয়া বলিল, 'মানে, কি জান চাঁদের-মা, আসবার হ'লে নন্দ নিজেই আসত আগে। বায়োস্কোপে পার্ট করলে নাকি ঢের পয়সা পাওয়া যায় শুনেছি, ওর তো পয়সার অভাব নেই—'

'পয়সার কথা নয়, নিজে থেকে ফিরে আসতে হয়তো সাহস পাচ্ছে না।'

তখন নন্দর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আনিবার কথা দিয়া রাজেন চলিয়া গেল, যশোদা গেল সত্যপ্রিয়র বাড়ি।

হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে ঝোঁকের মাথায় বাড়ি ছাড়িয়া গেলে যে অনেক সময় সাধ থাকিলেও ফিরিয়া আসিতে ভরসা পায় না, একথাটা সত্যপ্রিয়কে বুঝাইয়া বলা দরকার।

যামিনী স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াক, বৌকে নিয়া নিজের

ভিন্ন সংসার পাতুক, যশোদার তাতেকোনো আপত্তি ছিল না। মানুষের মধ্যে এরকম তেজই সে পছন্দ করে। কেবল যোগমায়ার সন্তান-সম্ভাবনার জন্য এসময়টা তাকে নিয়া এরকম টানা-হ্যাঁচড়া করা সঙ্গত নয় বলিয়া প্রথমটা সে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এতকাল যে অনায়াসে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিয়াছে আর কয়েকটা মাস সে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না? বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব তো পাগলামি নয়। বেহিসাবী তেজ দেখানো গোয়াতুর্মির সামিল।

প্রথমে যামিনী বুক ফুলাইয়া বলিত, কুঁড়েঘরে না খাইয়া দিন কাটাইবে তবু আর জীবনে কখনও শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিতে যাইবে না। কিন্তু এখন মুখেও আর সে ওসব কথা বলে না। কিছুদিন পরে সে হঠাৎ একদিন যাচিয়া গিয়া সত্যপ্রিয়র পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িবে, তাকে কোনোমতেই আটকানো যাইবে না। নিজের পায়ে ভর দিয়া কুঁড়েঘরে স্বাধীন জীবন যাপন করিবার মানুষ সে নয়—একটু নরম হইয়া থাকিলেই সত্যপ্রিয়র রাজপ্রাসাদে আরামে জীবন কাটানোর সুযোগটা অন্তত যতদিন সামনে উপস্থিত আছে। যোগমায়ারও এ জীবন সহ্য হইতেছে না। এরকম অবস্থায় ওদের এখানে রাখিয়া কষ্ট দিয়া লাভ কি? ফিরিয়া যদি যাইতে হয়, ক'মাস পরে যাওয়ার চেয়ে, যোগমায়ার দিক হইতে ধরিলে, এখন যাওয়াই ভাল।

তাছাড়া আর একটা কথাও যশোদার মনে হইতে থাকে—ওদের দু'-জনকে বাড়িতে রাখিয়া সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়া যাইবে ভাবিয়া নিজের খুশি হওয়ার কথা। প্রতিহিংসার জন্য ওদের কেন সে কষ্ট দিবে? এই অন্যায় কল্পনা মনে আসিয়াছিল বলিয়া এখন তাহার মনে হয়, ওদের ফিরিয়া যাওয়ার উপায়টা তারই করিয়া দেওয়া উচিত।

সত্যপ্রিয় কাগজ পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলিল, 'এসো চাঁদের-মা।'

খানিক তফাতে মেঝেতে জাঁকিয়া বসিয়া যশোদা নির্বিকারভাবে বিনা ভূমিকায় বলিল, 'মেয়েকে এবার ফিরিয়ে আনুন।'

'মেয়েকে ফিরিয়ে আনব? আমি?'

'তাতে দোষ কি বলুন ? বাপ তো আপনি ? বড় কাঁদাকাটা করছে খুকী। এ সময়টা খুকীর পক্ষে—ছেলেমেয়ে হবে ওর জানেন না বোধ হয় ?'

'জানি।'

শুনিয়া যশোদা একটু চুপ করিয়া রহিল।

'জেনেও ওদের যেতে দিলেন ?'

'আমি যেতে বলি নি। ওরা নিজেরাই গেছে।'

'আটকানো উচিত ছিল আপনার।'

'কি ক'রে আটকাতাম ? পায়ে ধরে ?'

যশোদা তাড়াতাড়ি বলিল, 'ছি, ওকথা বলতে নেই। অকল্যাণ হয়। যা হবার হয়ে গেছে, এবার ওদের ক্ষমা করুন। ছেলেমানুষ তো, ওরা কি বোঝে ? ফিরে আসবার জন্য মেয়ে-জামাই আপনার পাগল হয়ে আছে, কেবল না ডাকলে ভরসা পাচ্ছে না আসতে। আপনি যদি ডেকে পাঠান—'

সত্যপ্রিয় তার পরিচিত মৃদু হাসির সঙ্গে বলিল, 'ডেকে পাঠালেই তো ওরা মাথায় চড়ে বসবে, চাঁদের-মা।'

যশোদা অবাক হওয়ার ভান করিয়া বলিল, 'মাথায় চড়ে বসবে ? আপনার ? আপনার সামনে মুখ তুলে কথা কইবার সাহস ওদের আছে কিনা সন্দেহ, মাথায় চড়বে ! তাছাড়া, বেয়াদবি যদি একটু করেই, মেয়ে-জামাইকে সিধে রাখতে পারবেন না ?'

সত্যপ্রিয় ভাবপ্রবণতার চিহ্নও দেখাইল না, শান্তভাবে বলিল, 'ওরা নিজে থেকেই আসবে।'

যশোদাও তা জানিত, কিছুক্ষণ সে আর বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। সত্যপ্রিয়র নির্বিকার ভাব যশোদাকে সত্যসত্যই দমাইয়া দিয়াছিল। সত্যপ্রিয়র সঙ্গে কথা বলার এই একটা মস্ত অসুবিধা, এত সহজে সে মানুষের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারে, উত্তেজনা ভয়, আনন্দ, উৎসাহ, হতাশা এসব যেন নিজের ইচ্ছামতো পরের মধ্যে সংক্রামিত করিবার ক্ষমতা তার আছে। সত্যপ্রিয়র উদাসীনতা দেখিয়া মনে হয়, মেয়ে-জামাই-এর কথাটা আলোচনা করাও

সে প্রয়োজন মনে করে না। অতি সাধারণ একটা ব্যাপার, সংসারে এমন অনেক হয়, আপনা হইতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এজন্য মাথা-ঘামানোর কিছু নাই। যশোদারও মনে হইতে থাকে, ব্যাপারটা সে যত গুরুতর মনে করিয়াছে, হয়তো তেমনি কিছুই নয়। এবিষয়ে আর কিছু না বলাই উচিত। তবে কোনো কাজ আরম্ভ করিয়া মাঝখানে হাল ছাড়িয়া দেওয়া যশোদারও স্বভাব নয়।

'তা হয়তো আসবে, কিন্তু তার তো দেরি আছে। খুকীর মুখ চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনাই ভাল। আপনার ছেলেকে যদি পাঠিয়ে দেন—'

সত্যপ্রিয় মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি কাউকে পাঠাতে পারব না।'

কথাটা সে এমন স্পষ্টভাবেই বলিল, যে মাথা নাড়িবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। যশোদা হাঁটু গুটাইয়া মেঝেতে ডান হাতের তালু পাতিয়া একটু কাত হইয়া মেঝেতে মেয়েদের বসিবার চিরন্তন ভঙ্গিতে বসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়ানোর ভূমিকা হিসাবে সে এবার সোজা হইয়া বসিল। আর তার কিছুই বলিবার নাই।

'সত্যপ্রিয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরা বুঝি তোমায় পাঠিয়েছে?'

যশোদা বলিল, 'না।'

সত্যপ্রিয় এতক্ষণ অন্যদিকে চাহিয়াছিল, কথা বলিবার সময় সে কদাচিৎ শ্রোতার মুখের দিকে তাকায়। এবার যশোদার চোখে চোখ মিলাইয়া সে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, 'অন্য কেউ একথা বললে বিশ্বাস করতাম না চাঁদের-মা। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি কখনো মিথ্যা বল না।'

সত্যপ্রিয়র দৃষ্টি দেখিয়া যশোদা এক মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল। যশোদার স্নায়ুগুলি এরকম শিহরণের উপযোগী করিয়া তৈরি হয় নাই; রাতদুপুরে হঠাৎ বাড়ির অন্ধকারে একটা ভূত দেখিলেও সে ভাল করিয়া চমকাইয়া ওঠে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সত্যপ্রিয়র দৃষ্টিতে যে-ভাষা তার স্পষ্ট চোখে পড়িয়াছে ভূত দেখার চেয়ে তা চমকপ্রদ। ধনঞ্জয়ের চোখে একদিন যশোদা এ ভাষা দেখিয়াছিল, তবে সত্যপ্রিয়র চোখের এমন

বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক ক্ষুধার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সেই মৃদু কামনার অভিব্যক্তির তুলনাই হয় না। হঠাৎ যশোদার একটা অদ্ভুত ধরনের লজ্জা বোধ হয়, অনেকদিন সেরকম লজ্জার সঙ্গে তার পরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল।

চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি নিভাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'তবু, মেয়ে-জামাইকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি কিছু করতে পারব না চাঁদের-মা। তুমি নিজে যখন এসেছ, আমার মেয়ের ভালর জন্য এসেছ, তোমার জন্য আমি এইটুকু করিতে পারি—ওদের ক্ষমা করলাম। তুমি গিয়ে ওদের বলতে পার, ওরা যদি ফিরে আসে আমি ওদের কিছু বলব না।'

বাড়ি ফিরিয়া যশোদা নিজের বিস্ময়ে নিজেই হতবাক্ হইয়া থাকে। তার জীবনে কখনও এমন সমস্যা হয় নাই। যা সে দেখিয়া আসিয়াছে সত্যপ্রিয়র চোখে তাই কি ঠিক ? অন্য আর কি হইতে পারে ? যেভাবে সত্যপ্রিয় তাকে দু'চোখ দিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল তার তো অন্য কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয় ? কিন্তু সত্যপ্রিয়র পক্ষে কি ওটা সম্ভব ? বিশেষত তাকে দেখিয়া ? তার মতো বিরাটকায়া মাঝবয়সী রমণীকে সামনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সত্যপ্রিয়র মতো প্রৌঢ় মানুষের মধ্যে জোয়ারের আকস্মিক বন্যার মতো প্রচণ্ড কামনার উদ্রেক হইতে পারে এ তো বিশ্বাস করার মতো কথা নয়।

চোখ বুজিয়া বাস্তবকে এড়ানোর ছেলেমানুষী যশোদার নাই। সে জানে, সত্যপ্রিয়র মতো সবল সুস্থ সংযমী মানুষ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছে বলিয়াই নিভিয়া যায় না। আকস্মিক এবং হয়তো ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের অসংযমকে একেবারে বর্জন করা মানুষের পক্ষে কঠিন। রামায়ণ মহাভারতে যশোদা মুনিঋষিরও অনেক অসংযমের কাহিনী পড়িয়াছে। কিন্তু সে সব হঠাৎ-জাগা ভালবাসা জাগাইত অনন্যসাধারণ রূপবতী যুবতী মেয়েরা। যশোদাকে দেখিলে রাস্তার গুণ্ডাও যে ভড়কাইয়া যায় !

সত্যপ্রিয়কে যশোদা ভাল করিয়াই চেনে, এক এক সময় ব্যাপারটা তার বড়ই কৌতুকজনক মনে হয়, আবার পরক্ষণে সে বুঝিতে পারে এর মধ্যে কৌতুকের কিছু নাই, বিষয়টা অতীব গুরুতর ! সত্যপ্রিয় যা

কিছু চায়, প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গেই চায়। প্রত্যেকটি কামনার এরকম অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতাই সত্যপ্রিয়কে এরকম হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর করিয়াছে। বিরক্তি বোধ করিলে ভূমিকম্পের জন্য সত্যপ্রিয় পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া ছাড়ে। পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে হয়তো জগতের সমস্ত কাঁটা নষ্ট করিয়া ফেলা সম্ভব কিনা এই কল্পনাকে সে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সে ভাববিলাসী নয়, বাস্তবকে সে এড়াইয়া চলে না,—তার মতো হিসাবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফন্দিবাজ, সংযমী আর স্বার্থপর মানুষ যশোদা খুব কমই দেখিয়াছে। মানুষকে পায়ের নিচে চাপিয়া রাখার কামনা সম্বন্ধে হয়তো সে অসংযত, নিজের মতামত প্রচার করার স্বপ্ন দেখিবার বেলা হয়তো সে অবাস্তব, অসম্ভব কল্পনার ক্রীতদাস,—কিন্তু তাও যেন ইচ্ছাকৃত দুর্বলতা, জানিয়া বুঝিয়া নিজেকে একটু খেয়াল খেলার সুযোগ দেওয়া। অথবা মোটের উপর মানুষটা আসলে পাগল ?

এই সব চিন্তায় কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তারপর একদিন সকালে পিয়ন আসিয়া একখানা খাম দিয়া গেল যশোদার নামে। খামের মধ্যে কারও ব্যক্তিগত চিঠি ছিল না, ছিল একটি নোটিস। শহরতলির উন্নতির জন্য যশোদার বাড়ির উপর দিয়া নতুন রাস্তা যাইবে, যশোদার বাড়ি আর আলগা জমি উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া নেওয়া হইবে। বাড়ি বিক্রয় করার বিরুদ্ধে আর নির্ধারিত মূল্যের বিরুদ্ধে যশোদার যদি কিছু বলিবার থাকে, নির্দিষ্ট একটি দিনের মধ্যে যশোদা যেন তার লিখিত আবেদন দাখিল করে।

ইংরেজীতে লেখা নোটিস, যামিনী তাকে সমস্তটা পড়িয়া শুনাইয়া মানে বুঝাইয়া দিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া যশোদা বলিল, 'বাড়ি বেচতে হবে ?'

যামিনী বলিল, 'তা ছাড়া আর উপায় কি! আপত্তির কথাটা বাজে, ওরা আপত্তি কানে তোলে না।'

'আমি বেচতে না চাইলেও বেচতে হবে ?'

'তাই তো আইন—রাস্তার জন্য কিনা! তবে ওরা দাম ভাল দেয়—এখানকার বাড়ি বেচে অন্য জায়গায় বাড়ি করবেন।'

যশোদা বিশ্বাস করিল না। নোটিস-হাতে পাড়ার রমেশ উকিলের বাড়ি গিয়া হাজির হইল। ফিরিয়া আসিয়া ছাখে, রাজেন বসিয়া আছে।

'কি ব্যাপার চাঁদের-মা?'

'আবার পাততাড়ি গুটোতে হবে।'

আগে আর কখনো যশোদা পাততাড়ি গুটায় নাই, কেবল গুটানোর উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কথা শুনিয়া মনে হয়, পাততাড়ি গুটাইয়া গুটাইয়াই যেন তার জীবন কাটিয়াছে।

রাজেন হাত বাড়াইয়া বলিল, 'দেখি, প'ড়ে দেখি একবারটি কি লিখেছে।'

'এর মধ্যে খবর পেয়েছ?' বলিয়া যশোদা নোটিসটি তার হাতে দিল। গম্ভীরভাবে নোটিস পড়িয়া নিরুপায় আপসোসের সঙ্গে প্রচণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হুঁঃ! ওই হনুমানটার কাজ আর কি!'

যশোদারও কথাটা মনে হইয়াছিল, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় নাই। শহর আর শহরতলির উন্নতির জন্য যারা মাথা ঘামায়, তাদের সঙ্গে সত্যপ্রিয়র সম্পর্কই বা কোথায়? তাছাড়া, ক'দিন আগে সত্যপ্রিয়র চোখে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিল, তাও যশোদা ভুলিতে পারিতেছিল না।

রাজেন আবার বলিল, 'মেয়ে-জামাইকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ কিনা তার শোধ তুলল।'

সকলেই আসিয়া হাজির হইয়াছিল। যোগমায়া হঠাৎ ক্ষেপিয়া গেল, 'আমাদের কথা বলছ তুমি! বাবার কথা বলছ! আমার বাবাকে তুমি হনুমান বললে?'

রাজেন বলিল, 'শুধু হনুমান? তোমার বাবা—'

যশোদা বলিল, 'আহা, থামো না বাবু, তোমারও কি মাথা খারাপ হ'ল?'

এখানে আর বেশী সহানুভূতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া যোগমায়া কাঁদিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেল।

যশোদা বলিল, 'কিন্তু চক্কোত্তিমশায়ের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি?'

রাজেন বলিল, 'সম্পর্ক আর কি, ও-ব্যাটার কোম্পানী থেকে এপাড়ার

সব ঘর-বাড়ি জমিজমা কিনে নিয়েছে তো, তুমি আর আমি শুধু বেচিনি। তারপর বলে দিয়েছে, এখান দিয়ে রাস্তা গেলে সুবিধা হবে।'

'তুমি আর আমি যদি বলি এখান দিয়ে রাস্তা যেতে দেবো না? একটু তফাত দিয়ে—?'

রাজেন মাথা নাড়িল, 'আমরা দু'জন বললে কি হবে, সবাই বললে তবু ভরসা ছিল। তা সবাই তো আগেই ঘরবাড়ি বেচে বসে আছে। তাছাড়া ওই হনুমানটার কথা ফেলে আমাদের কথা কে শুনবে বলো? আমরা হলাম গরীব মানুষ।'

যোগমায়ার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া সত্যপ্রিয়র ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞার কথাটা যশোদা তাদের শোনায় নাই। আপনা হইতে এরা যদি ফিরিয়া যায়, আর গিয়া ছাখে যে, সত্যপ্রিয় একটুও রাগ করে নাই, দু'জনেই খুব খুশি হইবে। ভাবিয়াছিল, নিজেই বুঝাইয়া দু'জনকে পাঠাইয়া দিবে।

রাজেন কাজে চলিয়া গেলে যশোদা যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি তো চললাম, আপনারা এবার কি করবেন?'

যামিনী ইতিমধ্যে একবার ঘরে গিয়া বাপের অপমানে অপমানিতা যোগমায়ার সঙ্গে ঘণ্টা খানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, 'তাই ভাবছি।'

'ফিরেই যান না?'

'তাই যাই, কি বলেন?'

'সেই ভাল। আমার মনে হয়, চক্কোত্তিমশায় রাগ করেন নি, আপনারা ফিরে গেলে খুব খুশি হবেন।'

যামিনী আমতা-আমতা করিয়া বলিল, 'ফিরে যদি যেতে হয়, দেরি করা বোধ হয় উচিত হবে না। যেতে হলে আজকেই চ'লে যাই। আপনি কি বলেন?'

'তাই যান।'

অজিতের দিকে চাহিয়া যশোদা হাসিয়া বলিল, 'তোমরা কি করবে ভাই?'

অজিত বলিল, 'এই তো সবে নোটিস এল, এখনও ঢের দেরি। বাড়ি বেচে সব ঠিকঠাক ক'রে উঠে যেতে বছরখানেক তো অন্তত লাগবেই— ইচ্ছে করলে বেশীও লাগাতে পারেন। আমরা কি করব, ভেবেচিন্তে ঠিক করলেই হবে।'

যশোদা হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, 'দেরি নেই ভাই, দু'চার দিনের মধ্যে আমি উঠে যাব, যত শীগ্‌গির পারি। এখানে আর মন টিকছে না। দু'দিন বাদে উঠে যেতেই হবে ভাবব আর দিন গুণে দিন কাটাব— বাপরে, আমার দম আটকে আসবে।'

'আমরা তবে অন্য কোথাও ঠিক করে—'

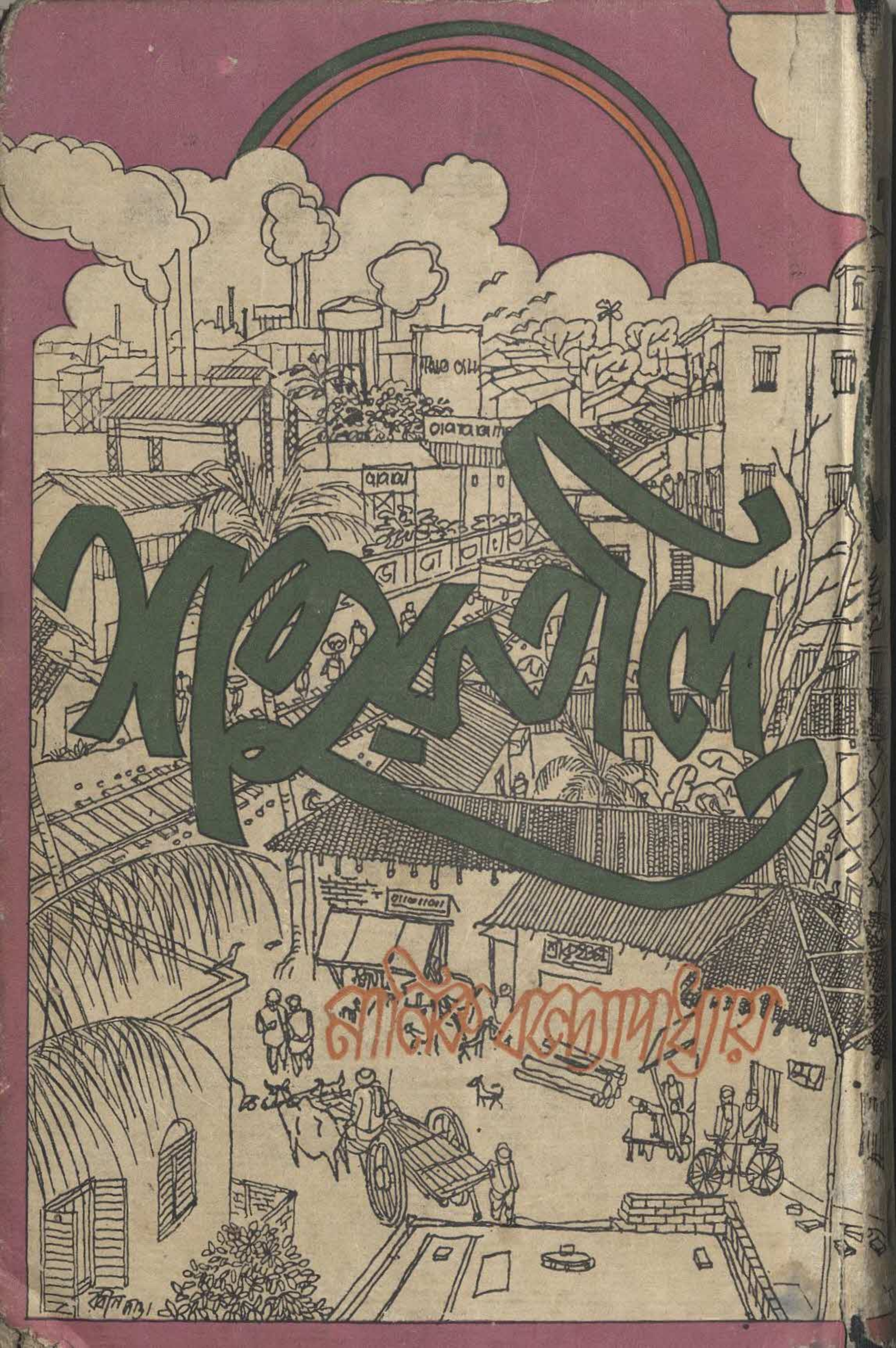
সুব্রতার কথার উৎস অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়াছিল, চোখ দু'টি একটু যেন ছলছল করিতেছিল। অজিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলিয়া উঠিল, 'অন্য কোথাও না ছাই, আমরাও দিদির সঙ্গে যাব। তোমায় আর আমি ছাড়ছি না দিদি, ম'রে গেলেও না—যেখানেই যাও তুমি আমি তোমার সঙ্গে যাবই যাব। হুঁ, বলে এতকাল পরে সত্যিকারের একটা দিদি পেলাম, দিদি যাবে এক জাগায়, আমরা যাব আর এক জাগায়! কি যে বল তুমি!'

অজিত তাড়াতাড়ি বলিল, 'আমি এমনি বলছিলাম।'

সুব্রতার গালটা একটু টিপিয়া দিয়া যশোদা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ছোট ছোট দু'টি উনুনে রান্না হইতেছে, একটি তোলা উনুন। আগে একবার যখন যশোদার ভরাট বাড়ি খালি হইয়া গিয়াছিল, চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া বড় বড় উনুনগুলি সে ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। এই উনুন-গুলিও আবার ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে।

কোথায় যাইবে? কোথাও বাড়ি কিনিয়া উঠিয়া যাইবে, না নন্দর বাড়িতে গিয়া উঠিবে? রাজেন নন্দর ঠিকানা আনিয়াছে, নন্দ নাকি এখন বড়লোক, তার বসিবার ঘরে গদি-আঁটা চেয়ার। সেখানে কি থাকিতে পারিবে যশোদা? কিন্তু যেখানেই যাক, উনুনগুলি আবার তাকে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে।

P.M.


শহরতলী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়